গল্পমাত্র

শীলভদ্র

শান্তি লাইব্রেরী

কলিকাতা-৯

গ্রন্থবার্তা

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৬৪

প্রকাশক : অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শান্তি লাইব্রেরী

১০-বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর : সন্তোষকুমার ধর

মুদ্রণ : ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস

৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী : ব্রজ রায়চৌধুরী

ব্লক : স্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এন্‌গ্রেভিং কোং

ব্লক মুদ্রণ : মোহন প্রেস

মূল্য : ৪'০০

এই গ্রন্থ রচনায় অনেকের নিকট নানা ভাবে সাহায্য পেয়েছি। শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, শ্রীআশুতোষ-মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিখিল সেন ও শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের সকলের নিকট লেখক কৃতজ্ঞ।

শান্তি-র বই

গ্রন্থবার্তা

জীবনশিল্পী শরৎচন্দ্র

গৃহসন্ধানে

পিছু ডাকে

রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী

রবীন্দ্রনাথের পূরবী

রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা

শিখারূপিণী

ঊর্মিমালা

সুন্দর, হে সুন্দর

যেতে নাহি দিব

মেঘ ও চাঁদ

গল্পকার শরৎচন্দ্র

গান্ধীজীর জীবনে নারী

গান্ধী-সাহিত্যের' পরিধি ও বৈচিত্র্য দুই-ই বৃহৎ। প্রতি বৎসর গান্ধীজীর জীবন ও দর্শন সম্বন্ধে নতুন নতুন বই বের হয়। কিছুকাল পূর্বে দেশপাণ্ডে কর্তৃক সংকলিত Gandhiana-র (গান্ধী-সাহিত্যের নির্ঘণ্ট) নতুন সংস্করণ প্রকাশ করলে তার আকার আজ দ্বিগুণ হবে। এই বিপুল সংখ্যক বইয়ের মধ্যেও Eleanor Morton প্রণীত The Women in Gandhi's Life যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সত্যি বলতে কি, জীবনী রচনায় এরূপ অভিনব টেক্‌নিকের প্রয়োগ বিরল। সহকর্মিণী, ভক্ত ও শিষ্যাদের সাহায্যে গান্ধীজীর জীবনকে প্রস্ফুটিত করা হয়েছে। মা ও স্ত্রী অবশ্যই এখানে একটি বড় অংশ অধিকার করেছেন। জওহরলাল প্রমুখ পুরুষ চরিত্রগুলি এই জীবনী থেকে বাদ পড়েছে। কিন্তু তাতে পাঠকের মন ক্ষুণ্ণ হয় না; পুরুষদের না আনাতেই মেয়েরা উজ্জ্বল হতে পেরেছেন। লেখিকার এই রচনাকৌশলটি শুধু চাতুর্যে পরিণত হয়নি, আশ্চর্যরূপে সাফল্য লাভ করেছে। উপন্যাসের আকর্ষণ নিয়ে বইটি শেষ পর্যন্ত পড়া যায়; অথচ অবাস্তব ঘটনার আশ্রয় কোথাও নেওয়া হয়নি। লেখিকার শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির পরিচয় প্রতি পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে। প্রায় পঁচিশ বছর পূর্বে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে শ্রীমতী মর্টন প্রথম গান্ধীজীর নাম শুনতে পান। তার পর থেকে তিনি গান্ধীজীর জীবন সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন; তাদের সুষ্ঠু প্রয়োগ পাওয়া যাবে এই গ্রন্থে। এমন অনেক কথা আছে যা আমাদের দেশের বহু শিক্ষিত লোকেরও জানা নেই। গান্ধীজীর জীবন যে এক মহৎ মহাকাব্যের উপাদান, এবং এদেশের সাহিত্যিকরা যে তা থেকে নব-সৃষ্টির প্রেরণা লাভ করতে পারেন, তার সফল ইঙ্গিত পাওয়া যাবে শ্রীমতী মর্টনের রচনায়।

লেখিকা পাঠকের সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন কস্তুরবাই নাকনজীর। কস্তুরবাইর তখনো বিয়ে হয়নি, বয়স সাত বছর, বাপের বাড়ীতে ছুটোছুটি করে দিন কাটায়। মোহনদাসের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়ে গেল, সে কিছুই জানতে পারল না। একদিন পুরুত ও জ্যোতিষীরা এসে কথা পাকা করে গেল, দেখে গেল কস্তুরবাইকে। কিন্তু বর-কনে কারো কানেই কথাটা উঠল না। এটা ১৮৭৬

সালের কথা। এর আগে আরো দু' জায়গায় মোহনদাসের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। কিন্তু পর পর দু'টি কনেরই অকাল মৃত্যু হওয়ায় কস্তুরবাইকে বিয়ে করবার সুযোগ এলো। বালক স্বামী ও বালিকা বধূর দাম্পত্য জীবনের যে ছবি গান্ধীজী তাঁর আত্ম-জীবনীতে এঁকেছেন তার সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। গান্ধীজী তাঁর মা পুতলিবাই-এর কাছ থেকে যে ছেলেবেলাতেই অহিংসা ও সত্যনিষ্ঠা শিক্ষা লাভ করেছিলেন সে কথা তিনি নিজেই বলে গিয়েছেন। বিশেষ করে কাঁকড়া বিছা গা বেয়ে ওঠা সত্ত্বেও পুতলিবাই তাকে না মেরে সযত্নে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন, এই দৃষ্টান্তটি বালক মোহনদাসের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

আইন পড়বার জন্য লণ্ডন গিয়ে মোহনদাস মেয়েদের সম্বন্ধে নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। দেখলেন তারা স্কুলে, আপিসে, দোকানে কাজ করছে; যোগ্য মেয়েদের নেতৃত্ব পুরুষরাও মেনে নিয়েছে। ১৮৮৭ সালে মোহনদাস অ্যানি বেশান্তকে প্রথম দেখেন এবং তার পর থেকে মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটে। চার্লস ব্র্যাডল'র সমাধিক্ষেত্রে ভারতীয় ছাত্ররা মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য মিলিত হয়েছিল; সেখানেই অ্যানি বেশান্তের সঙ্গে দেখা হয়। শ্রীমতী বেশান্ত তখন তাঁর প্রিয় সহকর্মীর জন্য কাঁদছিলেন।

বয়স চল্লিশ পার হলেও তাঁর সৌন্দর্য রয়েছে অটুট। রূপের সঙ্গে মিশেছে বুদ্ধির দীপ্তি এবং নির্ভীকতা। পনেরো বছর বয়সে শ্রীমতী বেশান্ত ওভিদ, প্লেটো ও ইলিয়াড পড়ে শেষ করেন। বিশ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হলো এক পাদ্রীর সঙ্গে। দুটি সন্তানের জননী হওয়া সত্ত্বেও ধর্মের প্রশ্ন নিয়ে স্বামীর সঙ্গে বিরোধ ঘটায় তিনি পথে বেরিয়ে এলেন; দীর্ঘকাল পাদ্রী ভদ্রলোক তাঁর পেছনে ঘুরে অনুনয় করে ঘরে ফিরিয়ে নিতে পারেননি। দেখা হলো চার্লস ব্র্যাডল'র সঙ্গে। ব্র্যাডল' সাংবাদিক, নাস্তিক, পার্লামেণ্টের সদস্য এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মূর্তিমান বিরোধ। যীশু ও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর তুলনামূলক বক্তৃতা লণ্ডনের ভারতীয় মহলে বিশেষ ঔৎসুক্য সৃষ্টি করেছিল। বেশান্ত ব্র্যাডল'র আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। নারী ও শ্রমিকের অধিকার থেকে শুরু করে ভারতের স্বাধীনতা,—এই সবই ছিল তাঁদের আন্দোলনের বিষয়। জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে বই লিখে জনসাধারণের নৈতিক অবনতি ঘটাবার অপরাধে একবার তাঁদের আদালতে অভিযুক্ত হতে হয়েছিল। যে ব্র্যাডল' ছিলেন আগুনের শিখার মতো, যাঁর গতি কেউ রোধ করতে পারত না, তিনিও বেশান্তের

ভক্ত হয়ে উঠলেন। বার্ণার্ড শ' এবং আরো অনেকে বেশান্তের সৌন্দর্য ও প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রেমে পড়েছিলেন। শ'র মতো লোকও তাঁকে ফেবিয়ান সোসাইটির সভ্য করতে সক্ষম হননি। কিন্তু জীবন-দেবতার এমনই বিচিত্র রহস্য যে অনেকের প্রেম প্রত্যাখ্যান করবার পর বেশান্ত যাঁকে ভালোবাসলেন সেই আভ্‌লিং গ্রহণ করল কার্ল মার্কসের মেয়েকে। প্রত্যাখ্যানের বেদনা তাঁকে হাজারো আন্দোলনের মধ্যে ঠেলে দিল। ভারতীয় ছাত্রদের মুখে মুখে বেশান্তের নাম ঘুরে বেড়াত ; কারণ, তিনি ছিলেন ভারতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। গান্ধীজীও তাঁকে প্রায়ই দেখতেন, বক্তৃতা শুনতেন। মাদাম ব্লাভাৎস্কির মৃত্যুর পর ১৮৯১ সালে শ্রীমতী বেশান্ত থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির নেতৃত্ব লাভ করায় গান্ধীজী ও অন্যান্য ভারতীয় ছাত্রের নিকট তিনি হলেন আরো প্রিয়। কারণ, থিয়োসফির সঙ্গে হিন্দুধর্মের যোগসূত্র আছে। মোহনদাস থিয়োসফিস্টদের সভায় যেতেন এবং বেশান্তের বক্তৃতা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। তাই গান্ধীজী যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতেন তখন তার আপিস ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গানো থাকতো শ্রীমতী বেশান্তের ছবি।

ব্যারিস্টারী পাশ করে দেশে ফিরে গান্ধীজী মাকে আর দেখতে পেলেন না। বিদেশে থাকতেই পুতলিবাই পরলোক গমন করেছেন। কস্তুরবাই আর ছোট্ট বালিকা-বধূ নন ; তিনি সন্তানের জননী। গান্ধীজী তাঁদের দাম্পত্য-জীবনের চিত্তাকর্ষক ছবি নিজেই এঁকেছেন, তার পুনরুক্তি দরকার হবে না। জীবিকার্জনের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় এসে গান্ধীজী ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। একাজে তিনি যে বিদেশিনীর সমর্থন লাভ করলেন তাঁর নাম শ্রীমতী অলিভার শ্রাইনার। আফ্রিকার এক মিশনারী পরিবারের মেয়ে তিনি। ইহুদী, স্কচ, ইংরেজ প্রভৃতি নানা জাতির সংমিশ্রণ ছিল তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে ; তাই তাঁর গায়ের রং ছিল এক ডিগ্রি কম ফরসা। লেখিকা হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং একবার লণ্ডনে এই সূত্রে আলাপ হলো বিখ্যাত যৌনবিজ্ঞানী হ্যাভ্‌লক এলিসের সঙ্গে। এলিস মুগ্ধ হলেন, ভালোবাসলেন তাঁকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিয়ে হলো না। আফ্রিকায় ফিরে আসবার পথে শ্রাইনার জাহাজের যাত্রী সেসিল রোড্‌সের প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হলেন। আফ্রিকায় এসে এক সন্ধ্যায় তাঁরা ডিনার খেতে বসলেন পাশাপাশি ; রোড্‌স শ্রীমতী শ্রাইনারের রঙ্‌ সামান্য একটু কম ফরসা বলে পার্শ্ববর্তিনী হিসাবে তাঁকে পছন্দ করল না ; স্পষ্ট করেই বলল, "I prefer

men to niggers.” বড় আঘাত পেলেন শ্রীমতী শ্রাইনার ; এর পর থেকে পক্ষ নিলেন কালো মানুষের ; সুতরাং সহজেই গান্ধীজীর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় পোলকের স্ত্রী মিলি পোলক ও শ্রীমতী ওয়েস্ট নামে আর এক ভদ্র মহিলা গান্ধীজীর বাড়ীতে কিছুকাল থেকেছেন। নতুন উপনিবেশ স্থাপিত হবার পর সেখানেও তাঁরা এসেছিলেন বাসিন্দা হয়ে। সেখানে মেয়েদের ছিল পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার ও সমান দায়িত্ব। এখানেই গান্ধীজী আশ্রমবাসিনী হিসেবে সঙ্গী পেলেন জ্যেষ্ঠ পুত্র হীরালালের মুসলমান পত্নী গুলাবকে। গান্ধীজীর কাজ ইতিমধ্যে এত বেড়ে গেছে যে, একজন সাহায্যকারী ছাড়া আর চলে না। প্রথমে এলেন মিস্ ডিক। তারপরে সোনিয়া শ্লেসিন। এদের বর্ণ-বিদ্বেষ ছিল না বলে গান্ধীজীর কাজ করতে রাজী হয়েছিল। সোনিয়া মাত্র সতেরো বছরের ইহুদী তরুণী, কিন্তু দক্ষ স্টেনোগ্রাফার। চেহারায়, পোষাকে, একটা পুরুষালি ভাব ;—গায়ে অলঙ্কারের চিহ্নমাত্র নেই। তার উদ্দীপনা ছিল, ছিল কাজ সম্পন্ন করবার সুষ্ঠু পরিকল্পনা ; কিন্তু ছিল না রোমান্সের বাষ্প। একবার কাজে ডুবে গেলে তার খেয়াল থাকত না ক' ঘণ্টা কেটে গেল, রাত কত গভীর হলো। গান্ধীজী যখন মাইনে বাড়িয়ে দিতে চাইলেন তখন তাঁর মুখের উপর সোনিয়া জবাব ছুঁড়ে মারল, ‘আমি কি টাকার জন্য কাজ করি? আপনার আদর্শ আমার ভালো লাগে বলেই আছি।’ ক্রমে গান্ধীজী একান্তরূপে নির্ভরশীল হলেন সোনিয়ার উপর। চিঠিপত্র লেখা, সভার ব্যবস্থা করা, টাকার হিসেব রাখা, সবই সোনিয়া করত। প্রয়োজন হলে জোহানস্‌বার্গের বিপদসংকুল পথে গভীর রাত্রিতে সে বের হতো। সঙ্গে রক্ষী দেবার প্রস্তাব সে উপহাস করে উড়িয়ে দিয়েছে। গান্ধীজীর উপর বিদ্রূপ বা আঘাত এলে সোনিয়া স্বেচ্ছায় তার অংশ গ্রহণ করতে এগিয়ে আসত।

একবার এক সভায় স্বদেশবাসীরাই যখন ভুল বুঝে গান্ধীজীকে আক্রমণ করল, তখন আহত গান্ধীজীকে সোনিয়া সযত্নে বাড়ী নিয়ে এসেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার মূলে সোনিয়ার অকুণ্ঠ নিঃস্বার্থ সহযোগিতা যে বিশেষ প্রশংসনীয় তাতে সন্দেহ নেই। গান্ধীজী বলেছেন : “Sonya Schlesin is one of the noblest beings I have known.” দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যখন গান্ধীজী, কস্তুরবাই এবং অন্যান্য নেতারা জেলে, তখন আন্দোলন পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব পড়েছিল সোনিয়ার উপর।

ভারতীয়দের বাড়ী বাড়ী ঘুরে সে পরবর্তী পন্থা আলোচনা করত। কংগ্রেসের অর্থভাণ্ডার ছিল একা তার হাতে। সকল সন্দেহের উর্ধ্বে ছিল তার চরিত্র। সাহসী সৈনিকের মতো, আত্মবিলোপকারী জৈন সন্ন্যাসীর মতো, জীবন বিপন্ন করে সেই কাজ করে গেছে, যার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না।

সত্যাগ্রহে জয়লাভ করে গান্ধীজী লণ্ডনে এসেছেন। উঠেছেন এক দরিদ্র পল্লীতে। বহুমূল্য শাড়ী ও অলঙ্কারে ভূষিতা এক মহিলা এলেন তাঁর খোঁজে। গান্ধীজী তখন মেঝের উপর মোটা কম্বল পেতে খেতে বসেছেন। লণ্ডন সহরে এই অদ্ভুত জীবনযাত্রার চমকপ্রদ ছবি ভদ্রমহিলাকে বিস্মিত করল। গোখেল বলেছিলেন, গান্ধী কাদার তাল থেকে কঠিন বীর গড়তে পারেন। একি সেই লোক? চেহারা ও পরিবেশ দেখে আগন্তুক মহিলা হাসি চাপতে পারলেন না। ইনি সরোজিনা নাইডু। পরে ইনি গান্ধীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন, লবণ সত্যাগ্রহ এবং আরো কত আন্দোলনে নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করেছেন।

গোখেলের মৃত্যুর পর ভারতের রাজনীতিতে দেখা দিল শ্রীমতী বেশান্তের প্রভাব। তাঁর হোম রুল আন্দোলনের কথা তখন ঘরে ঘরে। গান্ধীজীর কথা কেউ শুনতে চায় না। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা উৎসবে গান্ধীজী যখন উপস্থিত রাজা-মহারাজাদের দরিদ্রদের উপেক্ষা করে দেশের সম্পদ একা ভোগ করবার জন্য মৃদু সমালোচনা করছিলেন, তখন শ্রীমতী বেশান্ত তাঁকে আর বলতে না দিয়ে বসিয়ে দিলেন। পরে বেশান্ত তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেছিলেন গান্ধীজীর বিরোধিতা করতে গিয়ে। বিশেষ করে অমৃতসরের ঘটনার পর ও'ডায়ারের পক্ষে কথা বলে তাঁর রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটল।

গান্ধীজীর আদর্শে মুগ্ধ হয়ে একে একে কত মেয়ে এগিয়ে এলেন তাঁর কর্মপ্রচেষ্টায় সাহায্য করতে। এলেন বিলাসে লালিতা বিজয়লক্ষ্মী, কোটিপতি সারাভাই পরিবারের অনসূয়া, রাজকুমারী অমৃত কাউর, সুশীলা নায়ার এবং গঙ্গাবেন। গঙ্গাবেনের কাছ থেকেই গান্ধীজী হাতে-কলমে চরকার ব্যবহার শিখেছিলেন। তাছাড়া, দীর্ঘকালের আন্দোলনে ভারতের কত অসংখ্য নারী গান্ধীজীর সান্নিধ্য লাভ না করেও তাঁর আহ্বানে মৃত্যু ও কারাবরণ করেছে। শুধু এদেশের নয়, বিদেশিনীরাও আকৃষ্ট হয়েছে। গান্ধীজীর কাছে একবার অনুরোধ এলো মিস শ্লেড-এর কাছ থেকে,—তাঁকে আশ্রমের স্থায়ী সভ্য করে নেবার জন্য। গান্ধীজী লিখলেন, আশ্রমের জীবন বড় কঠোর। মিস শ্লেড তাতে

ভয় পেলেন না। গান্ধীজী তখন আশ্রমের জীবন সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে লিখলেন, এক বছর এই নিয়ম অনুসারে চলে দেখ। যদি পার, তখন এসো।৮

মিস শ্লেড বৃটিশ অভিজাত পরিবারের মেয়ে। তাঁর পিতা স্যার এডমাণ্ড শ্লেড ছিলেন বৃটিশ নৌবাহিনীর অ্যাডমিরাল। মিস শ্লেড লম্বায় ছ' ফুট, মাথাভরা কালো চুল, সুন্দর চোখ, ভালোবাসে সঙ্গীত ও খেলাধূলা। এক ধরণের পার্টি ও শিকার অভিযানে যোগ দিয়ে দিয়ে, এবং ছক বাঁধা সভ্য সমাজের কায়দা মাফিক চলতে গিয়ে মিস শ্লেডের কুমারী জীবন দুর্বহ হয়ে উঠেছিল। যে মহত্ত্ব ও ঔদার্য তিনি খুঁজতেন বৃটিশ অভিজাত সমাজে তার সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব ছিল না। ১৯২৩ সালে মিস শ্লেড প্যারিস বেড়াতে এসে অকস্মাৎ হাতে পেলেন রোলাঁর লেখা গান্ধী-চরিত। এতদিন অবচেতন মনে যাঁর সন্ধান করছিলেন হঠাৎ এই বইয়ের মধ্যে তাঁর দেখা পাওয়া গেল। সঙ্কল্প স্থির করতে দেরি হলো না। গান্ধীজীর নির্দেশ পেয়ে মিস শ্লেড সবরমতী আশ্রমের যোগ্য হবার জন্য গেলেন সুইজারল্যাণ্ডের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে। এখানে থেকে অভ্যাস করতে শুরু করলেন আশ্রমের কঠোর জীবনযাত্রা। অভিভাবকরা ভাবলেন এটা তাঁর হাজারো উদ্ভট খেয়ালের মতোই আর একটি নতুন খেয়াল। কিন্তু তাঁদের আশা ব্যর্থ করে দিয়ে ১৯২৫ সালের নভেম্বর মাসে তিনি যাত্রা করলেন ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে। পেছনে পড়ে রইল আত্মীয়স্বজন, সমাজ ও পাণিপ্রার্থী স্তাবকের দল। নাড়ীর বন্ধন ছিন্ন করে যাত্রা করলেন নব-জীবনের পথে। জাহাজে থাকতে মিস শ্লেড শৌখিন বহু মূল্য পোষাক পুড়িয়ে পরলেন মোটা খদ্দরের পোষাক। সবরমতী পোঁছে গান্ধীজীর পায়ের উপর মাথা রেখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন মিস শ্লেড। তিনি মেয়ের মতো গ্রহণ করলেন নতুন শিষ্যাকে। নতুন নাম দিলেন মীরা।

ভক্ত ও সহকর্মীদের কাছে গান্ধীজী যত বড়ই হোন না কেন, তিনিই সব ছিলেন না। তিনি ছাড়াও ছিল দেশ, ছিল স্বাধীনতার স্বপ্ন। কিন্তু মীরার কাছে শুধু ছিলেন গান্ধী। একমাত্র তাঁরই আকর্ষণে ছ'টি ভাষায় অভিজ্ঞা, বীঠোফেনের সঙ্গীতে পারদর্শিনী, অভিজাত ধনাঢ্য পরিবারের কন্যা এক অপরিচিত কঠোর জীবন স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছেন। কয়েক বছর পরে মীরা যখন আমেরিকা গিয়েছিলেন তখন সবাইকে বলতেন, তোমাদের আছেন যীশু, আমার গান্ধীজী। গান্ধীজীর সেবা করবার সুযোগ পেলে মীরার আনন্দের সীমা থাকত না ; যখন তিনি আশ্রম ছেড়ে দূরে যেতেন অসহ্য বেদনায়

মীরার বুক ভরে উঠত। সেই বেদনা লাঘব করবার জন্য প্রতিদিন তিনি গান্ধীজীর কাছে চিঠি লিখতেন; উত্তর না পেলে করতেন টেলিগ্রাম। কখনো কখনো গান্ধীর কাছে গিয়ে পৌঁছত ফুলের তোড়া, যে তোড়া কয়েক দিনের পথ অতিক্রম করে শুকিয়ে গেছে। তাঁর প্রতি আকর্ষণের এই মোহ থেকে মীরাকে মুক্ত করবার জন্য গান্ধীজী উপদেশ দিতেন; কখনো কাছে রাখতেন, কখনো শাস্তি দিতে দূরে পাঠাতেন। বলতেন, আমাকে ভুলে যাও, গ্রহণ করো আমার আদর্শকে। তাঁর কঠোর ব্যবস্থায় কতবার মীরার দু' চোখ জলে ভরে গেছে, কিন্তু গান্ধীজীর আদেশের তাতে বিন্দুমাত্র নড়চড় হয়নি। মীরার দুর্বলতার জন্য ঘৃণায় তাঁকে দূরে তাড়িয়ে দেননি; সহানুভূতির সঙ্গে চেষ্টা করেছেন তাঁর মন বিষয়ান্তরে নিবদ্ধ করতে।

মীরার নাম ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে চিরদিন গাঁথা হয়ে থাকবে। গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজীর সঙ্গে তিনি লণ্ডনে গিয়েছিলেন। সেখানে গান্ধীজীর ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব ছিল তাঁর। ১৯৪২ সালে মীরাবেনের প্রতি আদেশ হলো দূরে গিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করবার। গান্ধীজীর নিকট বিদায় নিতে এসেছেন। গান্ধীজী তাঁর হাতে সদ্য-সমাপ্ত একটি রচনা দিয়ে বললেন, পড়ে দেখ। তোমার ভালো লাগলে নিজে গিয়ে নেহরুকে দিয়ে আসবে। মীরাবেন দেখলেন রচনার শিরোনামা "ভারত ছাড়"। সমগ্র ভারতে এ বাণী ছড়িয়ে পড়বার আগেই বন্দী হলেন নেতারা। সুশীলা ও কস্তুরবা এক সঙ্গে গ্রেপ্তার হলেন। জেলের পথে কস্তুরবা বললেন, এবার আমরা প্রাণ নিয়ে জেল থেকে বেরুতে পারব না। কয়েক দিন পরে এঁদের আগা খাঁর প্রাসাদে গান্ধীজীর কাছে স্থানান্তরিত করবার জন্য রেল স্টেশনে আনা হলো। কস্তুরবা চেয়ে দেখলেন, জীবন ঠিক আগের মতোই চলছে; ফেরি-ওয়ালার চিৎকার, যাত্রীদের হৈ-চৈ, গাড়ীর হুইসল। বড় ক্ষোভের সঙ্গে কস্তুরবা বললেন, ছাখ্, সুশীলা, চেয়ে ছাখ্। সব নেতারা জেলে, অথচ দেশের জীবনে তার ছায়া নেই; এদের নিয়ে বাপুজী দেশের স্বাধীনতা আনবেন কেমন করে?

একে একে সরোজিনী নাইডু, মহাদেব দেশাই, মীরাবেন, কস্তুরবা ও সুশীলা আগা খাঁর প্রাসাদে গান্ধীজীর সঙ্গে মিলিত হলেন। গ্রন্থের এই অধ্যায়টি ঘটনাবহুল এবং চিত্তাকর্ষক। মহাদেব দেশাইর মৃত্যু এবং মহাত্মার অনশন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সময় কাটাবার জন্য মীরা ক্যারম খেলা আরম্ভ করলেন, সঙ্গী হিসেবে টেনে আনলেন কস্তুরবাকে। কস্তুরবার খেলায় নেশা ধরে গেল;

কিন্তু হেরে গেলে এই সরল-হৃদয়া বৃদ্ধার রাত্রিতে ঘুম হতো না। সুতরাং মীরাবেন এমন ব্যবস্থা করলেন, যাতে তাঁর কখনো হার না হয়।

কস্তুরবার দিন ফুরিয়ে এসেছে। মরতে ভয় নেই, শুধু সেই বাউণ্ডুলে, দুশ্চরিত্র, সকলের ঘৃণার পাত্র হীরালালকে শেষবারের মতো দেখবার বড় আকাঙ্ক্ষা। মীরাবেনের ঘরে কৃষ্ণের বিগ্রহ ছিল। কস্তুরবা চুপি চুপি সেখানে এসে প্রার্থনা করতেন, ঠাকুর, একবার হীরালালকে এনে দাও। গান্ধীজী জানতে পেরে সরকারের অনুমতি আনালেন। হীরালাল মুমূর্ষু মাকে দেখতে এল। তখনও তার মুখে মদের গন্ধ লেগে আছে। কস্তুরবা কেঁদে বললেন, বাপুজী মহাত্মা, তিনি পৃথিবীর দুঃখ দুর করবেন ; কিন্তু দেবদাস, তোরা ওর পরিবারের ভার না নিলে, আমি তো শান্তিতে মরতে পারব না। ছেলেরা আশ্বাস দিল ; কস্তুরবা গান্ধীজীর কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মীরাবেন ছোট্ট শীর্ণ দেহটি সাজিয়ে দিলেন নতুন খদ্দরের শাড়ী দিয়ে, ফুল দিয়ে। আগা খাঁর প্রাসাদের এক কোণে শবদাহের আয়োজন করা হলো। সব শেষ হয়ে গেলে মীরাবেন গান্ধীজীকে নিয়ে ঘরে ফিরলেন ; গান্ধীজীর পাশে চলতে চলতে দেখা গেল তাঁর গাল বেয়ে চোখের জল নামছে। গান্ধীজী মীরাকে বললেন, কস্তুরবা আমার আগে যাবেন, তাঁর মঙ্গলের জন্য আমি তাই চেয়েছি। কিন্তু আঘাতটা যে এতবড় হয়ে বাজবে, তা কখনো ভাবিনি।

তারপর একদিন আগা খাঁর প্রাসাদের দ্বার খুলে গেল, বন্দীরা বেরিয়ে এলেন। দেশ স্বাধীন হলো ; সব নেতারা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ক্ষমতা অধিকারের জন্য। গান্ধীজী একা ঘুরতে লাগলেন বাঙলা, বিহার ও দিল্লী,—সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা শান্ত করতে। দিল্লীতে আমরণ অনশন শুরু করেও ফাঁড়া কেটে গেল, কিন্তু ঠেকানো গেল না আততায়ীর গুলীকে। ছেলেবেলায় বৃদ্ধা দাইয়ের মুখে যে শব্দ সর্বদা শুনতেন, সেই রাম নাম উচ্চারণ করতে করতে গান্ধীজী মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

মীরা গান্ধীজীর সমর্থন পেয়ে হৃষীকেশ অঞ্চলে হিমালয়ের পাদদেশে নিজে আশ্রম খুলে গো-সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। রেডিও খবর দিল গান্ধী হত্যার। মীরা বাইরে এসে হিমালয়ের ছায়াঘন মৌন শিখরগুলির দিকে চেয়ে আপন মনে বললেন, এতদিন আমার শুধু দু'জন ছিলেন,—ঈশ্বর ও বাপু। সেই দু'জন আজ একজন হয়ে গেলেন।

রাজধানীতে শবযাত্রার আয়োজন চলছে। অহিংসার বীরের প্রতি সম্মান

প্রদর্শনের জন্য তলব্ করা হলো সামরিক বাহিনীর। লোকের দৃষ্টি হয়তো তারাই বেশি করে আকৃষ্ট করল। কিন্তু সেই বিপুল জনসমুদ্রে একটি দ্রষ্টব্য ছিল; সে ভ্রষ্ট-চরিত্র হীরালাল। কেউ তার খোঁজ রাখত না; হঠাৎ তাকে দেখা গেল গান্ধীজীর জন্য সাজানো চিতার পাশে। আত্মীয়স্বজনরা তার দিকে এগিয়ে যাবার উপক্রম করতেই সে জনতার মধ্যে মিশে গেল,—আর খোঁজ পাওয়া গেল না।

গান্ধীজী তখন দিল্লীতে সাম্প্রদায়িক মিলনের জন্য অনশন শুরু করেছেন। একদিন সকালে সুশীলা নায়ার জিজ্ঞাসা করলেন, বাপুজী, কাল রাত্রিতে আপনি ঘুমের মধ্যে দু'হাত উপরে তুলে এমন ভঙ্গী করতে লাগলেন, যেন কিছু একটা বেয়ে বেয়ে উপরে উঠতে চাইছেন। এর মানে কী? গান্ধীজী বললেন, কাল সারা রাত ধরে স্বপ্ন দেখেছি, যেন একটা দেওয়াল পার হতে চাই, কিন্তু কিছুতেই দেওয়ালের উপরে উঠতে পারছি না।

ধ্যানের ভারতে পৌঁছবার পথে যে বাধার প্রাচীর আছে, তা গান্ধীজী সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে পারেননি। তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামীরা এখনো সেই প্রাচীর বেয়ে ওঠবার চেষ্টা করছেন। আমাদের উপেক্ষা ও অবজ্ঞা তাঁদের লক্ষ্যচ্যুত করতে পারেনি। কারণ মনুষ্যত্বের উপরে আস্থা হারানো এঁদের ধর্ম নয়। বাপুজী বলেছেন: You must not lose faith in humanity. Humanity is an ocean. If a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty.

Publishers: Dodd, Mead & Co.; New York. 3.00.

চিতোয়া

মানুষের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার শেষ নেই। পৃথিবীর যেখানে যতটুকু স্থান আছে তার উপর সে আধিপত্য করতে চায়। বনজঙ্গল কেটে চাষ শুরু করে, ফসলের জমির পাশে পাশে জনপদ গড়ে ওঠে। বন-বাদাড়ে যাদের বাসস্থান, সেই পশুপক্ষীরা যেন পৃথিবীর সন্তান নয়, তাদের যেন বাঁচবার অধিকার নেই। এদের বাসস্থান দ্রুত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে লোপ পেয়ে যাচ্ছে কত বন্য-পশু। অকারণে, শুধু আনন্দলাভের জন্যও, মানুষ তাদের হত্যা করছে। মানুষের এই অবিবেচনায় বিক্ষুব্ধ হয়েছিল উত্তর-পূর্ব ভারতের অরণ্যবাসী একটি চিতাবাঘ। তার নাম চিতোয়া। এই চিতোয়ার জীবনী লিখেছেন: James Temple তাঁর Leopard of the Hills নামক গ্রন্থে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের গভীর অরণ্যে এক গুহার মধ্যে চিতোয়ার প্রথম দেখা পাই। তার বোন কাঞ্চী ও ভাই ময়লার সঙ্গে মা'র জন্য অপেক্ষা করছে। মা সারারাত্রি বাইরে শিকার করে; বাচ্চাদের সে সময়টা উপবাস করে থাকতে হয়। সকালবেলা ফিরে এলে দুধ পায়। একটু যখন বড় হলো, চোখ ফুটল, তখন মা'র সঙ্গে গুহার বাইরে যাতায়াত আরম্ভ করল। মা তাদের একটু একটু করে শিক্ষা দিচ্ছে কি করে শিকার ধরতে হয়, বিপদের আভাস পেলে আত্মগোপন করতে হয়। চিতোয়া তার ভাই ও বোনের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী; অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শিকারের কৌশল শিখে একাই ছোট ছোট শিকার ঘায়েল করতে লাগল। একদিন ওরা শিকারের অপেক্ষায় ওৎ পেতে বসে আছে, এমন সময় শিবরিলিঙ চা-বাগানের একদল মজুর বনের মধ্য দিয়ে শোভাযাত্রা করে গেল। চিতোয়া এই প্রথম মানুষ দেখল। তার মা এত বড় বড় প্রাণী শিকার করে, অথচ মানুষদের কেন যে ছেড়ে দিল চিতোয়া তা বুঝতে পারল না। এর অল্পদিন পরেই চিতোয়ার প্রত্যক্ষরূপে সাক্ষাৎ হলো মানুষের মারমূর্তির সঙ্গে। একদিন সন্ধ্যায় শিকারের সন্ধানে বেরিয়ে ওরা দেখতে পেল একটা ছাগল। চিতোয়া সকলের আগে গিয়ে আক্রমণ করল। ওটা ছিল শিকারীর ফাঁদ। হঠাৎ মাচা থেকে সার্চ-লাইটের তীব্র আলো এসে পড়ল চিতোয়ার উপর। বনের ফাঁক দিয়ে চাঁদ উঠছে মনে

করে চিতোয়া মুখ তুলে চাইল, আর সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল বন্দুকের শব্দ। একটা গুলি চিতোয়ার কান ভেদ করে গেল; ভয়ে তাড়াতাড়ি একটা খাদের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে আত্মরক্ষা করল চিতোয়া। সেই থেকে রাত্রিতে তীব্র আলো দেখলেই ও চমকে উঠত। এক রাত্রিতে কাঞ্চী মানুষের পাতা ফাঁদে আবদ্ধ হয়ে পড়ল। সারারাত কাঞ্চী ভিতর থেকে এবং চিতোয়া বাইরে থেকে চেষ্টা করেও খাঁচার দরজা খুলতে পারল না। সকালবেলা কোথা থেকে অনেকগুলি লোক এসে খাঁচাশুদ্ধ কাঞ্চীকে কাঁধে করে কোথায় নিয়ে গেল। চিতোয়া দূরে ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখল, কিন্তু করতে পারল না কিছুই। আর একদিন রাত্রিতে হঠাৎ সমস্ত বন আলোর বন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, শব্দ শোনা গেল বন্দুকের। চিতোয়া ও ময়লা অন্ধকারে লুকিয়ে দেখল তাদের মা ধুলায় লুটিয়ে পড়েছে। কতকগুলি লোক এসে ওদের মা'র দেহ দড়ি দিয়ে বেঁধে বাঁশের সাহায্যে কাঁধে করে চলে গেল। এবার চিতোয়ার একমাত্র সঙ্গী ময়লা। কিন্তু সে-ও একদিন কোথায় গিয়ে বাসা বাঁধল, আর খোঁজ পাওয়া গেল না। চিতোয়া এখন একা-একা বনে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু আগের মতো স্বস্তি নেই। বন কেটে কেটে শিব্‌রিলিঙ চা-বাগান ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। প্রায়ই মানুষের সঙ্গে দেখা হয়, স্বচ্ছন্দগতিতে বাধা পায়; শিকারীরা উত্যক্ত করে তোলে। মানুষ ফাঁদ পাতে; সেই ফাঁদে চিতোয়া একদিন ধরা পড়ল। কাঞ্চীর মতো তাকেও খাঁচাশুদ্ধ কয়েকজন লোক কিছুদূর বয়ে নিয়ে এল, তারপর তুলে দিল একটা লরীতে। হয়তো কোনো সার্কাসের মালিক কিংবা বিদেশের কোনো চিড়িয়াখানা তাকে কিনে নিয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে খানিকটা গিয়ে লরীটা উলটে পড়ল: প্রচণ্ড ধাক্কায় খাঁচার দরজা গেল খুলে, চিতোয়া আবার ফিরে এল তার বনে। কিন্তু বেশি দিন শান্তিতে থাকতে পারল না। এক শিকারীর গুলিতে তার পিছনের একটি পা গেল প্রায় অকর্মণ্য হয়ে। এখন আর আগের মতো ছুটে শিকার ধরতে পারে না। প্রায়ই না খেয়ে থাকতে হয়। দেহ পঙ্গু হয়ে পড়ায় সে বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করল। দেখল শিব্‌রিলিঙ চা-বাগানের কুলি বস্তি থেকে ছাগল কুকুর শিকার করা অনেক সহজ। কারণ বন্য-পশুর মতো এরা দ্রুত ছুটে পালাতে পারে না। হয় দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে, না হয় খোঁয়াড়ে আটক থাকে। একদিন একপাল ছাগল আক্রমণ করায় কিশোর রাখাল চিতোয়াকে লাঠি নিয়ে আক্রমণ করতে এলো। চিতোয়া তখন ছাগল ছেড়ে রাখালকেই ধরল।

মানুষ শিকার এই তার প্রথম। দেখল, মানুষের মাংস সুস্বাদু, এবং শিকার করতেও বিশেষ বেগ পেতে হয় না। এর পর থেকে চিতোয়া মানুষের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করল। এতদিনে তার সঞ্চিত ক্ষোভ হিংসার মূর্তিতে দেখা দিল। মানুষ দেখতে পেলেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ে, শিকার টেনে নিয়ে যায় গভীর জঙ্গলে। বেপরোয়া হয়ে চিতোয়া ঘরের বেড়া ভেঙ্গে নিদ্রিত নর-নারী শিকার করে। কুলি-বস্তী জনশূন্য হয়ে পড়ল ভয়ে, ঘরে ঘরে তালা পড়ল। এদিকে চা বাগানের কর্তৃপক্ষ তৎপর হয়ে উঠল চিতোয়াকে মারবার জন্য। চিতোয়া এর মধ্যে আর একবার ফাঁদে পড়েছিল এবং একটি পা জখম করে মুক্তি পেতে হয়েছিল। শরীর যত অক্ষম হয়ে পড়ে চিতোয়ার সাহস ততই দুর্জয় হয়। কিন্তু তার দিন শেষ হয়ে এসেছে। একদিন গাছের উপর থেকে বন্দুকের গুলি এসে তার কাঁধে বিদ্ধ হলো। বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়েও সে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করল। কোথায় তার শত্রু? দেখতে পেল না। আর চলবার শক্তি নেই; কয়েক পা এগিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু মরবার আগেও শান্তি নেই। শুনতে পেল মানুষের পায়ের শব্দ। শব্দ যখন নিকটবর্তী হলো তখন যন্ত্রণাক্লিষ্ট চোখে চিতোয়া একবার চাইল। দেখল, দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ একটি লোক এগিয়ে আসছে তার দিকে। পলকের মধ্যে চিনতে পারল চিতোয়া; একে দেখেছে বনে ঘুরতে একটা লাঠির মতো কি হাতে নিয়ে। সেই লাঠির মুখ দিয়ে সশব্দে আগুন বের হয়; তাতেই মারা গেছে তার মা। জীবনের এই শেষমুহূর্তে দেখা পেল তার পরম শত্রুর। চিতোয়ার চোখ প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠল। শেষবার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে চিতোয়া ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুর উপরে। গৌরবর্ণ লোকটিকে সে ধরাশায়ী করল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে শিকার সাবাড় করবার শক্তি আর নেই। শত্রুর সঙ্গীর গুলিতে চিতোয়ার মাথার খুলি উড়ে গেল।

লেখক তাঁর দীর্ঘকালের শিকারের অভিজ্ঞতার সাহায্য এখানে চিতাবাঘের জীবন-যাত্রার একটি নিখুঁত ছবি দিয়েছেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাদের দিন কেমন করে কাটে তার বর্ণনাটি তথ্যানুসারী হয়েও সুখপাঠ্য। বিশেষ করে চিতোয়া পাঠকের মন গভীরভাবে আকৃষ্ট করবে। মানুষের চরিত্রের মতোই সে জীবন্ত। চিতোয়াকে একা পাই না, সমস্ত বন ও অন্যান্য পশুপক্ষীর পট-ভূমিকায় চিতোয়া ফুটে উঠেছে। বইটি নিঃসন্দেহে নতুনত্বের দাবী করতে পারে।

Publishers : G. Bell ; London. 12/6.

অচ্ছুত

উত্তর প্রদেশের মোরাদাবাদ জেলার এক ধাঙ্গড় পরিবারের ছেলে হাজারি। বংশপরম্পরায় তারা আবর্জনা পরিষ্কার করে আসছে; থাকে অস্পৃশ্যদের জন্য নির্দিষ্ট পৃথক পাড়ায়। ছেলেবেলা থেকেই হাজারি তার সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন ছিল। গ্রামের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গেলে তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দু ছেলেরা দূর থেকে চিৎকার করে পথিকদের সাবধান করে দিত, "অচ্ছুত আসছে।" সৌভাগ্যক্রমে তাকে গ্রামের সেই আবহাওয়ায় বেশিদিন থাকতে হয় নি। তার বাবা সপরিবারে দেরাদুন, মুসৌরি, সিমলা প্রভৃতি শহরে ঘুরে ঘুরে সাহেবদের বাড়ী চাকরি করতে আরম্ভ করল। মা-ও কাজ নিল আয়ার। বালক হাজারি ছোট ভাই-বোনদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাড়ী থাকত। সকাল বেলা জানালা দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখত দল বেঁধে ফুট-ফুটে ছেলেমেয়ের দল ইস্কুলে যাচ্ছে। তারও আকাঙ্ক্ষা হতো অমনি ইস্কুলে যেতে। কিন্তু তার উপায় কী? কিছুদিন পরেই তাকে টেনিস ক্লাবে বল কুড়াবার কাজ নিতে হলো। আর একটু বড় হয়ে হাজারি কাজ করতে লাগল বিভিন্ন হোটেলে। নিজেদের বাড়ীতে যে সব লোক তাকে অস্পৃশ্য বলে অবজ্ঞা করেছে তারাই হোটেলে বসে অম্লানবদনে হাজারির হাত থেকে নিষিদ্ধ খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে।

শহরের সামাজিক পরিবেশ ছিল অপেক্ষাকৃত মুক্ত। এখানে সারাক্ষণ জন্মের পরিচয়টা কাঁটা হয়ে বিঁধত না। তবু দরিদ্রের কোথায় বা সম্মান আছে! হাজারি দেখেছে মনিবের কাছে বাকী মাইনে চাইতে গিয়ে শাদা গেঞ্জির উপর জুতোর ছাপ নিয়ে তার বাবা ঘরে ফিরেছে। পুত্রের কাছে এই লাঞ্ছনা গোপন করবার জন্য কত ছলনাই না করত তার বাবা! এ সম্বন্ধে তার নিজের অভিজ্ঞতাও কম নয়। হোটেলে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি; খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে। এক টুকরো অ-বিক্রেয় বাসি রুটি এবং একটু চা খাবার আয়োজন করছে, এমন সময় হঠাৎ মালিক এসে হাত থেকে ক্ষুধার গ্রাসটুকু টেনে নর্দমায় ফেলে দিয়ে মাথায় এক চাঁটি বসিয়ে দিল। অভিযোগ,—চুরি করে খেয়ে হোটেলের সর্বনাশ করছে।

হাজারির সৌভাগ্য সে অনেক সহৃদয় প্রভু পেয়েছে তার কর্মজীবনে।

তাঁদের উৎসাহে ও সাহায্যে সে লেখা-পড়া শিখতে লাগল কাজের ফাঁকে ফাঁকে। তারপর এক বিদেশীর অর্থানুকূল্যে পড়তে গেল প্যারিস। যেন রূপকথা। সেই ধাঙড়ের ছেলে তার আত্মজীবনী লিখেছে। বইটির নাম Autobiography of an Indian outcaste. ছোট্ট ভূমিকা লিখেছেন গান্ধীজীর দক্ষিণ আফ্রিকার সহকর্মী পোলক। লেখকের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে, তাঁর প্রথম জীবনের অপমানের জন্য কোনো উষ্মা নেই, নিজের বেদনাকে নিয়ে উচ্ছ্বাসও প্রকাশ করা হয়নি।

এই আত্মজীবনীর কয়েকটি বিশেষ অংশ মনে দাগ রেখে যায়। হাজারি দুবেলার অন্নের সংস্থান করেছে। তারপরে মনে জাগল ধর্ম নিয়ে দ্বন্দ্ব। যে ধর্ম তাকে মনুষ্যত্বের পূর্ণ মর্যাদা দেয় না সে ধর্মই কি তাকে ঈশ্বরানুভূতির পথে এগিয়ে দিতে পারবে? অথচ ঈশ্বরানুভূতি ছাড়া আত্মার দ্বন্দ্ব ঘুচবে কি করে? কারণ,

For a hungry man there is no rest but in food,
For a restless spirit there is no rest but in God.

বিদেশ-যাত্রার পূর্বে মা-বাবার কাছ থেকে বিদায় নেবার দৃশ্যটা বড় করুণ। দূরত্বটা শুধু ভৌগোলিক নয়, হাজারি তার শিক্ষা ও মানসিকতা নিয়ে এক নতুন জগতে প্রবেশ করছে, যে জগতের সঙ্গে পিতৃপুরুষের কোনোকালে পরিচয় ছিল না, যেখানে তার মা বাবা অন্ত্যজ। এটা শুধুই মামুলী বিদায় গ্রহণ নয়, একেবারে নাড়ীর বন্ধন ছিঁড়ে যাওয়া! ভাষার সংযমে, ভাবের গভীরতায়, গ্রন্থের এই অংশটি সর্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী।

পনেরো বছর বয়সে কিশোর হাজারি এক শ্বেতাঙ্গ তরুণীর প্রেমে পড়েছিল। সেই অধ্যায়টি একটি নিটোল প্রেমের কবিতার মতোই সুন্দর। হাজারি তখন এক মেম সাহেবের ভৃত্যের কাজ করত। একবার সে কর্ত্রীর সঙ্গে কাশ্মীর বেড়াতে গেল। সেখানে মিস জোয়ান এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। রোজ তারা নৌকা করে ডাল হ্রদে বেড়াতে যেত। জোৎস্না রাত্রির অপূর্ব মোহময় পরিবেশে কিশোর হাজারি পুরুষের শাশ্বত স্বপ্নের রূপায়ন দেখল জোয়ানের মধ্যে। হাজারি সর্বদা জোয়ানের পাশে পাশে থাকে, সে ফাই-ফরমাশ তামিল করবার ভৃত্য। জুতার ফিতা খুলে দেয়; গা থেকে কোট খুলে নেয়; চায়ের কাপ তুলে দেয় জোয়ানের হাতে। এত কাছে কাছে থাকে, বর্ণোজ্জ্বল দেহের সুগন্ধ

নির্বোধ কিশোরকে আবেগ-চঞ্চল করে তোলে। মুখ তো বন্ধ; কিন্তু হাজারির চাঞ্চল্য কি জোয়ানের মনে সাড়া জাগায়নি? জোয়ান কাশ্মীর ছেড়ে চলে যাবার আগের দিন সন্ধ্যায় দু'জনে বেড়াতে বেরিয়ে একটা পোলের উপর অনেকক্ষণ চুপ করে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থেকে আবার হোটেলে ফিরে এলো। পরদিন সকালে জোয়ান চলে যাবার পর হাজারি জানতে পারল সে তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু তার কর্ত্রী সম্মত হয়নি। কথাটা জেনে হাজারি কান্নায় ভেঙে পড়ল। এ কান্নার অন্তরালে একটু সান্ত্বনাও হয়তো ছিল। বাণভট্টের 'তাম্বুল-করঙ্ক-বাহিনী' পত্রলেখার কিন্তু চোখের জল পড়েনি।

কয়েক বছর পরে জোয়ানকে হাজারি দেখতে পেয়েছিল দিল্লীর পলো খেলার মাঠে। জোয়ানের তখন বিয়ে হয়েছে; হাজারিকে চিনতে পারেনি। না চিনুক, তার জন্য ওর ক্ষোভ নেই। ধাঙড়ের ছেলেকে কে-ই বা চিনতে চায়?

Publishers : Bannisdale Press ; London. 10/6.

কালো হাঁস

টমাস মানের বড় উপন্যাসের চেয়ে ছোট উপন্যাস বা বড় গল্পই আমার পছন্দ। তাঁর নবতম গ্রন্থ 'দি ব্ল্যাক সোয়ান' এই ধারণাকে দৃঢ় করবার সুযোগ দিয়েছে। বিস্মিতও করেছে। মানের আশি বৎসর বয়সে রচিত একশ আটাশ পৃষ্ঠার এই কাহিনীর মধ্যে কোথাও বার্ধক্যের ছাপ পড়েনি। বরং তাঁর পূর্বের অনেক রচনা অপেক্ষা এর আবেদন গভীরতর। তাছাড়া মানের কতকগুলি স্বাভাবিক মুদ্রাদোষ থেকে মুক্ত হওয়ায় গল্পটি সাবলীল ও সুখপাঠ্য হয়েছে। 'ব্ল্যাক সোয়ানের' পূর্ববর্তী দুটি উপন্যাস 'ডক্টর ফস্‌টাস' ও 'হোলি সিনার' আকারে অনেক বড়। জার্মান দর্শন ও পুরাণের উপর তাদের ভিত্তি। 'ডক্টর ফস্‌টাসে'র সিফিলিস রোগগ্রস্ত নায়ক এবং 'হোলি সিনারে'র ঈডিপাস-জাতীয় অবৈধ প্রেম উপন্যাসের কাহিনীর পক্ষে যথেষ্ট আকর্ষণীয় হ'লেও 'ব্ল্যাক সোয়ানে'র গল্পের মতো তা অন্তরঙ্গ ও মর্মস্পর্শী হ'তে পারে না। বাইবেল, পুরাণ ও দর্শনলোক থেকে মান নেমে এসেছেন ঘরোয়া অন্তরঙ্গ পরিবেশে। বেঁচে থেকেও একটি নারীর ফুরিয়ে যাবার বেদনা, তার দুরাকাঙ্ক্ষা এবং মর্মান্তিক পরিণতি 'ব্ল্যাক সোয়ান'-এর পাঠকদের মনে সহজেই সাড়া জাগাতে পারবে।

একটি মেয়ে এবং একটি ছেলে নিয়ে রোজালি বিধবা হয়েছে। তার বয়স হ'লো প্রায় পঞ্চাশ। মেয়ের বয়স তিরিশের কাছাকাছি। ছেলে মেয়ের চেয়ে বারো বছরের ছোট। জার্মানীর একটি ছোট শহরে ছেলে-মেয়ে নিয়ে বেশ শান্তিতেই দিন কাটছে রোজালির। মেয়ের এখনো বিয়ে হয়নি। হবে এমন সম্ভাবনাও নেই। প্রথম যৌবনে একটি তরুণকে দেখে অ্যানা ভুলেছিল। কিন্তু তার মন পায়নি, পেয়েছে বেদনা। তারপর থেকে অ্যানা মন গুটিয়ে নিয়েছে, প্রেমের স্বপ্ন সে-মনকে আর স্পর্শ করতে পারে না। জন্ম থেকেই অ্যানার একটি পা একটু বিকৃত, চলে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে। সংসারের উপর অভিমান করে সে দূরে সরে গেল। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ অনুভূতির মোহ অপেক্ষা স্পর্শাতীত সৌন্দর্যের সাধনা তার ভালো লাগে। অ্যানা ছবি আঁকে। তার ছবিতে হৃদয়াবেগের ছোঁয়া নেই। সে কিউবিস্ট। রোজালি অনেক সময় মেয়ের ছবির মধ্যে জ্যামিতির রেখা ছাড়া কিছু দেখতে পায় না।

পঞ্চাশ বছর বয়সেও রোজালির জীবনের উপর গভীর আসক্তি। মাথার চুল তামাটে হ'য়ে উঠলেও দেহের বাঁধুনি এখনও অটুট আছে। এখনো তুচ্ছ আনন্দে উচ্ছল হ'য়ে ওঠবার ক্ষমতা আছে তার। জীবনকে উপভোগ করবার আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয়নি। তাই জীবনের সবকিছু সম্বন্ধে কৌতুহলের শেষ নেই। কিন্তু যত গভীরভাবেই রোজালি জীবনকে জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করুক, প্রকৃতির নিয়মকে তো অস্বীকার করা চলে না। রোজালি অত্যন্ত বেদনার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করছে, সে ফুরিয়ে যাচ্ছে। প্রাণের অঙ্কুর লালন করে পৃথিবীকে নতুন নাগরিক উপহার দেওয়া নারীজীবনের প্রধান ধর্ম। কিছুদিনের মধ্যেই রোজালি নারীদেহের এই বিশেষ লক্ষণটি হারাবে। এখনই দেহে কিছু কিছু পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছে। তার পরও বেঁচে থেকে লাভ কি? তখন তো সে নারীত্বের মর্যাদা পাবে না; নারীর খোলস হবে। ধান থেকে চাল চলে যাবে, পড়ে থাকবে শুধু তুষ। রোজালির মন আশায়, আনন্দে, স্বপ্নে মশগুল; কিন্তু দেহ শুকিয়ে যাচ্ছে। মুমূর্ষু দেহ আশ্রয় করে এমন সজীব মন থাকবে কি করে? তাই দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। এই দ্বন্দ্ব কিছুদিন ধরে বিপর্যস্ত করে তুলেছে রোজালির জীবন। মন যতদিন বেঁচে আছে দেহকেও ততদিন সে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। সে ফুরিয়ে যাবে না, ইন্দ্রিয়শিখা নিভে যেতে দেবে না।

অ্যানা স্বেচ্ছায় দেহকে অস্বীকার করতে শিখেছে। মা ও মেয়ের মন বিপরীতধর্মী, তবু দু-জনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব। রোজালি অ্যানাকে খুলে বলেছে তার দ্বন্দ্বের কথা। অ্যানা তাকে বোঝাতে চেয়েছে: দেহের সঙ্গে-সঙ্গে মনেরও পরিবর্তন ঘটে। তা না হ'লে শরীর ও মনের দ্বন্দ্ব সারাক্ষণ অশান্তির কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়। এ ছাড়া স্বাভাবিকভাবে সন্তানধারণের ক্ষমতা লোপ পাওয়ায় দুঃখ করবার কিছু নেই। মাতৃত্বের গৌরব থেকে তো সে বঞ্চিত হবেনা! কিন্তু রোজালি এতে সান্ত্বনা পায় না। নারী সৃষ্টি করে বলেই তো মা হ'তে পারে। সৃষ্টির ক্ষমতাটাই বড় কথা। সেটা হারালে আর কী বাকি থাকে?

রোজালির মনে যখন এই দ্বন্দ্ব চলছে তখন তাদের পরিবারে এসে উপস্থিত হ'লো চব্বিশ বছরের আমেরিকান তরুণ কেন্ কীটন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ উপলক্ষ্যে সে য়ুরোপে এসেছিল। দেশে ফিরে যায়নি। রোজালিদের শহরে বাড়িতে বাড়িতে ইংরেজী শেখায় এখন। এডওয়ার্ড মাকে ধরল সে-ও ইংরেজী শিখবে। এখানকার পড়া শেষ করে ইংল্যাণ্ড কিংবা আমেরিকা পড়তে যাবার ইচ্ছা তার। ইংরেজী কিছু জানা থাকলে সুবিধা হবে। রোজালি সম্মত

হ'লো। কেন্ কীটন সপ্তাহে তিন দিন পড়াতে আসে এডওয়ার্ডকে। রোজালি মাঝে-মাঝে গিয়ে বসে পড়ানো শুনতে; কেন্-এর সঙ্গে ধীরে-ধীরে আলাপ জ'মে যায়। বিদ্যা-বুদ্ধিতে কেন্ সাধারণ। তার সহজ ব্যবহার বেশ ভালো লাগে। আদব-কায়দার সচেতনতায় সে কখনো আড়ষ্ট নয়। তাই অল্প সময়ের মধ্যেই সকলের সঙ্গে সে অন্তরঙ্গ হ'তে পারে। কেন্ এর সুগঠিত দেহে প্রাণের বন্যা যেন বাঁধা পড়ে আছে। জীবনবিলাসী রোজালিকে তার এই বৈশিষ্ট্য প্রথমেই আকৃষ্ট করল। রোজালি শুনেছে শহরের মেয়ে মহলে কেন্-এর প্রতিষ্ঠা বেড়ে চলেছে। কেন্ মেয়েদের সম্বন্ধে একটুও উদাসীন নয়। বরং কোনো কোনো মেয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে অনেক মুখরোচক কাহিনী রোজালির কানে এসেছে।

নিজের দিকে চেয়ে-চেয়ে রোজালি ভাবে, না, তার দেহ এখনো বাতিল হয়ে যায়নি। এখনো আকর্ষণ করবার ক্ষমতা আছে। যে-সব মেয়েরা কেন্-কে ভুলিয়েছে তাদের তুলনায় সে উপেক্ষার পাত্রী নয়। একটা গোপন, কুটিল আশা তাকে এগিয়ে নিয়ে যায়! কেন্-এর প্রায়ই নিমন্ত্রণ থাকে ডিনারের। ডিনার শেষ হয়, গল্প শেষ হয় না। কেন্-এর সামনে এলে আজকাল রোজালির ভাবান্তর ঘটে। কথাবার্তায় চাপা উত্তেজনা প্রকাশ পায়, মুখে রক্তের আভা ছড়িয়ে পড়ে, বিশেষ করে নাকের ডগা টুকটুকে হ'য়ে ওঠে। অ্যানার চোখ থেকে এ-সব কিছুই এড়ায় না। মা-র জীবনে ঋতুপরিবর্তনের বেদনা যে দ্বন্দ্ব এনেছে তাকে সে সহানুভূতির চোখে দেখে।

সেদিন খেতে বসে এডওয়ার্ড গরম লাগছে বলে কোট খুলে রাখল। কেন্ও অনুসরণ করল ছাত্রের দৃষ্টান্ত। কেন্-এর দুটি সুডৌল নগ্ন বাহুর দৃশ্য রোজালির রক্ত উত্তাল করে তুলল। অ্যানা লক্ষ্য করছে তার মা বার-বার চুরি করে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাচ্ছে কেন্-এর নগ্ন বাহু দুটির দিকে। একটা অস্থির দৃষ্টি রোজালির চোখে; ঐ দুটি হাত যেন তাকে পিষে মারছে। রোজালি যেন আর সইতে পারছে না, দম বন্ধ হ'য়ে আসছে, কি করে বসবে হঠাৎ, ঠিক নেই। অ্যানা মাকে বাঁচাল। ভাইকে লক্ষ্য করে বলল, 'ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে; তোমরা কোট পরো না!'

রোজালি বুঝতে পারল অ্যানার কাছে কিছু গোপন নেই। খাবার টেবিল থেকে বিদায় নিয়ে সে ছুটে গেল নিজের ঘরে। মুখ গুঁজল বালিশে। কী লজ্জা! আর কী আনন্দ! ভালোবাসার আনন্দ। আজ এই প্রথম নিজের

কাছেই স্বীকার করল সে কেন্-কে ভালোবেসেছে। সকল অন্তর দিয়ে কেন্-কে যেমন ভাবে কামনা করেছে এমন আর কাউকে কখনো করেনি। অ্যানার বাবা তাঁকে চেয়েছিল, সে সম্মতি দিয়েছে। সক্রিয় কামনার রূপ এর আগে দেখেনি। বিবাহিত জীবনে স্বামীর কামনার বন্যায় বাঁধনছেঁড়া নৌকোর মতো তার দেহ ভাসিয়ে দিয়েছে। ভেবেছে, সেটাই প্রেম। কিন্তু জীবনের প্রান্তসীমায় এসে একটি পুরুষকে দাবি করবার দুঃসাহস এলো কোথা থেকে? রোজালি ভাবে, এটা প্রকৃতির আহ্বান। নীতির দোহাই দিয়ে এই আহ্বানকে সে অগ্রাহ্য করতে পারবে না। কুমারীর হৃদয়ের মতো তার হৃদয় নতুন করে প্রস্ফুটিত হয়েছে। এত বড় একটা কথা কাউকে বলা যায় না। ছেলে-মেয়েকে নয়, কেন্-কেও নয়। কে জানে, কেন্ হয়তো হঠাৎ চমকে পালিয়ে যাবে। কত তরুণী তার জন্য সাধনা করছে।

অ্যানা কিছু বলে না। কিন্তু অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে মা-র রূপান্তর লক্ষ্য করছে। এডওয়ার্ডও কিছুটা বুঝতে পারে। একদিন মাকে এসে বলল, 'এবার মাস্টার তুলে দাও; ইংরেজী আর পড়ব না।'

রোজালি প্রতিবাদ করে, 'না, তা-ও কি হয়! কেন্ যখন ঘরের লোক হ'য়ে গেছে, তাকে আসতে নিষেধ করা যায় না। আর সে না এলে তোমাদেরও খারাপ লাগবে।'

শুধু বাড়িতে নয়, অন্য বাড়ির পার্টিতেও কেন্-এর সঙ্গে আজকাল প্রায়ই দেখা হয়। পার্টিতে রোজালিকে দেখে সবাই বিস্মিত হ'য়ে যায়। কী আশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছে তার! ঠিক বিশ বছরের যুবতীর মতো দেখায় তাকে। কেন্-ও আকৃষ্ট হয়েছে। ওর আকার ইঙ্গিত থেকে রোজালি বুঝতে পারে। প্রেম যে কায়কল্প রসায়নের কাজ করেছে তার জীবনে সে-কথা কাউকে বলতে না পেরে হাঁপিয়ে উঠেছে রোজালি। শেষ পর্যন্ত অ্যানাকে বলতে হ'লো। না বলে পারল না। অ্যানা তো শুধু তার মেয়ে না, বন্ধুও।

অ্যানা গভীর সহানুভূতির সঙ্গে শুনল মা-র কথা। বলল, 'মা, হৃদয়ের যে আকাঙ্ক্ষা বিচার ও যুক্তির সমর্থন লাভ করে, তাকেই বলি সত্য। তোমার এ প্রেম তো সত্য নয়, এটা শুধুই মোহ। কেন্-কে তুমি ছেলের মতো ভালোবাস, তোমার মোহ দূর হবে; তুমি বাঁচবে।'

রোজালি তা পারবে না। অ্যানা অনেক জানে; কিন্তু জানে না যে যুক্তি ও বিচারের বন্ধনে প্রেমকে বন্দী করা যায় না। অ্যানার জীবনে একবারের

জন্য যখন প্রেম এসেছিল তখন সে-ও তো যুক্তিকে ভাসিয়ে দিয়েছিল ! প্রকৃতি তাকে ডাক দিয়েছে। এ-আহ্বান অগ্রাহ্য করা অসাধ্য তার পক্ষে। কেন্‌কে সে ছাড়তে পারবে না।

একদিন সকালে মা-র ঘরে ডাক পড়ল অ্যানার। রোজালি তাকে বিস্ময়কর সংবাদ দিল। এতদিন পরে প্রকৃতি আবার ফিরিয়ে দিয়েছে তাকে নারীত্বের মর্যাদা ; সহজ স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশ পেয়েছে তার সন্তানধারণের ক্ষমতার চিহ্ন। প্রেম সঞ্জীবিত করেছে দেহকে। প্রেমের পরিপূর্ণ সার্থকতার পথে আর বাধা নেই। কেন্‌-কে বিয়ে করবে ? কিংবা মিলন হবে বিয়ের গণ্ডীর বাইরে ? কিন্তু গোপন থাকবে না। এডওয়ার্ডকে কেউ যদি এ নিয়ে ঠাট্টা করে তাহ'লে সে রক্তারক্তি কাণ্ড বাধিয়ে বসবে। হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা ও প্রচলিত নীতিবোধের মধ্যে যে সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে তার সমাধানের পথ খুঁজে পায় না রোজালি।

কিছুদিন পরেই রোজালির মধ্যে আর-একবার পরিবর্তন দেখা দিল। চোখ-মুখ থেকে তারুণ্যের দীপ্তি ধীরে-ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। শরীরের এখানে-ওখানে মাঝে-মাঝে ব্যথা দেখা দেয়। রোজালি কোনো অসুখ হয়েছে বলে স্বীকার করে না। বিশেষ করে কেন্‌-এর কাছ থেকে বার্ধক্যের পুনরাগমন সযত্নে গোপন করে চলে।

এক রবিবার রোজালি, অ্যানা, এডওয়ার্ড ও কেন্‌ বেড়াতে গেছে একটা পুরনো দুর্গে। আরো অনেক দর্শক এসেছে। গাইড সব দেখাচ্ছে। এখানে সকলকে এড়িয়ে রোজালি কেন্‌-কে প্রেম নিবেদনের সুযোগ পেল। আজ রাত্রিতেই সে তার কাছে যাবে—এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে কেন্‌-এর নিকট থেকে মুক্তি পেল রোজালি। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারল না। অ্যানা সে-রাত্রিতে রোজালিকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখতে পেল। বিছানা রক্তে লাল হ'য়ে গেছে। তক্ষুনি হাসপাতালে পাঠানো হ'লো। অস্ত্র করতেও বিলম্ব হ'লো না। ডাক্তার বলল, গর্ভাশয়ের ক্যান্সার। পেটের অন্যান্য অংশেও ক্ষত ছড়িয়ে পড়েছে। রোজালিকে বাঁচানো গেল না।

ক্যানসারের ক্ষত থেকে নির্গত রক্তধারাকে রোজালি নারীত্বের পুনরুজ্জীবন মনে করে উল্লসিত হ'য়ে উঠেছিল। জীবনদেবতার এই মর্মান্তিক পরিহাসই 'ব্ল্যাক সোয়ানে'র ট্র্যাজেডি। যক্ষ্মা এবং সিফিলিসের রোগীদের মধ্যে দেখা যায় যে রোগে আক্রান্ত হবার পর কখনো-কখনো তাদের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ

হয়। 'ডক্টর ফস্‌টাসে'র নায়ক সিফিলিস রোগগ্রস্ত হ'য়েও আশ্চর্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিল। রোজালির গর্ভাশয়ে ক্যান্‌সার বীজাণু প্রবেশ করে প্রথম যে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল তারই ফলে ক্ষণস্থায়ী যৌবনের আভাস ফুটে উঠেছিল। রোজালি একে স্বাভাবিক ভেবে যখন উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে তখন ভাবতেও পারেনি কত বড় ফাঁকি এর মধ্যে লুকিয়ে আছে।

ট্র্যাজেডি ও আয়রনি সৃষ্টির এই টেক্‌নিক মানের রচনায় নতুন নয়। তাঁর হাতে এরকম পরিণতিই স্বাভাবিক। কিন্তু মানের সাহিত্যে রোজালির চরিত্র একটু নতুন ধরনের। সাধারণতঃ তাঁর নায়ক-নায়িকারা শিল্পী, দার্শনিক অথবা জার্মান পুরাণকাহিনীর চরিত্র। ধর্ম, শিল্প ও দর্শনের সঙ্গে জীবনের সংঘাত দেখা দেয়, তার ফলে আসে ট্র্যাজেডি। 'ব্ল্যাক সোয়ান' পড়বার পর মানের আর একটি গল্পের কথা মনে পড়ে। 'ডেথ ইন্‌ ভেনিস'-এর (১৯১২) নায়ক একজন বিখ্যাত প্রবীণ সাহিত্যিক। ভেনিসে বেড়াতে গিয়ে একটি পোলিশ কিশোরের মধ্যে দেখতে পেলেন শিল্পী ও সাহিত্যিক যে আদর্শ সৌন্দর্যের সাধনা করে তার জীবন্ত রূপায়ন। তিনি মুগ্ধ হলেন; সবকিছু ত্যাগ করে কিশোরের জন্য ভেনিসেই থেকে গেলেন। কিন্তু রোজালির কেন্‌-এর প্রতি আকর্ষণটা স্থূল ও সাধারণ। এই আকর্ষণের মূলে ধর্ম, দর্শন বা শিল্পের প্রেরণা নেই। সেজন্যই রোজালিকে আমাদের কাছের মানুষ বলে মনে হয়।

Publishers : Secker & Warburg ; London. 8/6.

মহারাণী

ইংরেজ আমলে দেশী রাজ্যগুলি ছিল রূপকথার দেশ। এদের ঐশ্বর্য ও বিলাসিতার কাহিনী পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে অনেক বই লেখা হয়েছে; কিন্তু এই ঐশ্বর্য ও বিলাসিতার মধ্যে যারা মানুষ, তাদের জীবনের অন্তরঙ্গ ছবি পাওয়া যেতে পারে এমন বই বেশী নেই। কর্পূরতলার মহারাণী বৃন্দা এমনি একটি বই লিখেছেন। নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত Maharani তাঁর আত্ম-চরিত। এখানে ভারতের একটি প্রসিদ্ধ দেশীয় রাজ্যের মহারাণী তাঁর জীবনের সুখ-দুঃখের যে অন্তরঙ্গ ছবি এঁকেছেন তা আর কোথাও আছে বলে জানা নেই। গ্রন্থের ভাষা অবশ্য বৃন্দার নয়। তিনি যে কাহিনী বলেছেন শ্রীমতী উইলিয়ামস তা লিপিবদ্ধ করেছেন।

হিমালয়ের পাদদেশে ক্ষুদ্র রাজ্য জব্বল; এখানকার শাসকেরা রাজপুত। এই রাজবংশে বৃন্দার জন্ম হয়। জব্বলের রাজা বৃন্দার জ্যেঠামশাই। এক বৃহৎ একান্নবর্তী রাজপরিবারে বৃন্দার জীবন আরম্ভ হলো। বৃন্দার বাবা ছিলেন কর্পূরতলার মহারাজার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বৃন্দার অসামান্য রূপ দেখে মহারাজা প্রস্তাব করলেন, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র টিকা রাজের (যুবরাজের) সঙ্গে বিয়ে দেবার। বৃন্দার বাবা কথা দিলেন; কিন্তু বৃন্দার মা বেঁকে বসলেন। কর্পূরতলার রাজপরিবার শিখ; রাজপুত হয়ে কি করে সেখানে মেয়ে দেবেন। কথা দেওয়া হয়ে গেছে, সুতরাং শেষ পর্যন্ত এই আপত্তি টিকল না।

ঘরে আনবার পূর্বে পুত্রবধূকে শিক্ষা দেবার বন্দোবস্ত করলেন মহারাজা। বৃন্দাকে বাড়ী থেকে এনে রাখা হলো এক ইংরেজ গভর্ণেসের তত্ত্বাবধানে। তারপর এলো এক ফরাসী গভর্ণেস! ফরাসী গভর্ণেসের ঐকান্তিক আগ্রহে বৃন্দাকে পাঠানো হলো প্যারিস। সে যুগে এটা খুব দুঃসাহসের কাজ ছিল। কর্পূরতলা ও অন্যান্য দেশীয় রাজ্যে তখনো পর্দাপ্রথার কঠোরতা ছিল। য়ুরোপে শিক্ষিতা মেয়েকে ঘরে আনলে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হবে,—এই গর্ববোধ থেকেই কর্পূরতলার মহারাজা বৃন্দাকে প্যারিস পাঠাতে সম্মত হয়েছিলেন।

বৃন্দা দু'দিনেই ভারতকে ভুলে প্যারিসের সমাজে ডুবে গেলেন। তাঁর

কিশোর মনে প্যারিস যে প্রভাব বিস্তার করল, তার ফলে তিনি চিরদিনের জন্য ভারতের সমাজ ও জীবনযাত্রার আদর্শ থেকে দূরে চলে গেলেন। ষোল বৎসর পর্যন্ত বৃন্দার প্যারিসের স্কুলে, থিয়েটারে ও নাচের আসরে কাটল। কর্পূরতলার ভবিষ্যৎ যুবরাণী বলে সর্বত্রই তাঁর সমাদর। একবার এক ফরাসী যুবক তাঁকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করল। বৃন্দাও তাকে ভালোবেসেছেন মনে মনে। টিকা রাজের সঙ্গে বিয়ের কথা স্থির হয়েছে, কিন্তু তখনো ভালোবাসবার মতো পরিচয় হয়নি। বৃন্দার প্রেমিক ফরাসী গল্প শোনায়। সে বলে, পৃথিবীতে জন্ম হবার পূর্বে ভগবান জীবাত্মাকে দু'ভাগে ভাগ করেন; পৃথিবীতে এসে এক ভাগ দিয়ে সৃষ্টি হয় পুরুষ, অন্য ভাগ দিয়ে নারী। বিভক্ত জীবাত্মা এক হবার জন্য ব্যাকুল হয়ে কোন্ পুরুষের মধ্যে কোন্ নারীর মধ্যে সে ছড়িয়ে আছে তার সন্ধান করতে থাকে। এই এক হবার ব্যাকুলতাই প্রেম; দুই অর্ধাংশ এক হলেই মিলন হলো পরিপূর্ণ। বৃন্দা, তোমার মধ্যে আমি দেখা পেয়েছি আমার অর্ধাংশের। চলো, আমরা পালিয়ে যাই।

বৃন্দা প্রলুব্ধ হলেন। কিন্তু সেই বালিকার মধ্যে যে চিরন্তনী ভারতীয় নারী ছিল, সে তাঁকে রক্ষা করল। তিনি ফিরে এলেন কর্পূরতলায়। কিন্তু কেউ কাউকে ভুলতে পারেননি। প্রথম মহাযুদ্ধে এই যুবক যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যায়। তার পকেট থেকে পাওয়া গিয়েছিল বৃন্দার দেওয়া উপহার।

যে কিশোরী প্যারিসের থিয়েটারে ও নাচের আসরে ঘুরে এসেছে, তাকে প্রবেশ করতে হলো অন্দরমহলে, পর্দার অন্তরালে। এশিয়া ও য়ুরোপের দুই জগতের মধ্যে বৃন্দার জীবন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল।

বিয়ের আয়োজন আরম্ভ হলো। বিশেষ জাহাজ করে ফ্রান্স থেকে একশ' এবং ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা থেকে প্রায় তিনশ' বিদেশী অতিথি এসে পৌঁছল। ভারতের দেশীয় নৃপতিরা এলেন একে একে; আর এলেন মহামান্য আগা খাঁ। ভিখারী, সাধু-সন্ন্যাসী ও প্রজার দল রবাহুত হয়ে এসে সহরের অলি-গলি ভরে ফেলল। সহরের বাইরে মাঠে গড়ে তুলতে হলো শিবির নগরী। বিয়ের জমকালো অনুষ্ঠানের বিবরণ চিত্তাকর্ষক। কনের পোষাক খাঁটি সোনার সুতা ও রেশমের সুতা দিয়ে হাতে তৈরি করা হয়েছে; সময় লেগেছে দু'বছর। মাথার ঘোমটার কাপড় শুধুই সোনার সুতা দিয়ে তৈরি। মুকুট থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত মণি-মুক্তা, হীরা-জহরতে মোড়া।

বিয়ের পর বৃন্দা আবিষ্কার করলেন তাঁর স্বামী দুর্বলচিত্ত ও বিষণ্ণ প্রকৃতির। প্যারিসে শিক্ষিতা মেয়ের উপযুক্ত সঙ্গী টিকা রাজ নয়। যুবরাজ ও যুবরাণী দু'জনের জীবনই দুর্বিষহ হয়ে উঠল। সারা দিন রাত্রিতে কোনো কাজ নেই, শুধু চুপ করে বসে থাকা। কাজ পেলে জীবন হয়তো আনন্দময় হয়ে উঠবে। শ্বশুরের কাছে গিয়ে দু'জনের জন্য কাজ প্রার্থনা করলেন। মহারাজা বললেন, আমি যতদিন আছি, ততদিন শাসনকার্যে হস্তক্ষেপের দরকার নেই; এবং সমাজ সেবার নাম করে প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলবে, তা-ও আমি চাই না। এখন তোমাদের স্ফূর্তির সময়, স্ফূর্তি করো।

বারবার আবেদন জানিয়েও যখন কাজের অনুমতি পাওয়া গেল না, তখন ভারতের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে এবং ইতালী, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন বৃন্দা। দেশের চেয়ে ভালো লাগে বিদেশ। শ্বশুরের কানে নানা গুজব আসে। তিনি পুত্র ও পুত্রবধূর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির অপচেষ্টা করেন। ইতিমধ্যে মহারাজাকে হতাশ করে বৃন্দা পর পর তিনটি কন্যা উপহার দিয়েছেন। ভবিষ্যৎ বংশধর উপহার না দিলে টিকা রাজকে আবার বিয়ে দেওয়া হবে। ডাক্তার পরীক্ষা করে বলল, বৃন্দার আর সন্তান ধারণের ক্ষমতা নেই। অস্ত্রোপচার করলে হয়তো ফল হতে পারে, কিন্তু তাতে জীবন বিপন্ন হবার আশঙ্কা আছে। এই আশঙ্কা অগ্রাহ্য করে বৃন্দা অস্ত্রোপচারে সম্মত হলেন। এতেও যখন ফল হলো না, তখন টিকা রাজ একটি অশিক্ষিত রাজপুত মেয়েকে বিয়ে করে আনলেন। বংশধর চাই। মেয়েদের মুখ চেয়ে বৃন্দা এই অপমান সহ্য করলেন। ভেনিস, প্যারিস, লণ্ডন ও হলিউডে তাঁর সময় কাটে। মেয়েদের দেখতে মাঝে মাঝে আসতে হয় কর্পূরতলা। বৃদ্ধ মহারাজার মৃত্যুর পর স্বামী গদি পাওয়ায় তিনি মহারাণী হলেন।

বই শেষ করে বৃন্দার প্রতি পাঠকের মনে সহানুভূতি জাগে। যদিও তিনি দেশের টাকা বিদেশে নিয়ে অপব্যয় করেছেন এবং ভারতের উপর দরদের কোনো লক্ষণ দেখাননি, তথাপি ছেলেবেলা থেকে তাঁর জীবন যে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়েছিল, সে জন্য তাঁর দায়িত্ব ছিল না। বৃন্দার জীবনের দুঃখ তাঁর নিজের সৃষ্ট ততটা নয়, যতটা পারিপার্শ্বিক অবস্থা দায়ী। দেশীয় রাজ্যের শাসকদের বিলাস ও দম্ভের সুন্দর ছবি এঁকেছেন বৃন্দা। বরোদার মহারাজা দেড়শ' লোককে ভোজ দিলেন; সেই ভোজে যত বাসন, থালা ইত্যাদি ব্যবহৃত হলো সবই সোনার। হায়দরাবাদের হীরা-জহরতের

অভাব নেই। নিজামের আড়াইশ' স্ত্রী এবং মাত্র আশীটি ছেলে ও ষাটটি মেয়ে। এমনি অনেক ছবি আছে দেশীয় রাজ্যের শাসকদের বিলাসিতার। বিদেশে স্পেনের রাজা আলফান্সো, সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও রাণী মেরী এবং আরো বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। পাঞ্জাবের কুখ্যাত গভর্ণর ও'ডায়ার সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে একটু নতুন আলোকপাত করেছেন। একদিন সিমলায় লেডি হার্ডিঞ্জের সঙ্গে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলেন। পরদিন এক চিঠি পেলেন ও'ডায়ারের কাছ থেকে। তিনি লিখেছেন, আমার স্ত্রীও থিয়েটারে ছিলেন; কিন্তু তাঁর পদমর্যাদা অগ্রাহ্য করে আপনি তাঁর পূর্বেই থিয়েটার ত্যাগ করেছেন। এটা খুবই দুঃখের কথা। ও'ডায়ার তাঁর পেছনে এমন লাগলেন যে, বৃন্দার নামে একটি মস্ত বড় ফাইল তৈরী করে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

দেশের মাটির সঙ্গে যে বৃন্দার যোগ নেই তা স্পষ্টই দেখা যায়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা তিনি বলেননি, অথচ য়ুরোপের উপর গত দুটো যুদ্ধের প্রভাব তিনি ভুলতে পারেননি। গান্ধীজী ও নেহেরুর নাম একবার উল্লেখ করেছেন শুধু প্রসঙ্গক্রমে। অধিকাংশ দেশীয় নৃপতিরই দেশের সঙ্গে কোন যোগ ছিল না; সুতরাং বৃন্দার একার দোষ নয় এটা।

ভাষা সরল ও অনাড়ম্বর; নিজের ও বংশের সম্মানহানির ভয় না করে অনেক কথা খোলাখুলি বলেছেন মহারাণী। বইটি স্বচ্ছন্দে পড়া যায়।

Publishers: Henry Holt; New York. 3-50.

ইতিহাসের শিক্ষা

গত বছর ইংরেজী সাহিত্যের একটি অসাধারণ পুস্তক সম্পূর্ণ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। দেড়শ' বছরের মধ্যে ইংরেজী ভাষায় একজন লেখকের এত বড় বই আর প্রকাশিত হয়নি। বইটি দশখণ্ডে প্রায় সাড়ে বত্রিশ লক্ষ শব্দে সম্পূর্ণ। অধ্যাপক আর্ণল্ড টয়েনবীর A Study of History গ্রন্থের কথা বলছি। ১৯২১ সালে একদিন রেল-গাড়ীতে ভ্রমণ করবার সময় আকস্মিকভাবে টয়েনবীর মনে আলোচ্য গ্রন্থের পরিকল্পনা জেগেছিল। প্রথম তিন খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ সালে, পাঁচ বছর পরে বেরিয়েছে পরবর্তী তিন খণ্ড। বাকী চার খণ্ড এক-সঙ্গে বেরুলো গত অক্টোবর মাসে। দীর্ঘ তেত্রিশ বছবের কঠোর সাধনার দ্বারা টয়েনবী ইংরেজী সাহিত্যে কীর্তি স্থাপন করলেন।

প্রথম তিন খণ্ডে সভ্যতার উৎপত্তি ও বিকাশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ডের বিষয়বস্তু সভ্যতাব অবনতি ও ধ্বংস। শেষ চার খণ্ডে টয়েনবী বিভিন্ন সভ্যতার যোগাযোগ এবং পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেছেন। টয়েনবা মানব সভ্যতার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতেব শুধু ধারা-বাহিক বিবরণ দিয়ে ক্ষান্ত হননি ; প্রত্যেকটি প্রধান বিষয়ের উপর দিয়েছেন তাঁর নিজস্ব মন্তব্য। মানব সভ্যতার সাধারণ ইতিহাস থেকে টয়েনবীর বই-এর পার্থক্য এখানে। ইতিহাসকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন টয়েনবী, তাঁর সেই দৃষ্টিকোণের বৈশিষ্ট্য গ্রন্থটিকে অসামান্য করে তুলেছে।

টয়েনবী ইতিহাসের ধারাকে কালানুক্রমিক ভাবে আলোচনা করেননি। তিনি বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করে সেই বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন ; দৃঢ়বদ্ধ ধারাবাহিক বিশ্লেষণের চেষ্টা নেই বলে পাঠক যে কোন একটি প্রসঙ্গ পৃথকভাবেও পড়তে পারেন। অবশ্য খুব কম পাঠকের পক্ষেই দশ খণ্ড সম্পূর্ণভাবে পড়া সম্ভব। গ্রন্থের দৈর্ঘ্যটাই এব প্রধান কারণ নয় ; গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যের পূর্বসূত্রে কণ্টকিত পুরনো ধাঁচের রচনারীতি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। একটি তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যেরূপ সহজ সাবলীল রচনাশৈলীর প্রয়োজন টয়েনবীর পাণ্ডিত্যের সঙ্গে তার সংযোগ ঘটেনি। D.C. Somervell প্রথম ছয় খণ্ড সংক্ষিপ্ত করে একটি খণ্ড প্রকাশ করেছেন ; শেষ চার খণ্ডের

সংক্ষিপ্তসারও শীগ্‌গীর বেরুবে বলে আশা করছি। দু' খণ্ডের এই সারাংশটিই ভবিষ্যতে জনপ্রিয় হবে।

বারো বছর গ্রীক ও পনেরো বছর ল্যাটিন ভাষার অনুশীলন করেছেন টয়েনবী। এই দীর্ঘকালের চর্চার ফলে তাঁর রচনা ক্ল্যাসিক্যাল আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ইতিহাসের ঘটনাবলী তিনি বিচার করেছেন বাইবেলের দৃষ্টিকোণ থেকে। খৃস্টান ধর্মের আদর্শ টয়েনবীর সিদ্ধান্তগুলি প্রভাবান্বিত করেছে। টয়েনবী বস্তুতন্ত্র-বিরোধী; তিনি বিশ্বাস করেন ধর্মের মধ্যেই মানুষের মুক্তি। বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করেছি, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ এক বৃহৎ ঐক্যবদ্ধ মিলিত মানবসমাজ স্থাপনের পথে এগিয়ে চলেছে; তথাপি আমরা "আদিম পাপ" থেকে এখনো নিজেদের মুক্ত করতে পারিনি। এখনো পৃথিবীর হিংস্রতম প্রাণী মানুষ। বিজ্ঞান যে সব উন্নতি করেছে সেগুলি একান্তরূপে বাহ্যিক, বিজ্ঞান মানুষের নৈতিক দ্বন্দ্বের সমাধান করতে পারেনি। পৃথিবীতে আমরা এসেছিলাম নিষ্পাপ জীবন নিয়ে। কিন্তু সমাজ গড়ে ওঠবার পর ঈশ্বরকে ক্রমশঃ ভুলেছি, পূজা করেছি জাতি ও রাষ্ট্রকে। রাষ্ট্রকে বড় করবার জন্য যুদ্ধ করেছি; একটা যুদ্ধের পর আর একটা যুদ্ধ। ব্যক্তিগত জীবনও লোভ ও পাপের দ্বারা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। এই পাপই যুগে যুগে মানুষের আশ্চর্যরূপে সমৃদ্ধ বড় বড় সভ্যতা ধ্বংস করেছে। মানব-সমাজকে জাতি ও রাষ্ট্রে বিভক্ত করা পাপ। রাষ্ট্রানুগত্য যুদ্ধোন্মাদনা আনে, স্বাদেশিকতার নামে ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে আমরা উন্মত্ত হই। এই উন্মত্ততা জাতি ও সভ্যতার ধ্বংসের কারণ। ইতিহাস শিক্ষা দেয় যে, ঈশ্বরানুরক্তি ও ধর্মনিষ্ঠা মানব-সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। কত বড় বড় সভ্যতা ও সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেছে; কিন্তু শত শত বৎসর যাবৎ হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্মগুলি কালজয়ী হয়ে বেঁচে আছে। ব্যক্তি ডুবে যায়, সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে, সভ্যতা লুপ্ত হয়, কিন্তু ধর্ম বেঁচে থাকে। টয়েনবী আশা করেন যে, একদিন পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য ধর্মগুলির সংমিশ্রণে এক বিশ্বধর্ম উদ্ভূত হবে। হয়তো তা বিশুদ্ধ খৃস্ট-ধর্মের সগোত্র। একে অবলম্বন করেই মানুষ মুক্তির পথ খুঁজে পাবে।

টয়েনবী আরো আশা করেন যে, নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যে ভাবে বেড়ে চলেছে তাতে এক অখণ্ড পৃথিবীর আদর্শ শুধু কল্পনার বস্তু নয়, অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। শুধু প্রশ্ন এই যে,

অখণ্ড মানবসমাজ শান্তির পথে অথবা রক্তপাতের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে।

অষ্টম ও নবম খণ্ডে টয়েনবী ভারত সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করেছেন। সমগ্র বই পড়বার ধৈর্য যাঁদের নেই তাঁরা The Modern West and the Hindu World (অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ১৯৮) অধ্যায়টি পড়তে পারেন। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংঘাত ভারতকে কি ভাবে প্রভাবান্বিত করেছে এই অধ্যায়ে তার আলোচনা করা হয়েছে। 'India' শব্দ ব্যবহার না করে টয়েনবী 'Hindu' কথাটি সর্বত্র ব্যবহার করেছেন, এটি লক্ষণীয়। ভারতে ধর্ম, জাতি, রাজনীতি নিয়ে এত বিরোধ, তবু নব-প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন রাষ্ট্রের অগ্রগতি (১৯৫২ পর্যন্ত) বিশেষ আশাপ্রদ বলে মন্তব্য করেছেন টয়েনবী। বিদেশী শুভাকাঙ্ক্ষীরা যতটা উন্নতি আশা করেছিলেন তার চেয়ে বেশি অগ্রগতি হয়েছে। ভারত স্বাধীন হলেও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সহিত সংঘাতের দ্বন্দ্ব এখনো দীর্ঘকাল তাকে ভুগতে হবে। বিরোধটা প্রধানতঃ অর্থনৈতিক এবং আদর্শগত, এবং এই বিরোধের মূল কারণ দুটি। প্রথমতঃ ভারত ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা হিন্দু-সমাজের উপরতলার কয়েকজনকে স্পর্শ করতে পেরেছে। উপরতলার ভারতবাসীরাও সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারাকে গ্রহণ করতে পারেনি। শুধু তাদের বুদ্ধিবৃত্তির রূপান্তর ঘটেছে পাশ্চাত্ত্যের সংস্পর্শে এসে। কিন্তু তাদের আদর্শ ও অনুভূতি এখনো ভারতীয়। সাধারণ ভারতবাসী পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়নি। উপরতলার ভারতীয়েরাই রাষ্ট্রের কর্ণধার ; সম্পূর্ণ ভিন্ন মানসিক স্তরের জনগণের উন্নতির জন্য কাজ করতে হবে বলেই সমস্যা দেখা দিয়েছে।

এই সমস্যার তো সমাধান করতেই হবে এবং দেরী করলেও চলবে না। নবীন রাষ্ট্র দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণের দায়িত্ব পেয়েছে বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে। জনসাধারণের উন্নতি করতে কোন্ পথ অবলম্বন করা হবে সেইটে সমস্যা। পাশ্চাত্ত্য রীতিতে তাদের অবস্থার উন্নতি করবার চেষ্টা ফলপ্রসূ হবে কি না সন্দেহ। কারণ, পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতি গ্রহণ করবার মতো পূর্ব-প্রস্তুতি এদের নেই। রাশিয়ার বিপ্লবীরাও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর অনুরূপ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণ করে রাশিয়া তার সমস্যার সমাধান করেছে। রাশিয়ার পথ কি ভারত গ্রহণ করবে? ভারতীয় জনগণের গভীর ধর্মানুরাগ এবং হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্য সাম্যবাদ গ্রহণের পক্ষে হয়তো বাধা হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু তথাপি ভারতকে সাম্যবাদ গ্রহণের কথা ভাবতে হতে পারে।

বাঙ্গালীরা প্রথম অনুভব করতে পেরেছিল যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা পৃথিবীকে রূপান্তরিত করবে। তাই তারা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করেছে। তারপর একে একে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের হিন্দুরাও পাশ্চাত্য সভ্যতার দানকে স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু রাজ্য হারাবার অভিমানে মুসলমানরা দূরে সরে ছিল। যখন তারা ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করল, তখন দেখল হিন্দুরা অনেক দূর এগিয়ে গেছে, তাদের সমকক্ষ হবার সুযোগ আর নেই। নিজেদের দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন বলেই মুসলমানদের মনে ভয় জেগেছিল। পাকিস্থান সেই ভয়ের প্রতীক, শক্তির নয়।

পাকিস্থান ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইতিহাসের দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যায় যে, পশ্চিম পাকিস্থান যে অঞ্চল অধিকার করে আছে সেখান দিয়েই অতীতে বহু বিদেশী ভারত আক্রমণ করেছে। পাকিস্থান হওয়ায় এখন সেই আক্রমণের আশঙ্কা বৃদ্ধি পেয়েছে। রাশিয়ার সমুদ্রে বেরুবার পথ দরকার। তারা যদি একদিন করাচী বন্দর দাবী করে, তাহলে বিস্মিত হবার কিছু নেই। সেখান থেকে ভারতের সীমানা তো মাত্র এক পা'র ব্যবধান।

টয়েনবী গান্ধীজীকে হিন্দু বলে দেখেছেন, ভারতীয় বলে নয়। গান্ধীজীর মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই টয়েনবী গান্ধীজীকে "Hindu Janus" (দু'মুখো হিন্দু) আখ্যা দিয়েছেন। গান্ধীজী পাশ্চাত্যের প্রযুক্তিবিদ্যাকে অগ্রাহ্য করে টেকা ধরেছেন; তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে কেবল যন্ত্রকেই দেখেছেন, ধর্মকে দেখেননি। এই জন্যই গান্ধীজীর অনুগামীরাও তাঁর কথা গ্রাহ্য না করে ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনায় যন্ত্রকে প্রাধান্য দিয়েছে।

গান্ধীবাদের মূল কথাটি উপলব্ধি করলে টয়েনবী নিশ্চয়ই এরূপ মন্তব্য করতেন না। প্রযুক্তিবিদ্যার প্রতি গভীর আসক্তি জীবনকে কলুষিত করে বলেই গান্ধীজী এর বিরোধী। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনেক ভালো জিনিষ গান্ধীজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন। টেকনলজির অবাধ প্রসার যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায় বলেই গান্ধীজী এর নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী ছিলেন।

ভারতের জনসাধারণ পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শ থেকে যতটা দূরে আছে বলে টয়েনবী ভেবেছেন, আসলে কিন্তু তারা ততটা দূরে নেই। আর সবচেয়ে বড় কথা ভারতবাসীর সহজে বিদেশী ভাবধারা গ্রহণের ক্ষমতা। সে ক্ষমতার সঙ্গে টয়েনবীর পরিচয় নেই বলেই হয়তো পাশ্চাত্যের সংঘর্ষের ফলাফলকে বড় করে দেখিয়েছেন।

আমরা উপরে টয়েনবীর বিরাট গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছি। ইতিহাসের শিক্ষা কি, দশ খণ্ডের সাহায্যে তিনি তা পাঠকসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। সবচেয়ে সংক্ষেপে ইতিহাসের শিক্ষা কি তা বলেছেন প্রসিদ্ধ আমেরিকান ঐতিহাসিক Charles A. Beard. এখানে তার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। Beard-কে একবার অনুরোধ করা হয়েছিল ইতিহাস থেকে কি শিক্ষা পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে একটি বই লেখবার। তিনি বললেন, বই লেখবার দরকার কি, মাত্র চারটি বাক্যে আমি ইতিহাসের শিক্ষা বলে দিতে পারি। সেই চারটি কথা হচ্ছে এই ঃ

1. Whom the gods would destory, they first make mad with power.
2 The mills of God grind slowly, but they grind exceedingly small.
3. The bee fertilizes the flower it robs.
4. When it is dark enough, you can see the stars.

Publishers : Oxford University Press ; London. Vols. 7—10, £7-10-0.

স্বাধীন মানুষের কাহিনী

আমেরিকার সূত্র থেকে জানা গিয়েছিল ১৯২৯ সালে হালডোর কিলিয়ান ল্যাক্সনেস কম্যুনিস্ট পার্টির সভ্য হয়েছিলেন। কিন্তু এ সংবাদ যথার্থ নয় বলে মনে হয়। তাঁর রচনার যতটুকু পরিচয় পাওয়া গেছে তার মধ্যে কম্যুনিজম বা অন্য কোনো রাজনৈতিক মতবাদ প্রাধান্য লাভ করে শিল্প-বোধকে ক্ষুণ্ণ করেনি। ল্যাক্সনেস স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, তিনি কম্যুনিস্ট দলভুক্ত নন্ এবং অন্য কোনো রাজনৈতিক দলেও তিনি যোগ দেননি। তিনি লেখক, এইটে তাঁর পরিচয়। তবে, কম্যুনিজমের প্রতি ল্যাক্সনেসের অহেতুক বিদ্বেষও নেই। রাশিয়ার যা-কিছু ভালো তার প্রশংসা তিনি করেছেন অকুণ্ঠচিত্তে। ল্যাক্সনেসের দরিদ্রদের জন্য গভীর দরদ। রাশিয়া এদের ভাগ্যোন্নতির জন্য যে বিপ্লবাত্মক পদ্ধতি অবলম্বন করেছে ল্যাক্সনেসকে তা আকৃষ্ট করে। কিন্তু প্রয়োজন হলে রাশিয়ার তীব্র সমালোচনা করতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেন না।

এদেশের এবং বিদেশের অনেক কাগজে ল্যাক্সনেস সম্বন্ধে আর একটি খবর বেরিয়েছে যার সমর্থন নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্র থেকে পাওয়া যায় না। স্ট্যালিন পুরস্কার-প্রাপ্তি সংবাদটা যথার্থ বলে মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে তিনি ওয়ার্লড পীস কাউন্সিলের আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৫৩ সালে। এই প্রতিষ্ঠান কম্যুনিস্ট প্রভাবান্বিত বলে সহজেই একে রাশিয়ার সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা হয় এবং বোধ হয় ভুল করে এই পুরস্কারকেই স্ট্যালিন পুরস্কার বলা হয়েছে। ১৯৫৩ সালের স্ট্যালিন শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন মেজর জেনারেল শোখে, হাওয়ার্ড ফাস্ট, লিওঁ ক্রুসংস্-কভস্কি ও পাবলো নেরুদা।

১৯৫৩ সালে "সোভিয়েটে লিটারেচারের" দ্বাদশ সংখ্যায় ল্যাক্সনেস সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তাতে ল্যাক্সনেস কম্যুনিস্ট এবং তিনি স্ট্যালিন পুরস্কার পেয়েছেন এমন কথা উল্লেখ করা হয়নি। সত্য হলে 'সোভিয়েট লিটারেচার' নিশ্চয়ই এ খবর আমাদের দিতেন।

দরিদ্রের প্রতি গভীর মমতা ল্যাক্সনেসকে ধনিক সম্প্রদায়ের উপর নিষ্ঠুর করেছে। পুঁজিপতির দেশ আমেরিকা। আমেরিকা সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ

অভিজ্ঞতাও আছে। ১৯২৭ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত ল্যাক্সনেস আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করেছেন। সেখানে আপ্টন সিনক্লেয়ারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সিনক্লেয়ারের সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ল্যাক্সনেসের জীবন-দর্শনকে প্রভাবান্বিত করেছে। আমেরিকায় বেকারদের শোচনীয় অবস্থা দেখে ধনী ও দরিদ্রের প্রতিতুলনাটা বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর কাছে। ল্যাক্সনেস্ তাই ধনতান্ত্রিক আমেরিকাকে কখনো ক্ষমা করতে পারেননি।

ল্যাক্সনেসের একটিমাত্র বইয়ের অনুবাদ এখন পাওয়া যায়। সেটি 'ইণ্ডি-পেণ্ডেণ্ট পীপল'। এই উপন্যাসটির কথা আলোচনা করলেই ল্যাক্সনেসের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা যেতে পারে। 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পীপল'-এর আকার বৃহৎ, পটভূমিকা বিরাট, মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত এই কাহিনী। আইসল্যাণ্ডের প্রাচীন সাগার যেন আধুনিক উপন্যাসরূপ। নোবেল কমিটি গাথা-কাহিনীর প্রাচীন ঐতিহ্যকে উপন্যাসের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত করবার জন্যই প্রধানতঃ ল্যাক্সনেসকে পুরস্কার দিয়েছেন।

'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পীপলের' নায়ক বিয়ারতুর সাধারণ ক্ষেত-মজুর। আঠারো বছর ধরে অন্যের মাঠে ক্রীতদাসের মতো সে কাজ করেছে। তারপরে কোনো-প্রকারে এক খণ্ড জমি বন্দোবস্ত নিল। লোকালয় থেকে দূরে বরফঢাকা মাঠ। নব-পরিণীতা স্ত্রীকে সঙ্গে করে সেই নিঃসঙ্গ মাঠে এসে ঘর বাঁধল। আঠারো বছরের বন্ধনদশা থেকে মুক্তি পেয়েছে এইটেই বিয়ারতুরের কাছে সবচেয়ে বড় আনন্দ। যে স্বাধীনতা সে পেয়েছে তাকে সে কিছুতেই হারাবে না, এই তার দৃঢ়-সংকল্প। তরুণী স্ত্রী রোজার একটু ভালো খাবারের লোভ। কিন্তু বিয়ারতুর সে সব কথায় কান দেয় না। লবণমাখা শুকনো মাছ তাদের একমাত্র খাদ্য। বিয়ারতুর একে একে তার ভেড়ার পাল বড় করে তুলছে। গ্রীষ্মকালে ঘাসের চাষ করে। শীতকালের জন্য ঘাস সঞ্চয় করে রাখে। ইতিমধ্যে তার পরিবারে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। দ্বিতীয় স্ত্রীও কয়েকটি সন্তান রেখে মারা গেছে। বিয়ারতুর ভেড়ার জন্য যতটা যত্ন নেয়, ছেলে-মেয়ের জন্য তার অর্ধেকও নেয় না। কারণ বাজারে ভেড়ার দাম আছে, মানুষের দাম নেই। ভেড়া বিক্রির টাকা স্বাধীনতা রক্ষায় সাহায্য করবে।

এলো প্রথম মহাযুদ্ধ। বিদেশের বাজারে আইসল্যাণ্ডের পণ্যের আদর বাড়ল। আইসল্যাণ্ড সস্তা টাকায় ফেঁপে উঠল। যে অঞ্চলে বিয়ারতুরের বাড়ী সেখানে পথঘাট ছিল না, লোকজনেরও বিশেষ যাতায়াত ছিল না। এখন তার বাড়ীর

সামনে দিয়ে পাকা রাস্তা হয়েছে, সে রাস্তা দিয়ে মোটর চলাচল করে। যে জমি পতিত পড়ে ছিল এখন তার অসম্ভব দাম বেড়েছে। এদিকে আইসল্যাণ্ডের রাজনীতিক্ষেত্রেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এখন যাদের হাতে গভর্ণমেণ্ট তারা জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য ডেনমার্কের অনুকরণে সমবায় সমিতি ইত্যাদি স্থাপন করেছে। আসন্ন নির্বাচনে বিয়ারতুরের ভোট প্রয়োজন। সুতরাং ক্ষমতায় আসীন রাজনৈতিক দল তাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য বাড়ি তৈরীর মাল-মশলা গছিয়ে দিয়ে গেল। বিয়ারতুরের অনেক দিনের শখ ভালো দেখে একটি বাড়ি করবার। তাই ঋণ করেও সে বাড়ী করল। সমস্যা দেখা দিল যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাওয়ায়। আয় হঠাৎ কমে গেল, ঋণ শোধ করবার আর পথ রইলো না। ঋণের দায়ে তার বাড়ি ও সম্পত্তি নিলামে উঠল। বুকের রক্ত জল করে সম্পত্তি সে গড়ে তুলেছে শুধু টাকার জোরে তা একজন পুঁজিপতি অধিকার করল। কিন্তু তবু বিয়ারতুর হতাশ হলো না। একবার স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে, আর সে জীবিকাজনের জন্য অন্যের দাসত্ব গ্রহণ করবে না। বিয়ারতুর আরো দূর অঞ্চলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। জনমানবহীন বরফের মরুভূমির মধ্যে সে নতুন উপনিবেশ গড়বে।

বিয়ারতুর একটি অসাধারণ চরিত্র। এই একটি চরিত্র প্রাধান্য লাভ করে কাহিনীর অন্য সব পাত্র-পাত্রীদের ম্লান করে দিয়েছে। অ-প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে আস্টা ও রোজা মনে দাগ রেখে যায়। তরুণী বধূ রোজা একটু মাংসের ঝোলের জন্য ব্যাকুল; দুধের তীব্র পিপাসা দুঃস্বপ্নের মতো তাকে তাড়া করে; স্বামী কার্যোপলক্ষে শহরে গেলে সে একা থাকে। যতদূর দৃষ্টি যায়, মানুষের চিহ্ন চোখে পড়ে না, শুধু ধূ ধূ করছে তুষার-ঢাকা মাঠ। অপদেবতার ভয়। সারারাত চোখে ঘুম আসে না। একরাত্রিতে বাচ্চা একটা ভেড়া কেটে রান্না করে মাংস খাবার সাধ মেটাল। সযত্নে সকল চিহ্ন গোপন করে রাখতে হলো। স্বামী যেন বুঝতে না পারেন। তারপরে একদিন নিঃসঙ্গ অবস্থায় শোচনীয় মৃত্যু! পাঁচশ' পৃষ্ঠার সুবৃহৎ উপন্যাসের কয়েক পাতায় মাত্র রোজার কথা আছে। কিন্তু পাঠকের মনে এই করুণ চরিত্রটির ছায়া কাহিনী শেষ হবার পরও থেকে যায়।

বিয়ারতুর নিজের পায়ে স্বাধীনভাবে দাঁড়াবার জন্য বদ্ধপরিকর। এই সঙ্কল্প তাকে জীবনের অন্য সকল আকর্ষণ থেকে বঞ্চিত করেছে। সে একটু সঙ্কীর্ণচিত্ত, একগুঁয়ে এবং কল্পনাশক্তিহীন। ভেড়ার বিষয় নিয়ে সে অনর্গল কথা

বলতে পারে, অন্য বিষয়ে আলোচনা শুরু হলেই তার মুখ বন্ধ। নতুন যুগের নতুন ভাবধারা সম্বন্ধে বিয়ারতুর অজ্ঞ। ত্রিশ বছর পশ্চাতে পড়ে আছে তার মন। বিয়ারতুরের হৃদয় আত্ম-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পে কঠোর ; সেই কঠোরতার মধ্যে একটুমাত্র কোমল স্থান ছিল আস্টার জন্য। আইসল্যাণ্ডের স্বাধীনতাকামী কৃষক-সম্প্রদায়ের শেষ প্রতিনিধি বিয়ারতুর।

যুদ্ধ এমনই ভয়ঙ্কর যে আইসল্যাণ্ড দূরে থেকেও তার প্রভাবে বিপর্যস্ত হলো। যুদ্ধের মুদ্রাস্ফীতির পরিণামেই বিয়ারতুরের সম্পত্তি গেল। বিয়ারতুরের ছেলে যখন আমেরিকা যাবার প্রস্তাব করল তখন তাকে এই বলে সে সাবধান করে দিল যে সন্ধিপত্রে সই করে যুদ্ধ বন্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু মনের তো পরিবর্তন হয়নি। মন এখনো হিংস্র, সুতরাং সাবধান!

নির্বাচনে জয়লাভের উদ্দেশ্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল সমবায় সমিতি ও গভর্ণমেণ্টের তহবিল থেকে নানা প্রয়োজনে ঋণ দেবার ব্যবস্থা করেছে। বিয়ারতুর ঋণ গ্রহণ করেছিল এদেরই প্ররোচনায়। লেখক এ সম্বন্ধে বলছেন :

The fact is that it is utterly pointless to make any one a generous offer unless he is a rich man ; rich men are the only people who can accept a generous offer. To be poor is simply the peculiar human condition of not being able to take advantage of a generous offer. The essence of being a poor peasant is the inability to avail oneself of the gifts that politicians offer or promise and to be left at the mercy of ideals that only make the rich richer and the poor poorer.

আত্ম-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বিয়ারতুরের কোনো সঙ্গী নেই! একা সংগ্রাম করাতেই তার আনন্দ। তাই বন্দরের ধর্মঘটী শ্রমিকদের সঙ্গে সে যোগ দিল না। তার ছেলে ওদের সঙ্গে রয়ে গেল ; সে নতুন উপনিবেশ গড়বার জন্য নিরুদ্দেশ যাত্রা করল।

Publishers : A. Knopf ; New York. 3.00

কীট্‌সের প্রণয়িনী

কবি কীট্‌সের জীবনে ও কাব্যসাধনায় যে মেয়েটি সবচেয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল তার সম্বন্ধে খুব কম কথাই জানবার সুযোগ ছিল। অথচ কবিকে বুঝতে হলে এবং তার শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির যথার্থ রসোপলব্ধির জন্য দু'জনের সম্পর্কটা জানা প্রয়োজন। জানবার উপায় ছিল না বলে ভিক্টোরীয় যুগের সমালোচকরা ফ্যানি ব্রনের উপর যথেষ্ট অবিচার করেছে। কীট্‌সের অকাল মৃত্যুর জন্য অন্যান্য কারণের সঙ্গে ফ্যানির হৃদয়হীনতার ইঙ্গিতও করা হতো। কীট্‌সের ইতালী যাবার পর থেকে তার বোনের কাছে ফ্যানি যে চিঠিগুলি লিখেছিল ১৯৩৭ সালে সেগুলি প্রকাশিত হওয়ায় ফ্যানির বিরুদ্ধে অভিযোগ অনেকটা লঘু হয়ে পড়ে। শ্রীমতী জোয়ানা রিচার্ডসন এই প্রথম ফ্যানি ব্রনের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী লিখেছেন। লেখিকা এই গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন যে ফ্যানি সত্যি কীট্‌সকে ভালোবাসত এবং কবির প্রতি কোনো নিষ্ঠুর ব্যবহারই সে করেনি।

ফ্যানির জন্ম হয় ১৮০০ খৃস্টাব্দের ৯ই অগাস্ট। ১৮১৮ সালের নভেম্বর মাসে হ্যাম্পস্টেডের এক বাড়িতে প্রথম তার কীট্‌সের সঙ্গে পরিচয় হয়। কয়েক দিন দ্বিধা ও সঙ্কোচের পর সে পরিচয় দ্রুত বন্ধুত্বে পরিণত হলো। কীট্‌স শেক্‌সপীয়র, স্পেন্‌সার, মলিয়ের, ইত্যাদি পড়ে শোনায়, ফ্যানি তন্ময় হয়ে শোনে। কখনো বা শোনে না, শুধু কীটসের অপূর্ব সুন্দর ভাবদীপ্ত মুখের দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে। মাস দেড়েক পরেই কীট্‌স ফ্যানির কাছে বিয়ের প্রস্তাব করল। ফ্যানি সে প্রস্তাবে সানন্দে সম্মত হলো। অথচ সাংসারিক বুদ্ধিতে বিচার করলে ফ্যানির এ বিয়েতে রাজী হওয়া উচিত ছিল না। কীট্‌স বাবাকে হারিয়েছে অল্প বয়সে; স্কুলে থাকতে তার মা মারা গেছে যক্ষ্মায়; ছোট ভাই টম ক্ষয় রোগে ভুগছে; নিজের স্বাস্থ্য ভালো নয়। লাভের ব্যবসা ডাক্তারী ছেড়ে আরম্ভ করেছে কবিতা লিখতে। অথচ তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ যে বিরূপ অভ্যর্থনা লাভ করেছে তাতে কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবার আশা সুদূরপরাহত। সর্বোপরি, কীট্‌সের টাকা নেই। নিজের খরচই চালাতে পারে

না। সত্যি ভালো না বাসলে ফ্যানির মতো সুন্দরী তরুণী এমন ছেলেকে বিয়ে করতে সম্মত হবে কেন ?

বাগ্দানের কথা দু'একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছাড়া আর কেউ জানল না। স্থির হলো, কীট্সের উপার্জনের একটা পথ ঠিক হলে বিয়ে হবে। কয়েকদিন বেশ আনন্দে কাটল,—দুজনে মিলে বেড়ানো, গল্প, সাহিত্য আলোচনা। তারপর একদিন কীট্সের ক্ষয়রোগ প্রকাশ পেল। ফ্যানিকে বিয়ে করে সুখের নীড় রচনার স্বপ্নে যখন মশগুল হয়েছিল, তখন এই মারাত্মক রোগের আক্রমণ কীট্সের সকল আশা চূর্ণ করে দিল; সে হয়ে উঠল দুর্বল, অবুঝ। ফ্যানি রোজ তাকে দেখতে যায়, কিন্তু এটুকুতে কীট্স সন্তুষ্ট নয়; সে যখন রোগশয্যায় শুয়ে, তখন ফ্যানি অন্য কারো সঙ্গে বেড়াবে, নাচবে, হেসে গল্প করবে, এটা কীট্স সইতে পারে না; এমনি সর্বগ্রাসী তার প্রেম। তার রোগজীর্ণ মন নানা অন্যায় সন্দেহ করে ফ্যানিকে অপমানিত করেছে, কিন্তু ফ্যানি কীট্সের অবস্থা বুঝে সব মুখ বুঁজে সয়ে গেছে। এই সময় কীট্স ফ্যানিকে উদ্দেশ করে যে কবিতা ও চিঠিগুলি লিখেছে তার মধ্যে ব্যর্থ প্রেমের চরম হতাশা ফুটে উঠেছে। হতাশা কীট্সকে অনেক সময় নিষ্ঠুর করেছে, সন্দেহ হয়েছে ফ্যানির চরিত্রের উপর। এমন হীন অভিযোগের সুযোগ নিয়েও ফ্যানি দূরে সরে যায়নি।

বাগদানের পর প্রায় এক বছর দশ মাস পার হয়ে গেল। কীট্সের আরোগ্য লাভের আশা দেখা যায় না। শীতের আগেই কীট্সকে ইতালী যেতে ডাক্তার পরামর্শ দিয়েছে। ফ্যানি অনেক অনিশ্চয়তা, অনেক সন্দেহ সয়েছে। কীট্স ইতালী যাবার আগে তাদের বিয়েটা হয়ে যাক, এই তার ইচ্ছা। কিন্তু কীট্স আপত্তি করল; এই শরীরে বিয়ের প্রহসন করে লাভ কি ? ফ্যানি তখনো নাবালিকা; বিয়েতে মার মত চাই; মা শেষ পর্যন্ত অমত করলেন। ১৮২০ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর কীট্স ফ্যানির কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে ইতালীর পথে যাত্রা করল।

ইতালী যাত্রার পূর্বে কয়েকদিন ফ্যানিদের বাড়ি কীট্স অতিথি হয়েছিল। ফ্যানি একদিন তার যে সেবা ও যত্ন করেছে কীট্স তা মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত ভোলেনি। যাত্রার পূর্বে ফ্যানি তার বাক্স গুছিয়ে দিয়েছে, আর কীট্সকে দিয়েছিল কয়েকটা ছোট উপহার। কীট্সও তার প্রিয় বইগুলি এবং সেভার্ণের আঁকা তার নিজের ছবি ফ্যানিকে দিয়ে গেল। বিদেশে গিয়ে

কীট্‌সের সর্বদা এই কটি দিনের কথা মনে করে ক্ষোভ হতো। মিথ্যা আশায় অচেনা জায়গায় না এসে ফ্যানির অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা শ্রেয়ঃ ছিল।

ফ্যানির নাম শুনলে কীট্‌সের এমন উত্তেজনা উপস্থিত হয় যে, দুর্বল দেহ টাল সামলাতে পারে না। তাই সে ইতালী এসে ফ্যানিকে চিঠি লেখে না। লণ্ডনে কীট্‌সের বন্ধুরা চিঠি পায়, ফ্যানি তাদের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে। একদিন ফ্যানির চিঠি এলো কীট্‌সের হাতে; খামের উপরে ফ্যানির হাতের লেখা দেখেই সে এমন উত্তেজিত হয়ে উঠল যার জের চলেছিল কয়েক দিন ধরে। কীট্‌স তার বন্ধু সেভার্ণকে ডেকে বলল, এ চিঠি আমি পড়তে পারব না; মৃত্যুর পরে আমার বুকের উপর রেখে কবর দিও। কীট্‌সের এই নির্দেশ পালন করা হয়েছিল। কীট্‌সের কাছে ফ্যানি শেষ চিঠিতে কি লিখেছিল কে জানে? অ-খোলা চিঠির মর্ম চিরদিনের জন্য অজানা থেকে গেল।

কীট্‌সের মৃত্যুসংবাদ ফ্যানি ধীরভাবেই গ্রহণ করল। সে ছিল চাপা স্বভাবের মেয়ে। তাছাড়া তার প্রেম অন্য কেউ বুঝত না। যার সঙ্গে বিয়ে হয়নি, যার মৃত্যু আসন্ন জানাই ছিল, তার জন্য এত শোক কেন? ফ্যানি তাই কীট্‌সের বোনকে লিখেছিল, অন্য সকলে তোমার দাদার কথা ভুলে যাক, শুধু আমার বেদনাটা বেঁচে থাক। কীট্‌সের মৃত্যুর ছ'বছর পর পর্যন্ত ফ্যানি বিধবার কালো পোষাক পরেছে, চুল ছেঁটেছে ছোট করে। ফ্যানি রূপবতী ছিল, তাকে বিয়ে করবার লোকের অভাব ছিল না। কীট্‌স ফ্যানি সম্বন্ধে বলেছিল: The richness, the bloom, the full form, the enchantment of love after my own heart. পঞ্চাশ বছর বয়সেও ফ্যানি সম্পর্কে এই কথাগুলি প্রযোজ্য ছিল। সুতরাং কীট্‌সের মৃত্যুর পর থেকে অনেক পাণিপ্রার্থীকে যে ঠেকাতে হয়েছে তাতে আশ্চর্য কিছু নেই। কীট্‌সের মৃত্যুর বারো বছর পরে ফ্যানি লুই লিণ্ডোকে বিয়ে করে। তা-ও বোধ হয় কীট্‌সের সঙ্গে লিণ্ডোর সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছিল বলে। বিয়ের পর ফ্যানি স্বামীর সঙ্গে য়ুরোপের বহু জায়গায় ঘুরেছে; কীট্‌সের দেওয়া উপহারগুলি সর্বদা কাছে রেখেছে, তার কাছে লেখা কীট্‌সের চিঠির তাড়া স্বামীর দেখে ফেলবার আশঙ্কা সত্ত্বেও সে কখনো হাতছাড়া করেনি। ফ্যানি যত্ন না করলে ইংরেজী সাহিত্যের এই অমূল্য সম্পদগুলি চিরদিনের জন্য হারিয়ে যেত।

কীট্‌সকে ফ্যানি কখনো ভোলেনি। একদিন কীট্‌স ফ্যানিকে বলেছিল, তোমার যদি ছেলে হয় তা হলে তার নাম 'জন' রেখো না; এ নামটা বড় অপয়া; আমার 'জন' নাম থেকেই তা বুঝতে পারছ! তোমার ছেলের নাম রেখো 'এডমাণ্ড', বড় ভাল নাম। ফ্যানির একথা মনে ছিল; ছেলের নাম রেখেছিল এডমাণ্ড (অর্থ=rich protection)।

পরিণত বয়সে ফ্যানি হাম্পস্টেডে ফিরে আসে। এখানেই কীট্‌সের সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল। একে একে কীটসের বন্ধুরা মারা গেছে। সেভার্ণ তখনো ইতালীতে কীট্‌সের সমাধির কাছাকাছি থাকে, আর এখানে আছে ফ্যানি। ১৮৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে পঁযষট্টি বৎসর বয়সে ফ্যানির মৃত্যু হয়! মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকে অর্থাভাব দেখা দিয়েছিল। ইতালী যাত্রার পূর্বে কীটস সেভার্ণের আঁকা তার ছবি ফ্যানিকে উপহার দিয়ে গিয়েছিল। সারা জীবন যত্ন করে রেখে মৃত্যুর পূর্বে ফ্যানি সে ছবি স্বামীর হাত দিয়ে এক বন্ধুর কাছে বিক্রি করতে পাঠাল; সঙ্গে দিল এই চিরকুট: It would not be a light motive that would make me part with it. ফ্যানির জীবনীকার এই কারণের উপর আলোকপাত করতে পারেননি। দারিদ্র্য কি এতদিনের সযত্ন-লালিত প্রেমকে শেষ পর্যন্ত পরাভূত করতে সক্ষম হলো?

Publishers : Thames and Hudson ; London. 15/-

পুলিস সাহেবের স্মৃতিকথা

১৯২৯ সালের ২৯শে ডিসেম্বর বড়লাটের স্পেশাল ট্রেণ কলকাতা থেকে যাত্রা করেছে। পয়লা জানুয়ারী দিল্লীতে সৈন্যদের নববর্ষের অভিবাদন গ্রহণ করবেন বড়লাট। অকস্মাৎ দিল্লী থেকে প্রায় চৌদ্দ মাইল দূরে রেললাইনের উপর প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ হলো। বড়লাটের পরিচারকদের মধ্যে অনেকে মারা গেল। যে কামরায় বড়লাট ছিলেন তার কোন ক্ষতি হলো না। তদন্তের ফলে দেখা গেল যে পাঁচশ' গজ দূরে একটা অব্যবহৃত দুর্গে বসে বিপ্লবীরা ব্যাটারি ও তারের সাহায্যে রেল লাইনের উপর বোমা ফাটিয়েছে।

পুলিশ বিভাগে প্রচণ্ড আলোড়ন ও কর্মতৎপরতা দেখা দিল। কিন্তু এ কাজের সঙ্গে যারা লিপ্ত তাদের খোঁজ পাওয়া গেল না। না পাওয়া গেলেও পুলিশ প্রত্যেক সন্দেহভাজন ব্যক্তির উপর কড়া নজর রাখতে লাগল। উত্তর-প্রদেশের অন্যতম বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদ গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য পুলিশের সঙ্গে লড়াই করে প্রাণ দিলেন। তারপর বিপ্লবীদের কার্যকলাপ একটু মন্দীভূত হলেও পুলিশের কড়া নজর শিথিল হলো না।

এলাহাবাদ পুলিশ লক্ষ্য করল যে, শহরতলীর একটি নতুন বাড়ির দোতলা ফ্ল্যাটে একটি ইংরেজ যুবতী একা একা বাস করে, চাকরি করে স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে। যুবতীটিকে বড় বেশী ভারতীয় ভাবাপন্ন বলে মনে হয়। এজন্য সন্দেহ হলো, শুরু হলো খোঁজ খবর নেওয়া। জানা গেল মেয়েটির জীবনের ইতিহাস। সে এক পাদ্রীর মেয়ে; সতেরো বছর পর্যন্ত মা-বাবার সঙ্গে কাটিয়েছে চীন দেশে। তারপর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলো। ওখানকার পড়া শেষ করে চীন দেশে কোনো চাকরি নিয়ে যাবে, এই ছিল ইচ্ছা। কিন্তু বাধা সৃষ্টি করল ভারতের এক মুসলমান যুবক। সে ব্যারিস্টারী পাশ করে লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকসে যোগ দিয়েছে। ওদের দু'জনের পরিচয় ক্রমশঃ গভীর প্রণয়ে পরিণত হলো। যুবতী প্রথম আপত্তি করেও শেষ পর্যন্ত প্রেমের জন্য মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে যুবককে বিয়ে করল।

ভারতে আসবার পথে জাহাজে যুবতীটি প্রথম আঘাত পেল বৃটিশ অফি-সারের পত্নীদের কাছ থেকে। একজন ভারতীয়কে বিয়ে করেছে বলে অবজ্ঞায়

তারা ওর সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলল না। তারপর স্বামীর বাড়ি এসে তো একেবারে সম্পূর্ণ নতুন জগতে পড়ল। শ্বশুর বাড়ির লোকেরা এ বিয়েকে সুনজরে দেখেনি; কেউ ইংরেজী জানে না, সুতরাং কথা বলবার সুযোগ নেই; সর্বোপরি জোর করে তাকে পর্দানশীন করা হয়েছে। খাওয়া-দাওয়া, আচার-ব্যবহার, জীবন যাত্রার পদ্ধতি এত পৃথক, এত ভয়াবহরূপে নতুন যে, মেয়েটির সকল স্বপ্ন দুদিনেই মিলিয়ে গেল। একমাত্র সান্ত্বনা পারিবারিক গ্রন্থালয়ের বইগুলি। হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে দু'চার খানা বই পড়ে সে মুগ্ধ হলো। দেখল, মুক্তি আছে হিন্দু ধর্মের উদারতায়। আরো জানতে পারল কাশীতে সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ নামে একটি শিক্ষালয় আছে। একদিন কাউকে কিছু না বলে কাশীর গাড়ীতে উঠে বসল। সেখানে পৌঁছে ভর্তি হলো সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ-এ। যেন নতুন জীবন লাভ করল। কোনো বাধা নেই,—মুক্ত উদার জীবন পেয়েছে। এখানে পড়তে পড়তেই সে থিওসফির প্রতি আকৃষ্ট হয়। থিওসফির মূলকেন্দ্র আদিয়ারে কয়েক মাস থাকবার পর এলাহাবাদের ক্রস্‌থ্‌-ওয়েট গার্লস হাই স্কুলে চাকরি নিয়ে আসে। পুলিশ মহলে সে "ফ্ল্যাটের অধিবাসী রহস্যময়ী নারী" বলে পরিচিত হলো।

তখন দুপুর রাত্রি। গোয়েন্দা পুলিশের চর লক্ষ্য করল একজন লোক চুপি চুপি দোতালার ফ্ল্যাটে উঠে তিনবার মৃদু টোকা দিতেই দরজা খুলে গেল। লোকটি রহস্যময়ীর ফ্ল্যাটে প্রবেশ করল। শেষ রাত্রিতে গোয়েন্দা পুলিশের অফিসার পিল্‌দিচের নেতৃত্বে বাড়ি চড়াও করে রহস্যময়ীর ফ্ল্যাটে আবিষ্কার করল এক ভারতীয় যুবককে। যুবক পুলিশকে ঠেকাবার জন্য কয়েকবার রিভলবার থেকে গুলি ছুঁড়ে আত্মসমর্পণ করল। যুবকের নাম যশপাল। বড়লাটের গাড়ীতে বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে পুলিশ এর সন্ধান করছিল। সেই অব্যবহৃত দুর্গে বসে যশপালই টিপেছিল বোমার রিলিজ।

সকাল বেলা পুলিশের বড় কর্তা হলিন্‌স্‌ সাহেব এলেন। রহস্যময়ী যুবতী তখন একটা বেতের চেয়ারে বসে ছিল। বছর সাতাশ বয়স; সুন্দরী; একটু গোল চাঁদের মুখ; মাথা ভরা কোঁকড়ানো কালো চুলের নিচে দুটি ঘন নীল চোখ। যেন পুলিশের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের বিষে এত নীল হয়েছে। পুলিশ সাহেব অনেক ভয় দেখিয়ে, মিষ্টি কথা বলেও মেয়েটির কাছ থেকে কিছুই বের করতে পারলেন না। তার কেবল এক কথা: আমি কিছুই বলব না।

বিপ্লবীকে আশ্রয় দেবার অপরাধে যুবতীকে গ্রেপ্তার করা হলো। পুলিশের

আদেশ অগ্রাহ্য করে সে চেয়ারে বসে রইলো—কিছুতেই উঠবে না। যখন হাত ধরে জোর করে তাকে ওঠানো হলো তখন দেখা গেল সে ছুটো রিভলবার ও চল্লিশটা কার্তুজের উপর বসে ছিল পুলিশের কাছ থেকে ওগুলো গোপন করার জন্য।

সম্রাটের শত্রুকে আশ্রয় দেবার অপরাধে যুবতীর ছু'বছরের জেল হলো। মামলার বিবরণ কাগজে পড়ে রহস্যময়ী নারীর ভূতপূর্ব স্বামী মুসলমান ব্যারিস্টার পুলিশের বড়কর্তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। খুব বিচলিত দেখাচ্ছে তাকে। কর্তাকে বলল, আমার বাড়ি থেকে যেদিন ও না বলে চলে এসেছে সেদিনই ওকে ত্যাগ করেছি। কিন্তু ভুলতে পারিনি, এখনো ভালোবাসি। এদেশের জেলে নানা জাতের অপরাধী মেয়েদের মধ্যে কি ক'রে ও ছু'বছর কাটাবে তা আমি ভাবতে পারছি না। দয়া করে ওকে বৃটেনের কোন জেলে পাঠিয়ে দিন।

পুলিশের কর্তা বললেন, তা তো হয় না। তবে ছু'বছর পরে জেল থেকে বেরুলে ও যাতে ইংলণ্ডে ফিরে যায় সে ব্যবস্থা আমি করব বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

ব্যারিস্টার ধন্যবাদ দিয়ে যখন বিদায় নিল তখন তার ছু'গাল বেয়ে চোখের জল নামছে। পুলিশের কর্তা প্রতিশ্রুতি পালনের সুযোগ পাননি। মাত্র এক বছর পরে ভারতের এক কারাগারে এই রহস্যময়ী বিদেশী তরুণীর মৃত্যু হয়।

এই অজ্ঞাতনামা যুবতী সত্যি রহস্যময়ী থেকে গেল। কেন সে বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিল, যশপালের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, সে রহস্য কেউ জানতে পারল না। যেটুকু উপরে লেখা হলো সেটুকুও জানা যেত না যদি উত্তরপ্রদেশের অবসরপ্রাপ্ত পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল S. T. Hollins তাঁর স্মৃতিকথা No Ten Commandments-এ কাহিনীটির উল্লেখ না করতেন। হলিন্‌স্‌ বিয়াল্লিশ বছর যাবৎ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পুলিশ বিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা থেকে হলিন্‌স্‌ লিখেছেন No Ten Commandments. পুলিশকে যে সব ঘটনা তদন্ত করতে হয়েছিল তারই কতকগুলি নির্বাচিত কাহিনী। বই-এর নামটি কিপলিং-এর কবিতা থেকে নেওয়া। সুয়েজখালের পূর্বদিকে নীতিবোধ নেই, অরাজকতার রাজত্ব—এটাই বোঝায়। পুলিশের গুলিতে নিহত চন্দ্রশেখর আজাদকে চুলের মুঠি ধ'রে তুলে রাখবার ছবিটা ভারতীয় পাঠকদের নিশ্চয়ই আঘাত

করবে। লেখক বৃটিশ আমলে পুলিশের কর্তা ছিলেন; তবু তাঁর রচনায় ভারতবাসীর বিরুদ্ধে কুৎসা নেই, তাদের ছোট করে দেখবার অপচেষ্টা নেই। হলিন্স্ গল্প লেখকের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি দিয়ে যে সব ঘটনা দেখেছেন তাদের সুন্দর স্বচ্ছ ভাষায় লিখেছেন। লেখক নিজেকে আড়ালে রেখেছেন; তাই বইটি সুখপাঠ্য হয়েছে। গোয়েন্দা কাহিনীর মতো পাঠককে আকৃষ্ট করে রাখবার ক্ষমতা আছে রচনা-কৌশলের মধ্যে। কত লোভ, পাপ, প্রণয় ও বিষাদের কাহিনী! বংশীনগরের বৃদ্ধ পুরোহিত লোকনাথ হিন্দু ধর্মের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সতীদাহ প্রথার প্রবর্তন করেছিল। পুলিশ গ্রেপ্তার করবার পর সে দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছিল, এই যে আমি একটি নারীকে সতী করতে পেরেছি, সে চিতার আগুন আর নিববে না, হাজার হাজার নারী আবার স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিয়ে সতী হবে। মদনমোহনের বন্ধ্যা স্ত্রী সুন্দরী পুত্রবতী হবার আকাঙ্ক্ষায় একটি চার বছরের ছেলেকে কালীর সম্মুখে বলি দিয়ে সেই রক্তে স্নান করেছিল। হায়দরাবাদের এক অপরূপ সুন্দরী কিশোরীকে বিয়ে দেবার ছল করে তার বাবা ব্যবসা করত। ধনীর পাগল কিংবা বোকা ছেলের বিয়ে হয় না; কানাইয়ালাল মোটা টাকা নিয়ে নিজের মেয়েকে বিয়ে দেয় তেমন ছেলের সঙ্গে। কিন্তু বিয়ের দু একদিন পরই মেয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে আসে শ্বশুর বাড়ি থেকে, তারপর পিতা-পুত্রী সে অঞ্চল থেকে উধাও হয়ে যায়। শেষবার যখন এই প্রতারণা ধরা পড়ল তখন মেয়েটি সর্বশেষ শ্বশুর বাড়িতে বেশ সুখেই আছে। পুলিশ গ্রেপ্তার করতে আসায় সে কেঁদে বলল, এর আগে যাদের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তারা স্বামীর যোগ্য ছিল না; এবার আমি মনের মতো স্বামী পেয়েছি, তাকে ভালবেসেছি, বাবার কাছে আর ফিরে যাবো না, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও। মীরাটে ডি, সিলভার ভারতীয় পাচক প্রভু-কন্যার অবৈধ সন্তানকে হত্যা করে জেলে গিয়েছিল। সন্তানের দায়িত্ব তার ছিল না; কিন্তু দূর থেকে সে সুন্দরী তরুণীকে ভালোবাসত। তার সুনাম রক্ষার জন্য নিজে স্বেচ্ছায় বিপদ বরণ করেছিল। এমনি আরো কত চরিত্র মনের উপর দাগ রেখে যায়। গ্রাম্য বালিকা শান্তি ও তার প্রণয়ী মাধোলালের বিয়োগান্ত কাহিনীটি চিত্তাকর্ষক। শান্তি ধনীর মেয়ে; মাধো-লালের বাবা শুধু দরিদ্র নয়, শান্তির বাবার নিকট ঋণী। আর্থিক অবস্থার এই বৈষম্য কিন্তু ওদের হৃদয় বিনিময়ের বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। মাধোলাল শান্তিকে বিয়ে করতে চাইল। বলা বাহুল্য, দারিদ্র্যের ওজুহাতে সে প্রার্থনা

মঞ্জুর হলো না। ওর বিয়ে দেওয়া হলো এক ধনী বৃদ্ধের সঙ্গে। শান্তি সুখী হলো না। রাত্রিতে গোপনে এসে দেখা করে মাধোলালের সঙ্গে। এক দিন ধরা পড়ল। দ্বিচারিণী হবার অপরাধে শান্তির নাক কেটে দেওয়া হলো। মাধোলালও প্রাণ হারালো শান্তির বাবা ও ভাইদের হাতে। পুলিশ এসে শান্তিকে শহরের হাসপাতালে পাঠালো চিকিৎসার জন্য। ঘা শুকাবার পর ফিরে এসে প্রথম জানতে পারল মাধোলালকে খুন করা হয়েছে। কয়েকদিন পরে গ্রামে শেষ প্রান্তে এক কুয়ার মধ্যে শান্তির মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গেল। মাধোলালের সঙ্গে সত্বর মিলনের এ ছাড়া অন্য পথ ছিল না।

বাঙ্গালী বহুদর্শী পুলিশ কর্মচারীরা এরকম বই লিখে সাহিত্যে বৈচিত্র্য আনতে পারেন না? বিশেষ করে যাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলন দমনে লিপ্ত ছিলেন তাঁরা অনেক অজানা কাহিনী শোনাতে পারেন। এদের সাহিত্যিক মূল্য ও ঐতিহাসিক মূল্য দুই-ই হতে পারে।

Publishers: Hutchinson, London, 16/-

য়ুংকাঙ্ গুহামন্দির

ভারতীয় সভ্যতা কত গভীরভাবে পার্শ্ববর্তী দেশগুলিকে প্রভাবান্বিত করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের প্রাচীন সাহিত্য ও শিল্পকলার নিদর্শন থেকে। বিশেষ করে বৌদ্ধধর্ম আমাদের প্রতিবেশীদের ধর্মজীবনেই একমাত্র আলোড়ন সৃষ্টি করেনি; তাদের শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টি করতেও উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই নিদর্শনগুলির মধ্যে ভারতীয় ইতিহাসের স্বাক্ষর রয়েছে, সুতরাং ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পূর্ণ পরিচয় পেতে হলে এদের কথাও জানা প্রয়োজন।

ব্রহ্ম, শ্যাম, জাভা, বলিদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় শিল্প পদ্ধতির প্রসার সম্বন্ধে যতটা আলোচনা হয়েছে চীনের শিল্পকলায় ভারতের প্রভাব নিয়ে ততটা আলোচনা হয়নি। চীনের নিজস্ব শিল্পধারা বিশেষ উন্নত ছিল। ভারতীয় পদ্ধতি হয়তো সেখানে সমাদর লাভ করত না, যদি না সে বৌদ্ধধর্মের সহগামী হতো। ধর্মের সঙ্গে যার যোগ তা পবিত্র, সুতরাং শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণযোগ্য।

ভারতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে চীনা বণিকরা এই আশ্চর্য নতুন ধর্মের কথা দেশে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর একে একে কত পরিব্রাজক হিমালয় পার হয়ে মধ্য এশিয়ার পথে চীনে প্রবেশ করে বুদ্ধবাণী প্রচার করেছেন। প্রথম প্রথম বৌদ্ধধর্ম চীনে সমাদর লাভ করেনি; অনেক ক্ষেত্রে বিরোধিতারও সম্মুখীন হতে হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের স্বর্ণযুগ শুরু হলো ওয়েই সম্রাটদের রাজত্ব-কালে। রাজবংশের অনেকেই বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিলেন; কেউ কেউ রাজত্ব ছেড়ে গ্রহণ করলেন সন্ন্যাস। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় চীন, মঙ্গোলিয়া ও তুর্কীস্থানে অসংখ্য বৌদ্ধ মঠ ও মন্দির স্থাপিত হলো। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা মুক্তি পেলেন বাধ্যতামূলক সামরিক দায়িত্ব এবং কর দেবার দায় থেকে। বৌদ্ধ বিহারগুলির জন্য বরাদ্দ হলো মোটা টাকা। ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের জীবনে এল স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রচুর অবসর। তাঁরা সুযোগ পেলেন বিহার ও মন্দিরগুলিকে শিল্পমণ্ডিত করে তুলতে।

উত্তর চীন, মঙ্গোলিয়া এবং তুর্কীস্থানে হাজার হাজার বৌদ্ধ মঠ ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এদের অধিকাংশই আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সৌভাগ্যক্রমে পাহাড় কেটে যে গুহামন্দির করা হয়েছিল কালের হাত এড়িয়ে

তাদের কয়েকটি এখনো দাঁড়িয়ে আছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ য়ুং কাঙ (Yun-Kang) গুহামন্দির সমষ্টি। লুঙ্‌মেন-এর গুহামন্দিরগুলি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

য়ুং কাঙ্‌ স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট শি-কু-সি বা পাহাড়ে মন্দির নামে পরিচিত। পাহাড় কেটে এই মন্দির করা হয়েছিল বলে দেড় হাজার বছর পরেও এর শিল্প নিদর্শনগুলি অবিকৃত রয়েছে। চীনের শানশি প্রদেশে পিকিং-পাওতো রেল লাইনের উপরে তাতুঙ্‌ একটি প্রধান শহর। এই তাতুঙ্‌ থেকে প্রায় আট মাইল পশ্চিমে য়ুচাউ নদীর তীরে য়ুংকাঙ্‌ গ্রাম অবস্থিত। নদীর তীর ঘেঁষে যে পাহাড় উঠেছে সেই পাহাড় কেটে গুহামন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। বৃহৎ ও মধ্যম আকারের মন্দিরের সংখ্যা চল্লিশের ও অধিক, তাছাড়া ছোট গুহা এবং পাথর কেটে কুলুঙ্গি ও খোঁজখাজ করা হয়েছে অসংখ্য। উত্তর ওয়েই রাজবংশের সম্রাট ওয়েং চেঙ্‌-এর রাজত্বকালে অধিকাংশ গুহামন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। এদের নির্মাণকাল মোটামুটি ৪৬০ থেকে ৪৯৪ খৃস্টাব্দের মধ্যে। ৪৯৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তাতুঙ ছিল উত্তর ওয়েই রাজবংশের রাজধানী। রাজধানী হোনানের অন্তর্গত লোয়াঙ এ স্থানান্তরিত হবার পর থেকে ক্রমশঃ য়ুংকাঙ্‌ অঞ্চলের প্রাধান্য কমে আসে। যেখানে একদিন দেশের শাসনকেন্দ্র স্থাপিত ছিল, হাজার হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষুণী যে অঞ্চলে বুদ্ধবাণী প্রচার করে ঘুরে বেড়াত, যেখানে ভারত, আফগানিস্থান, গ্রীস প্রভৃতি দেশ থেকে বণিক ও পণ্ডিতের সমাগম হতো, তা ধীরে ধীরে জনমানবহীন হয়ে পড়ল। য়ুংকাঙ্‌ গুহামন্দিরের কথা বাহিরের জগৎ ভুলে গেল।

১৯০২ সালে অধ্যাপক ইতো দুর্গম পথ অতিক্রম করে য়ুংকাঙ্‌ অঞ্চলে উপস্থিত হন। এর পাঁচ বছর পর প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত অধ্যাপক ই, শাভান (E. Chavannes) য়ুংকাঙ্‌-এর গুহামন্দির আবিষ্কার করে তার বিবরণ প্রচার করেন। তারপর থেকে অনেক পণ্ডিত এই গুহামন্দিরের আকর্ষণে য়ুংকাঙ্‌ পরিদর্শন করেছেন। কিন্তু য়ুংকাঙ্‌ মন্দিরের বিরাটত্ব এবং ঐ অঞ্চলের দুর্গমতার জন্য পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি।

আধ মাইলের উপর বিস্তৃত এই গুহামন্দির সমষ্টি শুধু প্রাচীন বৌদ্ধ-শিল্পের নিদর্শন নয়; চীনের সাংস্কৃতিক জীবনের ছাপও এর মধ্যে পাওয়া যাবে। দেড় হাজার বছর ধরে মোটামুটি অক্ষত অবস্থায় থাকলেও মন্দিরের অনেক স্থানে ধ্বংসের হস্তস্পর্শ চোখে পড়ে। বালি পাথরের খোদাই অনেক মূর্তি ভেঙ্গে

পড়েছে। পণ্ডিত ব্যক্তিরা এখন থেকে ছবি তুলে না রাখলে এবং বর্ণনা লিপি-বদ্ধ না করলে অনেক শিল্প নিদর্শনই চিরকালের জন্য হারিয়ে যাবার আশঙ্কা ছিল। জাপানের কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিট্যুট অব ওরিয়েণ্টাল কালচার য়ুংকাঙ গুহামন্দিরের পূর্ণ পরিচয় সংকলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ১৯৩৮ সালে। অধ্যাপক মিৎসুনো এবং নাগাহিরোর উপর ভার ছিল অনুসন্ধান, তথ্যসংগ্রহ এবং ফটোগ্রাফ তোলবার।

কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিযাত্রী দল ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত প্রতিবৎসর তিন থেকে ছ'মাস য়ুংকাঙে বাস করে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। জনমানবহীন দুর্গম অঞ্চলে নানাপ্রকার অসুবিধার জন্য এর চেয়ে বেশি সময় একটানা থাকা সম্ভব ছিল না। যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর অসুবিধা আরো বাড়ল। অর্থাভাব, প্রয়োজনীয় সাজ-সজ্জার অভাবও অনুসন্ধানে বাধা দিয়েছে। গুহার ভিতরে ছবি তোলা প্রথম তো প্রায় অসম্ভব মনে হয়েছিল। কারণ সেখানে বিদ্যুৎ ছিল না। তার পরে অনেক কৌশলে এমন করে আয়নার বিন্যাস করা হলো যে, সূর্যালোক গুহার ভিতরে প্রতিফলিত হয়ে ফটো তোলা সম্ভব করল। ছবি তোলবার পূর্বে আর একটি কষ্টসাধ্য কাজ করতে হয়েছিল। হাজার হাজার মূর্তি ঢাকা পড়ে ছিল ধুলার আচ্ছাদনে। কোথাও কোথাও ধুলা পুরু ছিল এক ইঞ্চি। এদের ঘষে মেজে পরিষ্কার করা এক বিরাট ব্যাপার। এত পরিশ্রম করেও য়ুংকাঙ-এর সবগুলি মন্দিরের কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। প্রধান প্রধান কুড়িটি গুহার বিবরণ সংগ্রহ করা হয়েছে। এই গবেষণার প্রথম খণ্ড যখন প্রকাশের জন্য প্রস্তুত তখন টোকিওর উপর বোমা বর্ষণের ফলে (১৯৪৩) তা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল। অধ্যাপক মিৎসুনো ও নাগাহিরোর অধ্যবসায় এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় ভেঙ্গে পড়েনি। তাঁরা আবার নতুন উদ্যমে গবেষণার ফলাফল লিপিবদ্ধ করেছেন। এই বিরাট চিত্রবহুল গ্রন্থ প্রকাশের জন্য মুদ্রণের বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন এবং তার জন্য চাই প্রচুর অর্থ। য়ুংকাঙ গুহামন্দির সম্বন্ধে জাপানের জনসাধারণ আশ্চর্য উৎসাহ দেখিয়েছে। তারা স্বেচ্ছায় গ্রন্থ প্রকাশের জন্য চাঁদা দিয়েছে। জাপান সরকার, জনসাধারণ ও কিয়োটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যে Yun Kang Cave Temples খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে ১৯৫১ সাল থেকে। গ্রন্থ সম্পূর্ণ হবে ১৯৫৭ সালে এবং থাকবে মোট পনেরো খণ্ড। প্রত্যেক খণ্ডের দুটি পৃথক ভাগ আছে; একটিতে পাঠ্যাংশ অন্যটিতে ছবি। পাঠ্যাংশ ইংরেজী ও জাপানী ভাষায় রচিত।

ছবিগুলি কলোটাইপ পদ্ধতিতে ছাপা। ছাপা, ছবি, বাঁধাই, জাপানী মুদ্রণশিল্প যে কতদুর উন্নত হয়েছে তার প্রমাণ দেবে। সম্পূর্ণ গ্রন্থের দাম হবে প্রায় দু'হাজার ছ'শ টাকা। এ পর্যন্ত সাতটি খণ্ড (মোট চৌদ্দ ভাগ) প্রকাশিত হয়েছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থ মানুষের অনুসন্ধিৎসা ও পাণ্ডিত্যের এক অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করবে।

ভারত ও মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধ ভাস্কর্য অনেক দুর উন্নতি করবার পর চীন তাকে গ্রহণ করেছে। সুতরাং চীনের শিল্পরীতি সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বৌদ্ধ ভাস্কর্যকে নতুন শিল্পভঙ্গী দান করবার সুযোগ ছিলনা। কারণ মূর্তির গঠন, ভঙ্গী, ইত্যাদির একটা ধরাবাঁধা রূপ তখন স্থির হয়ে গেছে ; এদের বাদ দিয়ে নতুন কিছু প্রবর্তন করবার অর্থ হলো ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেওয়া। তাই চীনের শিল্পীরা তুঙ্‌হুয়াংএর পথে আসা ভারতীয় বৌদ্ধ ভাস্কর্যকেই মোটামুটি ভাবে গ্রহণ করেছে। জনশ্রুতি এই যে য়ুংকাঙ্‌ গুহামন্দির ভারতীয় শিল্পীদের কীর্তি। একথা সম্পূর্ণ সত্য না হলেও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, য়ুংকাঙ-এর শিল্পীদের এক বৃহৎ অংশ ছিলেন ভারতীয়। তা না হলে বৌদ্ধ মন্দিরে চীনের সুদুর উত্তর অঞ্চলে বিষ্ণু ও তাঁর বাহন গরুড়, মহাদেব, প্রভৃতি হিন্দু দেবতার মূর্তি কেন পাওয়া যাবে ?

অবশ্য শুধু ভারতীয় নয়,—এখানে মিলিত হয়েছে নানা শিল্পধারা। ভারতীয়, গ্রীক, গান্ধার, মধ্য এশিয়া প্রভৃতি সকল শিল্পরীতির সংমিশ্রণ দেখা যায় এখানে। পারশ্যের অলঙ্করণ এবং তক্ষশীলার রিলিফও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রচলিত এবং পরিচিত মূর্তিগুলি ছাড়া অন্যান্য মূর্তিতে বৈশিষ্ট্য দেখাবার সুযোগ পেয়েছে শিল্পী। এইসব মূর্তিগুলির মুখের আদল চীনা, এবং সেখানে ফুটে উঠেছে বিদ্রূপাত্মক চৈনিক চাপা হাসি। চীনের প্রভাব এই নামহীন মূর্তিগুলিতেই বেশি ফুটেছে।

য়ুংকাঙ গুহায় বুদ্ধদেবের জীবনীর বিভিন্ন ঘটনা সম্বন্ধে ঊনত্রিশটি মূর্তি আছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লুম্বিনী উদ্যানে বুদ্ধের জন্ম, গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভ, বুদ্ধদেবের প্রথম ধর্মোপদেশ এবং পরিনির্বাণের ভাস্কররূপ। এখানকার পাঁচটি গুহায় যে পাঁচটি বিরাট বুদ্ধ মূর্তি আছে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে মন অভিভূত হয়ে পড়ে। তাঙ্‌য়াও নামে একজন বৌদ্ধ শ্রমণ ৪৫৪ খৃস্টাব্দে সর্বপ্রথম একাকী য়ুংকাঙ্‌ মন্দির নির্মাণ আরম্ভ করেন। তিনি

নিজে পাঁচটি বিরাট বৌদ্ধ মূর্তি তৈরী করেছেন; এর মধ্যে একটি ৭০ ফুট, আর একটি ৬০ ফুট উঁচু।

য়ুংকাঙ্‌ গুহামন্দিরে হাজার হাজার মূর্তি দেড় হাজার বছর ধরে শ্রদ্ধানত দর্শকের জন্য অপেক্ষা করে আছে। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত দেওয়ালের কোথাও ফাঁক নেই। হয় শান্ত সমাহিত বুদ্ধ মূর্তি, কিংবা তাঁর ভক্তদের মূর্তি সবটুকু স্থান অধিকার করে আছে। সেই প্রায়ান্ধকার গুহার মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালে মনে এক অপূর্ব অনুভূতি জাগে। যেন এক নতুন জগতে, বুদ্ধময় জগতে, প্রবেশ করেছি। যারা একদিন অসীম শ্রদ্ধায় পরম ধৈর্য-সহকারে এই অপূর্ব জগৎ রচনা করেছিল, তাদের নাম কারো জানা নেই। কিন্তু ভারতীয় ও চীনা শিল্পীদের শিল্পমানসের পরিচয় বুকে করে য়ুংকাঙ্‌ গুহা এখনো লোকচক্ষুর বাহিরে জনহীন প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছে।

Publishers : Kyoto University ; Kyoto, Japan. Rs. 2600/-

সেই ১৮১৬ সালের কথা। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন ইংরেজ ডাক্তার পঁচিশ বছর ভারতে থাকবার পর এদেশের রোগ সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেছেন যে, এখানে যক্ষ্মা প্রায় নেই বললেই চলে। উষ্ণ জলবায়ু রোগ বিস্তারের প্রতিবন্ধক বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রতি বছর ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ লোক ক্ষয়রোগে মারা যায় এবং প্রায় পাঁচ কোটি লোক কোন না কোনো রকমে এই রোগ থেকে ভুগছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই রোগীদের একটা বৃহৎ অংশ ভারতের ঘাড়ে পড়েছে। পশ্চিম বাংলাতেই আছে প্রায় দেড় লক্ষ যক্ষ্মা রোগী।

কিন্তু দেড়'শ বছর পূর্বে যে রোগ ছিল না, কি করে তার প্রসার হলো ? অনেকে বলেন য়ুরোপের লোক এশিয়া ও আফ্রিকার সাম্রাজ্য জয় করতে বেরিয়ে রোগ ছড়িয়েছে। আমরা নিজেদের সনাতন জীবনযাত্রার পদ্ধতি ত্যাগ করে পাশ্চাত্য রীতি অবলম্বন করে এই মারাত্মক রোগ ডেকে এনেছি। যেসব জাতি এখনো তাদের পুরাতন আচার-পদ্ধতি রক্ষা করে চলেছে তারা আজও যক্ষ্মা থেকে অনেকাংশে মুক্ত। আমাদের দেশেই তো দেখা যায় গ্রামে এর প্রকোপ অনেক কম সহরের তুলনায়। ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের জীবনে গভীর পরিবর্তন এলো এবং সেই সময় সুযোগ বুঝে বিস্তার লাভ করল যক্ষ্মা। শুধু ইংলণ্ডে নয়, ফ্রান্স এবং য়ুরোপের অন্যান্য দেশেও এর বিভীষিকা ছড়িয়ে পড়ল। নব প্রতিষ্ঠিত কল-কারখানার চিমনির ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন নতুন পাতা সহরগুলিতে মানুষ হয়ে উঠল রক্তহীন বিশীর্ণ প্রেতমূর্তি। ক্ষয়রোগের প্রকৃত স্বরূপ তখনো কেউ জানে না; শুধু দেখে লোকগুলি রক্তশূন্য বিবর্ণ হয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যায়। তাই রোগলক্ষণ থেকে যক্ষ্মা নাম পেল White Plague, য়ুরোপে, বিশেষ করে ইংলণ্ডে, White Plague দেখা দিল মহামারীরূপে। নাগরিকরা ভীতত্রস্ত হয়ে উঠল। প্রকৃত স্বাস্থ্যবান লোকের এমনই অভাব ঘটেছিল যে, পাণ্ডুর, কৃশতনু মেয়েরাই তখন সুন্দরী বলে দৃষ্টি আকর্ষণ করত। একজন বিশিষ্ট ফরাসী লেখক বলেছেন যে, স্বাস্থ্যবতী মেয়েরা বার্লি খেয়ে যকৃতের ক্রিয়ায় বিকার

এনে ফ্যাকাশে হবার সাধনা করত সেকালে। কারণ রক্তহীন শীর্ণতা যেখানে স্বাভাবিক, স্বাস্থ্য-সমুজ্জল মেয়েদের সেখানে আদর পাবার সম্ভাবনা ছিল কম।

যক্ষ্মার মতো ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি আর নেই। এর প্রকোপ সংযত করবার জন্য অভিযান চালাতে হলে এই রোগের সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে Rene J. Dubos লিখেছেন : The White Plague ; Tuberculosis, Man and Society এর আগে লেখক লুই পাস্তর-এর জীবনী লিখে নাম করেছেন। নীরস তথ্যকে হৃদয়গ্রাহী করে উপস্থিত করবার কৌশল জানা আছে এঁর। তাই এই মারাত্মক রোগের বিবরণ ঠিক গল্পের মতো পড়া যায়। ক্ষয়রোগ মানুষের বহুদিনের পুরাতন সঙ্গী। মিশরের কোন মমি পরীক্ষা করে ক্ষয়রোগে মৃত্যুর প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রাচীন ভাস্কর্য ও সাহিত্যেও এর সন্ধান মিলে। এক রকমের ক্ষয়রোগ আক্রমণ করে ঘাড়ের মাংস গ্রন্থি, এর ফলে গলগণ্ডও দেখা দেয়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, বৎসরে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে রাজা কিম্বা রাণী রোগীকে স্পর্শ করলে রোগমুক্তির সম্ভাবনা আছে। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে যে এমনি অনুষ্ঠান হতো তা ইতিহাসেই পাওয়া যায়। ডাঃ জনসনও এই অনুষ্ঠানে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর নিজের ঘাড়ের রোগ সারাবার জন্য ১৭১২ সালে রাণী অ্যান তাঁকে স্পর্শ করেছিলেন, কিন্তু ফল হয়নি।

কেউ কেউ বলেন, ক্ষয় রোগীর সৃষ্টি-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। হ্যাভলক এলিস তাঁর A study of British genius নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর অন্তত চল্লিশ জন বৃটিশ মনীষীর ক্ষয়রোগ ছিল। আজকাল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা অবশ্য প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রতিভার সঙ্গে যক্ষ্মার কোন যোগা-যোগ নেই। তবু অনেক শিল্পী ও সাহিত্যিক যে ক্ষয়রোগাক্রান্ত হবার পরও প্রতিভার উজ্জ্বল পরিচয় দিয়েছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ডঃ জনসন, কীটস্, রবার্ট লুই স্টীভেনসন, ব্রণ্টি ভগ্নীদ্বয় প্রভৃতির নাম ইংরেজী সাহিত্য থেকে দেওয়া যেতে পারে। সমুদ্রে ডুবে না মরলে শেলীকেও শেষ পর্যন্ত যক্ষ্মাতেই মরতে হতো। বেহালার অমর যাদুকর Paganini এবং Chopin শোচনীয় মৃত্যু বরণ করেছেন যক্ষ্মার হাতে। রোগের আক্রমণে প্যাগানিনির কথা বলবার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে, দেহ জরাজীর্ণ, তবু য়ুরোপের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে তিনি অপূর্ব বেহালা বাজিয়ে শোনাতেন। তাঁর বাজনা শোনবার জন্য লোক উন্মাদ হয়ে যেত, প্রেক্ষা-গৃহের প্রবেশ পথে শুরু হতো মারামারি।

যক্ষ্মা যখন মহামারীরূপে দেখা দিয়েছে তখনও ইংলণ্ডে জানা ছিল না যে, এই রোগ সংক্রামক। শুধু ইতালীতে এমনি একটা আশঙ্কা ছিল, কিন্তু তার ভিত্তি প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। ১৮৭০ সালে জার্মাণ বিজ্ঞানী রবার্ট কচ প্রথম যক্ষ্মার জীবাণু সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত করেন। জীবাণু দ্বারা রোগ সংক্রামিত হয় একথা জানবার পর থেকেই পরীক্ষা শুরু হলো কি করে টীকার সাহায্যে এর হাত থেকে আত্মরক্ষা করা যেতে পারে। আজ পর্যন্ত যক্ষ্মা প্রতিষেধের যতগুলি পথ খুঁজে বার করবার চেষ্টা করা হয়েছে তার মধ্যে B. C. G. (Bacillus Calmette Guerin) টীকা সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য। ফরাসী বৈজ্ঞানিক Calmette ও Guerin এর আবিষ্কার করেছেন। প্রায় ত্রিশ বছর পরও এই টীকার কার্যকারিতা সম্বন্ধে লোকের মনে দৃঢ় আস্থা জাগেনি। ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেনে ব্যাপকভাবে বি-সি-জি টীকা দেওয়া হয়েছে এবং এরই ফলে সেখানে যক্ষ্মা রোগের প্রকোপ আশ্চর্যভাবে কমে গেছে বলে দাবী করা হয়। কিন্তু ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৪৯ সালের মধ্যে আইসল্যাণ্ডে যক্ষ্মার হার যত কমেছে এমন আর কোথাও নয়। অথচ সেখানে বি-সি-জি কিংবা অন্য কোনো প্রতিষেধক একেবারেই ব্যবহার করা হয়নি। বি-সি-জি ব্যবহারের সবচেয়ে অসুবিধা হলো এই যে, বিভিন্ন ব্যক্তির শরীরের অবস্থা অনুযায়ী মাত্রা নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। সস্তায় ব্যাপকভাবে টীকা দিতে হলে তা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

যক্ষ্মার নতুন ওষুধগুলি আবিষ্কৃত হবার অনেক আগে থাকতেই য়ুরোপ এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে। আজ তার ফলে এই মারাত্মক ব্যাধি ওদেশ থেকে ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। যক্ষ্মা সম্বন্ধে কি নিদারুণ অজ্ঞতা থেকে আজকের অবস্থায় য়ুরোপ এসে পৌঁছেছে তা জানলে আমাদের মনে আশা জাগবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে কি রকম ভ্রান্ত ধারণা ছিল তার মর্মান্তিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কীটসের জীবনী থেকে। কীটস তখন ছাত্র, বয়স বছর চৌদ্দ; এমন সময় তার মা'র হলো যক্ষ্মা। মাকে বড় ভালোবাসত কীটস; তাছাড়া সংসারে আর কেউ ছিল না। সুতরাং মার সেবার ভার নিতে হলো তাকেই। যক্ষ্মা যে সংক্রামক এ কথা তখন কেউ জানত না। ক্ষয়রোগে খোলা বাতাস গায়ে লাগা ভাল নয় এমনি একটা ধারণা ছিল। সুতরাং দরজা জানালা বন্ধ করে কীটস রোগীর ঘরে দিনের পর দিন কাটিয়েছে। কত বিনিদ্র রজনী শেষ করতে হয়েছে মার বিছানার উপর

বসে। মা মারা গেলেন। কয়েক বছর পরে ছোট ভাই টমের হলো ক্ষয়রোগ। তার সেবার ভারও পড়ল কীটসের উপর। রোগটা যে ছোঁয়াচে, রোগীর কাছে যেতে হলে যে সাবধানতার প্রয়োজন, একথা কেউ জানত না। কীটস অবাধে মেলা-মেশা করেছে, দু'জনে একই বদ্ধ ঘরে দীর্ঘকাল বাস করেছে; তাই টম মৃত্যুর পূর্বে দাদার দেহে রোগের অঙ্কুর রেখে গেল।

কীটসের শরীর কিছুদিন থেকে ভালো যাচ্ছে না। বাইরে থেকে কোনো রোগ চোখে পড়ে না, কিন্তু দেহময় একটা বিরক্তিকর অস্বস্তি। বন্ধু ব্রাউনের বাড়ী কয়েক দিনের জন্য কীটস বেড়াতে এসেছে। এক রাত্রিতে বাতি নিবিয়ে বিছানায় শুতে গেছে, এমন সময় একটা কাশি এল এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখ ভরে গেল লবণাক্ত স্বাদে। কীটস বন্ধুকে ডেকে বলল—শীগগির একটা আলো নিয়ে আসতে। ব্রাউন মোম নিয়ে এল। বালিশের উপর রক্ত পড়েছে। কীটস একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, এ রক্ত আমি চিনি। আমার আসন্ন মৃত্যুর শমন।

ডাক্তার এসে ব্যবস্থা করল রক্তক্ষরণের এবং পথ্য সংকোচের যে ব্যবস্থা হলো তাকে উপবাসেরই নামান্তর বলা যেতে পারে। ডাক্তারদের তখন বিশ্বাস ছিল, দেহে কোনো কারণে রক্তের প্রাচুর্য ঘটলে এবং তা বিষাক্ত হয়ে গেলে, কাশির সঙ্গে রক্ত বেরিয়ে আসে। তাই একমাত্র চিকিৎসা হলো রক্তক্ষরণ। কীটসের হাতের শিরা কেটে খানিকটা রক্ত বের করে দেওয়া হলো। কিন্তু রোগ বেড়েই চলল এবং ডাক্তাররা সেই বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে বার বার রক্তমোক্ষণের ব্যবস্থা করতে লাগল। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে তাকে উপদেশ দেওয়া হলো বায়ু পরিবর্তনের জন্য ইতালীর উষ্ণ আবহাওয়ায় যেতে। ইতালীতেও কীটসের চিকিৎসক রক্ত বের করে নিতে লাগল। আর পথ্য যা দেওয়া হলো তা খেয়ে (কীটস বলছে) একটা ইঁদুরকেও মরতে হবে ক্ষুধার তাড়নায়। কীটসের একনিষ্ঠ ভক্ত ও সেবক শিল্পী সেভার্ণ ডাক্তারকে লুকিয়ে ভয়ে ভয়ে অতিরিক্ত কিছু খাবার দিত মাঝে মাঝে। সেখানকার ডাক্তার মুমূর্ষু ক্ষয়রোগীকে ব্যবস্থা দিল কঠিন ব্যায়ামের। ভাবলেও শিউরে উঠতে হয় যে, ডাক্তারের উপদেশ অনুসারে মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব পর্যন্তও কীটসকে রোজ সকালে ঘোড়ার পিঠে চড়ে পার্বত্য পথে কয়েক মাইল ছুটতে হতো।

মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু আজ ভুল চিকিৎসার বিবরণটা বড় মর্মান্তিক মনে হয়। অবশ্য সে যুগে এটাই ছিল বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা।

Publishers : V. Gollancz ; London. 15/-

তরাইয়ের মেয়ে

হিমালয়ের পাদদেশে তরাই অঞ্চলে বৃটিশ লাল ফিতার শাসন তখনো পাকাপোক্ত হয়নি। তরাই-এর সুপারিন্টেন্ডেণ্ট এণ্ডার্সন সাহেব একাই সব কাজকর্ম দেখেন। রাস্তায় চলতে চলতে মুখে মুখে অভিযোগের বিচার করেন, কারো জেল হয়, কারো হয় জরিমানা। এর জন্য পাইক-পেয়াদার কিংবা সুসজ্জিত আদালত কক্ষের প্রয়োজন নেই। তাঁর মুখের রায়ই যথেষ্ট।

এমনি একটা বিচার সভা বসেছে খোলা মাঠে; গ্রামের লোক জড় হয়েছে বিচারের ফলাফল জানতে। ছেদি অভিযোগ করেছে কালুর বিরুদ্ধে, তার স্ত্রী তিলনিকে ফুসলিয়ে নিয়ে গেছে সে। কালু বলল, সে তিলনিকে প্ররোচিত করেনি বেরিয়ে আসতে; তিলনি স্বেচ্ছায় চলে এসেছে; সুতরাং স্বামীর কাছে ফিরে যাবে কিনা তা নির্ভর করে তারই ইচ্ছার উপর। তবে, হ্যাঁ, সে তিলনির থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

ডাক পড়ল তিলনির। ভিড়ের মধ্য থেকে উঠে এল আঠারো-উনিশ বছরের একটি ছিমছাম তরুণী। কেশ চর্চায়, পরিচ্ছদে এবং অলঙ্কারে বেশ শৌখীন। নিজের স্বামীকে কেন ত্যাগ করেছে বিচারকের এই প্রশ্নের উত্তরে তিলনি ছেদিকে দেখিয়ে বললে, "হুজুর তো দেখতে পাচ্ছেন ও কেমন নোংরা কাছে যেতে ঘেন্না হয়। তাছাড়া বড় কৃপণ; দু'বছর বিয়ে হয়েছে, এর মধ্যে কিচ্ছু দেয়নি। এই যে জামা-কাপড় গয়না-গাঁটি দেখছেন এগুলো কালু দিয়েছে। এমন স্বামীর কাছে মরে গেলেও ফিরে যাবো না।"

ছেদিকে জিজ্ঞাসা করা হলো, এখন তোমার কি বলবার আছে বলো। সে বলল, "হুজুর, বউকে যদি ফিরে না পাই তাহলে অন্ততঃ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে দিন। দেড়শ টাকা ক্ষতিপূরণ চাই আমি।"

উপস্থিত জনতার মধ্যে প্রতিবাদের গুঞ্জনধ্বনি উঠল। বিয়ের সময় ছেদি তিলনির জন্য যৌতুক দিয়েছে একশ' টাকা; এখন তো সে 'পুরনো' হয়ে গেছে। যাই হোক, পঁচাত্তর টাকায় রফা হলো। কালু টাকা বের করে দিল; ছেদি সযত্নে টাকা গুণে গুণে ট্যাঁকে গুঁজলো। এমন সময় জনতার মধ্য দিয়ে পথ করে একটি স্ত্রীলোক এসে দাঁড়ালো বিচারকের সামনে।

প্রেতিনীর মতো চেহারা ; মুখে-চোখে রক্তের আভাস নেই ; পা ফোলা ; পিলের প্রকাণ্ড অস্তিত্বটা কাপড় ঠেলে ফুটে বেরিয়েছে। ব্যাকুল কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করল, "হুজুর, আমার কি হবে ?"

এণ্ডার্সন হকচকিয়ে গেলেন, "কে তুমি ?"

"আমি কালুর বৌ। কালু যখন আর একটা বৌ কিনল তখন তার আর স্থান হবে না স্বামীর ঘরে। আত্মীয়-স্বজন নেই, খেটে খাবার শক্তি নেই, সুতরাং না খেয়ে মরা ছাড়া উপায় কি ?" চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদতে লাগল কালুর বৌ। বিচারক বড় বিপদে পড়লেন ; কালুর যে বৌ থাকতে পারে একথা তাঁর খেয়াল হয়নি। এখন কি করা যায় ?

তিলনি ধীরে ধীরে উঠে এসে রোরুদ্যমানা স্ত্রীলোকটির হাত ধরে বললে, "বহিন, স্বামীর ঘর থেকে তোমাকে কে তাড়াতে পারে। কালু আমার জন্য যে নূতন ঘর করে দিয়েছে সেখানে আমরা দু'জনে থাকব ; খাবার যা পাবো তা ভাগ করে খাবো। কালু যা-কিছু আমাকে দেবে তার এক ভাগ তুমিও পাবে। আজ থেকে তোমার সেবার ভার আমি নিলাম।"

দু'টি স্ত্রীলোক হাত ধরাধরি করে চলে গেল। এণ্ডার্সনেব হঠাৎ নাক ঝাড়বার প্রয়োজন দেখা দিল। পাহাড়ের ঠাণ্ডা বাতাস নাকচোখ দিয়ে জল ঝরাচ্ছে। সভায় উপস্থিত অনেকেরই চোখ মুছবার দরকার পড়ল।

এণ্ডার্সন যাবার উদ্যোগ করছেন, এমন সময় ছেদি এসে তার আর্জি ফেরৎ চাইল। সেটা হাতে পেয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে বলল,

"কালু আব আমি তো এক গাঁয়ের লোক। আজ থেকে কালুকে দুটো পেট চালাতে হবে, তার উপর এক জনকে আবার দিতে হবে রোগীর পথ্য। ওর তো এখন অনেক টাকার দরকার। হুজুরের যদি আপত্তি না থাকে তাহলে টাকাগুলি ওকে ফিরিয়ে দিচ্ছি।"

ছেদি তার টাকার থলিটা টেনে বের করল।

এই ধরণের কাহিনী যদি পড়তে ভালো লাগে তাহলে পড়ুন Jim Corbett-এর বই My India. করবেট কুমায়ুনের বাঘ শিকার সম্বন্ধে বই লিখে নাম করেছেন। বর্তমান গ্রন্থ তাঁর খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখবে। করবেটের ভারতবর্ষ হলো নাইনিতাল থেকে মোকামাঘাট পর্যন্ত অঞ্চল। বিশেষ করে তরাই অঞ্চলের স্বল্প পরিচিত নরনারীর ছবি দেখতে পাই তাঁর লেখায়। যারা

দরিদ্র, অশিক্ষিত এবং অবহেলিত তাদের হৃদয় যে কত সম্পদশালী লেখক সেই পরিচয় দিয়েছেন আমাদের। কুনওয়ার সিং, মতি, বুদ্ধু, লালাজী এবং বিশেষ করে চমিরি আমাকে অনেকগুলি আনন্দময় মুহূর্ত উপহার দিয়েছে। লেখকের ভাষা সরল, অনাড়ম্বর এবং স্বচ্ছন্দগতি। মনে হয় না বই পড়ছি ; সন্ধ্যার পর ঘরের দাওয়ায় বসে ঠাকুর্দার মুখে গল্প শোনবার মতো একটা অলস-মধুর আবেশ লাগে।

Publishers : Oxford University press ; Calcutta. Rs. 6/12

ব্যর্থ মিলন

শ্রীমতী পার্ল বাকের নবতম উপন্যাস Come, my Beloved ভারতের পটভূমিকায় রচিত। পার্ল বাক এশিয়াবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষার প্রতি চিরদিনই সহানুভূতিশীল এবং তাঁর এই সহানুভূতি নিষ্ক্রিয় নয়। তাদের কথা বলবার জন্য তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন এবং সমিতি গঠন করে আমেরিকায় তা প্রচারের ব্যবস্থাও করেছেন। কিন্তু এশিয়ার কথা য়ুরোপ আমেরিকায় প্রচারে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে তাঁর চীনা জীবন নিয়ে লেখা অপূর্ব উপন্যাসগুলি। বর্তমান কাহিনীতে ভারতীয় নর-নারীর ছবি প্রাধান্য লাভ করেনি,—যেমন করেছে চীনা নরনারী 'গুড আর্থ' প্রভৃতি উপন্যাসে। তার কারণ লেখিকা চীনকে যেমন করে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন ভারতীয় সমাজকে জানবার সে সুযোগ তাঁর হয়নি। তিনি ভারতের সমগ্র সত্তাকে পট-ভূমিকারূপে, কোথাও বা একটি জীবন্ত চরিত্র হিসাবে, এঁকেছেন। নায়ক-নায়িকা বিদেশী। ভারত তাদের জীবনকে কিভাবে প্রভাবান্বিত করেছে তারই কাহিনী বলেছেন লেখিকা। গল্প পড়বার সময় যদিও চরিত্রগুলি মন আকৃষ্ট করে রাখে, তবু পড়া শেষ হয়ে গেলে মনে হয় নায়ক-নায়িকা কেউ নয়, এই উপন্যাসের একমাত্র চরিত্র হলো ভারতবর্ষ। আমাদের জীবনের অন্তরঙ্গ ছবি এখানে নেই, দূর থেকে লেখিকার পক্ষে সে ছবি আঁকা সম্ভবও নয়; কিন্তু লেখিকা যে কত যত্নের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস এবং সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন তা বোঝা যায়। তিন শ' পৃষ্ঠার মধ্যে দু'একটি সামান্য অসঙ্গতি ছাড়া ভারত সম্বন্ধে ভ্রান্ত উক্তি একটিও নেই।

আমেরিকার সুবিখ্যাত ধনী ম্যাকার্ড পরিবারের তিন পুরুষের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কটাই এই কাহিনীর উপজীব্য। কোটিপতি ব্যবসায়ী ডেভিড হার্ডওয়ার্থ ম্যাকার্ড স্ত্রীর অকাল মৃত্যুর পর ভ্রমণে বেরিয়েছে। সঙ্গে একমাত্র পুত্র ডেভিড; হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের টাট্‌কা গ্র্যাজুয়েট। পিতাপুত্র ঘুরতে ঘুরতে এলো বোম্বাই সহরে। উঠল গ্র্যাণ্ড হোটেলে। নিজেদের ঘরে এসে বসতে না বসতেই হোটেলের মুসলমান বেয়ারা সাবধান করে দিয়ে গেল, খবর্দার সাহেব, হিন্দুরা বড় ঠক, ওদের হাত থেকে সাবধান। সেটা ১৯০০ সাল কিংবা তারও

কয়েক বছর আগের কথা। তখনও বোম্বাই শহরে গরুর গাড়ীতে লোক যাতায়াত করে। রাস্তায় শুধু পুরুষদের দেখে ডেভিড বাবাকে বলল, মেয়েরা বোধ হয় পর্দানশীন, অথবা অন্য কোন কারণে তারা পথে বের হয় না। আমেরিকার এত বড় ধনী ভারতে এসেছে সে কথা বড়লাটের কানে গেল। তিনি ম্যাকার্ডকে চা-এর নিমন্ত্রণ করলেন। কাহিনীর স্থান পুণা অঞ্চলে, সুতরাং গল্পের প্রয়োজনে বড়লাটের আবাসস্থল বোম্বাইতে দেখানো হয়েছে। হোয়াইট হাউসের সঙ্গে ম্যাকার্ড পরিচিত ; বড়লাটের প্রাসাদ তার চেয়ে জমকালো।

ভারতের জনসাধারণের মধ্যে দারিদ্র্যের নগ্ন মুর্তি ম্যাকার্ডকে বিস্মিত করল। দারিদ্র্যের চেয়েও বড় আঘাত দিল নিষ্ক্রিয়তা। ভারত সরকার, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি—সকলেই যেন নিষ্ঠুর দারিদ্র্যকে সহজরূপে অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে নিয়েছে, সংগ্রাম ঘোষণা করেনি তার বিরুদ্ধে। আর ধর্মের নামে এখানে কুসংস্কারের রাজত্ব চলেছে। এর প্রভাবে ভারতবাসীরা উদ্যম হারিয়েছে, পশুর মতো জীবন যাপন করেও তাদের মুখে অতৃপ্তির কুটিল রেখা ফুটে ওঠে না। একদিন মাঠের পথ দিয়ে যেতে যেতে পায়ের কাছে পড়ল একটা গোখরা সাপ। ম্যাকার্ড বেতের ছড়িটা তুলে নিল, কিন্তু বাধা এল দেশীয় পথপ্রদর্শকের কাছ থেকে। সে দু'হাত যুক্ত করে প্রার্থনা করতে লাগল পথ ছেড়ে দেবার জন্য ; সাপ কারো ক্ষতি না করে ধীরে ধীরে চলে গেল। এই ঘটনা ম্যাকার্ডের মন আরো গভীরভাবে আলোড়িত করল। এদেশের ধনীরা আত্মসুখে মগ্ন, দরিদ্রের দুঃখ বোঝে না। এদের দুঃখ লাঘবের জন্য আমেরিকার কিছু করা কর্তব্য। ভারতের পক্ষে এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন এমন এক ধর্ম যা জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় ; যে ধর্ম উদ্বুদ্ধ করবে সেচব্যবস্থার উন্নতি করতে, দেশের সর্বত্র রেল লাইনের জাল ফেলতে, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করতে। ভারতকে আমেরিকা সেই ব্যবহারিক ধর্ম উপহার দেবে। আমেরিকার তরুণরা ভারতে নিয়ে আসবে সেই নতুন খৃস্টধর্মের পতাকা।

এই পরিকল্পনার বীজ নিয়ে ম্যাকার্ড ফিরে এলো নিউইয়র্কে। টাকার অভাব নেই ; পরিকল্পনা দ্রুত কার্যকরী করবার জন্য কাজ শুরু হলো। স্থাপিত হবে লীলা ম্যাকার্ড স্কুল অব থিয়লজি ; স্ত্রীর স্মৃতি রক্ষা হবে এবং অবনত দেশেরও উপকার হবে। আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা গ্র্যাজুয়েটরাই কেবল এখানে স্থান পাবে। শহরের বাইরে মনোরম পরিবেশে জায়গার সন্ধান চলছে, নতুন বাড়ী উঠবে ; ধীরে ধীরে একদিন হয়তো তা নগরে পরিণত

হবে। একদিন ডেভিড উপযুক্ত জায়গা খুঁজতে বেরিয়ে দেখা পেল ওলিভিয়ার। চমৎকার জায়গায় ওলিভিয়াদের প্রকাণ্ড বড় বাড়ি। শুধু মা ও মেয়ের এত বড় বাড়িতে দরকার নেই। ওরা বাড়ি বিক্রি করে দিতে চায়। ডেভিডের পছন্দ হলো, তার বাবারও ভালো লাগল বাড়িটা। সুতরাং লীলা ম্যাকার্ড স্কুল অব থিয়লজির জন্য কেনা হয়ে গেল। ম্যাকার্ডের উদ্দেশ্যের কথা জেনে পৈতৃক বাড়িটা হাতছাড়া করবার বেদনা থেকে অনেকটা মুক্তি পায় ওলিভিয়া। তার ঠাকুর্দাও ভারতে গিয়েছিলেন হিন্দুধর্মের তত্ত্বকথা জানতে। মনে পড়ে ছেলেবেলায় ঠাকুর্দার কাছে কত অদ্ভুত গল্প শুনেছে ভারত সম্বন্ধে। ভারতের সঙ্গে তার কি যেন একটা অদৃশ্য যোগসূত্র আছে!

ডেভিড কোটিপতির একমাত্র বংশধর, কিন্তু বিলাসিতা ও যৌবনের চাপল্য তাকে স্পর্শ করেনি। কোনো মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়নি তার। ওলিভিয়ার মধ্যে কী যাদু ছিল,—ডেভিড মুগ্ধ হলো, ভালোবাসল তাকে। ওলিভিয়া বলল,

"আমেরিকার যে কোনো মেয়ে তোমাকে ভালোবাসতে পারত, কিন্তু আমি পারি না।"

"কেন?"

"কারণ বোধ হয় তোমার মধ্যে সে শক্তির স্ফুরণ নেই যা আমি স্বামী হবার যোগ্যতা বলে মনে করি। আমি স্বামীর উপর নির্ভর করে জীবন কাটাতে চাই। তোমাকে নির্ভরযোগ্য মনে হয় না। তুমি ধনী পরিবারের ছেলে, এটুকুই তোমার একমাত্র পরিচয়।"

এতবড় বেদনা ডেভিড আর পায়নি। মার মৃত্যুতেও না। তার বেদনাক্লিষ্ট মনে সহসা ভারতের দুঃখ-দারিদ্র্যে জর্জর নরনারীর মিছিল ভেসে উঠল। নিজের বেদনার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাদের বেদনা। সঙ্কল্প স্থির হতে দেরি হলো না। মিশনারী হয়ে সে ভারতে যাবে, সেবা করবে ওদের। ম্যাকার্ড শুনে বলল, "তুমি আমার একমাত্র ছেলে, তুমি কেন যাবে সেই সাপ-বাঘ, মহামারীর দেশে? আমিই তো ব্যবস্থা করছি টাকা দিয়ে দলে দলে মিশনারী পাঠাবার।" কিন্তু ডেভিড সঙ্কল্পচ্যুত হলো না। পিতার সকল অনুরোধ অগ্রাহ্য করে জাহাজে উঠল। ধর্ম নিয়ে খেলা করতে গিয়েছিল ম্যাকার্ড। একমাত্র ছেলের উপর দিয়ে ধর্ম তার প্রতিশোধ নিল। লীলা ম্যাকার্ড স্কুলের পরিকল্পনা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। নতুন কেনা বাড়ীতে ম্যাকার্ডের আর একটি ফ্যাক্টরী স্থাপিত হলো।

ডেভিড পুণার এক খৃস্টান মিশনারী প্রতিষ্ঠানে যোগ দিল। তার সহকর্মী মিঃ ফর্ডহাম সপত্নীক মিশন বাড়ীতেই থাকে। ডেভিডও সেখানে স্থান পেল। পুণ্নায় আছে তার এক পুরানো মারাঠী বন্ধু দরিয়া। দরিয়ার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল লণ্ডনে। এই বিদেশে পুরাতন বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হলো। ডেভিড এসেই সংস্কৃত ও মারাঠী শিখতে আরম্ভ করেছে। তার ঘরের দেয়ালে উপনিষদের সেই অমর বাণী—'অসতো মা সদ্‌গময়ো, তমসো মা জ্যোতির্গময়' ইত্যাদি লেখা। মুখ তুললেই চোখে পড়ে। দেশের লোকের একজন হবার জন্য তার সাধনার অন্ত নেই। প্রচণ্ড গরমে ফর্ডহাম দম্পতি যখন শৈলাবাসে চলে যায়, তখনো ডেভিড পুণায় থাকে। ভারতীয়দের যদি এই গরম সহ্য হয় তাহলে তারও হবে। সে স্বপ্ন দেখে, স্কুল প্রতিষ্ঠা করবে, তারপর কলেজ, তারপর বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল। ডেভিড শত শত খাঁটি মানুষ তৈরী করবে, তারা ছড়িয়ে পড়বে দেশের সর্বত্র, উন্নত করবে দেশকে। শ্রীমতী ফর্ডহাম বলে, কিন্তু এতে ধর্ম কোথায়? ধর্ম না থাক, সেবা আছে। মিঃ ফর্ডহাম বিষয়ী লোক। প্রশ্ন করল, টাকা কোথায় পাবে?—মা টাকা রেখে গেছেন আমার নামে, ডেভিড বলল, টাকার জন্য ভাবনা নেই।

দরিয়ার সঙ্গে ওলিভিয়ার কথা হলো। বন্ধুর পরামর্শে চিঠি দিল ওলিভিয়াকে। লিখল, আমি এখনো তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছি। কী আশ্চর্য, এতদিন পরে ওলিভিয়া ডেভিডের আহ্বানে সাড়া দিল। নিউইয়র্ক থেকে চলে এল পুণায় এক মিশনারী সাহেবের বৌ হতে। দেখল, কত বদলে গেছে ডেভিড, এখন সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় তার উপর। কয়েকদিনের মধ্যে ওলিভিয়ার মধ্যেও পরিবর্তন দেখা দিল। নিউইয়র্কের মেয়ে,—কত ভয় ছিল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে। এখন আর ভয় করে না। কোন এক অদৃশ্য যাদুমন্ত্রে ভারত তাকে আপন করে নিয়েছে। শুধু তাকে নয়, ডেভিডকেও। তাদের গায়ের রঙ রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে উঠছে; এখানকার রোগ-শোক দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। জলবায়ুর গুণে দেহ ও জীবনযাত্রায় এসেছে শিথিলতা। নিউইয়র্কের আলো-ঝলমল নাচের আসরের কথা মনে পড়লে এখন ওলিভিয়ার হাসি পায়।

ওলিভিয়া বুঝি এদেশকে ভালোবেসে ফেলেছে। গভর্ণরের বাড়ী চায়ের নিমন্ত্রণ। জনসাধারণকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখবার জন্য মিশনারীদের সাহায্য প্রয়োজন; আবার মিশনারীদের কাজ চালাবার জন্যও সরকারের

সহায়তা দরকার। তার উপর ডেভিড বিশ্ববিখ্যাত ধনী পরিবারের ছেলে। ছোটলাট-বড়লাটের বাড়ী থেকে প্রায়ই আমন্ত্রণ আসে। চায়ের আসরে ছোটলাট সেদিন বলছিলেন, এদেশের চার-পঞ্চমাংশ লোকই নিরক্ষর ও অজ্ঞ; আজও এরা স্বাধীনতা পাবার উপযুক্ত হয়নি।

সহসা ওলিভিয়া বলে উঠল, কিন্তু লাটবাহাদুর, আমি ভেবে আশ্চর্য হই যে আপনাদের মতো সভ্য সাম্রাজ্যের অধীনে থেকেও আজ এদের এমন অবস্থা কেন?

সাম্রাজ্যভক্তদের জমায়েতে যেন প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হলো। বুদ্ধিমানরা অন্য কথা পেড়ে প্রসঙ্গটা চাপা দেবার চেষ্টা করল।

ওলিভিয়া ডেভিডের জীবনে নতুন বাঁক রচনা করেছে। প্রেম মাঝে মাঝে কর্তব্য ভুলিযে দেয়। ওলিভিয়ার স্পর্শ থেকে পালিয়ে এসে প্রার্থনা করতে বসে ঃ ওলিভিয়ার জন্য ভারতকে যেন না ভুলি, ভগবান! ভারতের সেবা ঈশ্বরের কাজ, তার প্রেমেরও উর্দ্ধে ভারতবর্ষের স্থান। ওলিভিয়া কলহ করে না। বলে, আমি ছেলে-মেয়ে ঘর-সংসার নিয়ে থাকব, তুমি থেকো তোমার ব্রত নিয়ে।

ডেভিড দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে এসে দাঁড়ায় দুর্গতদের পাশে। কিন্তু বিপুল সমস্যা, একা সে কি করবে? বড়লাট বলেন, দুর্ভিক্ষটা এদেশে ক্রণিক রোগের মতো। ডেভিড প্রশ্ন করে, চিরকালই তা থাকবে কেন? এর কি প্রতিকার নেই? প্রতিকার?—বড়লাট হাসেন। সকল সমস্যার মূলে অবিশ্বাস্য জন্মহারটা। যে হারে লোক বাড়ছে তাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সকল সম্পদ দিয়েও এদের ক্ষুধা মেটানো যায় না।

ডেভিড জানে দরিয়া একথার কি উত্তর দিত। দরিয়া বলে, লোকবৃদ্ধির যুক্তিটা গভর্ণমেণ্ট উপস্থিত করে তাদের অক্ষমতা বা অনিচ্ছা ঢাকবার জন্য। আমাদের গড়ে পরমায়ু ২৭ বছর, আমাদের শতকরা পঞ্চাশটি শিশু এক বছর পূর্ণ না হতেই মারা যায়; জন্মের হার বেশী না হলে এতদিনে আমরা পৃথিবীর মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম। নিছক টিঁকে থাকবার জন্যই আমাদের সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন।

ওলিভিয়ার কোলে একটি ফুটফুটে ছেলে এলো; নাম রাখল থিয়োডোর। ওলিভিয়া থাকে ছেলে নিয়ে, ডেভিড তার কাজে মগ্ন। হঠাৎ বোম্বাই শহরে প্লেগ আরম্ভ হলো, দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল পুণা এবং অন্যান্য পার্শ্ববর্তী

অঞ্চলে। দরিয়ার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সব হারিয়ে গেল প্লেগের নির্মম কবলে। মিশন হাউসে হানা দিয়ে প্লেগ নিয়ে গেল ওলিভিয়াকে। সমস্ত সম্পত্তি বিলিয়ে দিয়ে দরিয়া পথে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু ডেভিড বাঁধা পড়ে রইল কাজের চাকায়। তা ছাড়া সে তো দরিয়ার মতো রিক্ত হয়ে যায়নি; তার ছেলে আছে। তাকে মানুষ করে তুলতে হবে।

থিয়োডোর আমেরিকার শিক্ষা সমাপ্ত করে ভারতে ফিরে আসছে স্বেচ্ছায়। ডেভিড লিখেছিল, ইচ্ছা হয়তো আমেরিকায় থেকে যেও। বুড়ো ঠাকুর্দা ম্যাকার্ডেরও তাই আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু বাধা দিল না; বলল, দ্বিতীয়বার তো আঘাত লাগে না; তুমি যাও। পিতৃবন্ধু দরিয়া প্রায়ই চিঠি লেখে। জানিয়েছে, যে ভারতকে তুমি দেখে গেছ, সেই ঘুমন্ত ভারত আর নেই। সে জেগে উঠেছে ধীরে ধীরে, নতুন ভারতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন গান্ধী। প্রত্যেক চিঠিতেই থাকে গান্ধীর কথা। তাঁকে জানবার জন্য থিয়োডোরের কৌতূহলের শেষ নেই। আমেরিকা তার দেশ নয়, ভারতের সঙ্গে তার নাড়ীর বন্ধন। প্রথম সে চোখ মেলেছে ভারতবর্ষের আলোয়, বুকে টেনে নিয়েছে সে দেশের বাতাস। আর কী মমতা, স্নেহ, ভারতের লোকগুলির! তার বাবা বাইরে চলে যেতেন নানা কাজে, কিন্তু সে কোনোদিন মা'র অভাব বুঝতে পারেনি। থিয়োডোর কৃতজ্ঞ, সে ভারতকে ভুলতে পারে না।

জাহাজে আলাপ হলো বাঙলা দেশের গভর্ণরের মেয়ে অ্যাগনিসের সঙ্গে। পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হলো দু'জনে। অ্যাগনিস দেখল স্বামী হিসেবে থিয়োডোর লোভনীয়। নিউইয়র্কের এতবড় ধনী পরিবার; তাছাড়া ডঃ ডেভিডও ভারতবর্ষে স্বনামধন্য লোক, গভর্ণমেন্টের কাছে অত্যন্ত সমাদর। কিন্তু বিপদ হলো যখন থিয়োডোর কথায় কথায় একদিন গান্ধীর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করল। হৃদয়ের ব্যাপারেও ইংরেজ দুহিতা হিসাবের কথা ভোলে না। গান্ধীর নাম শুনে তাড়াতাড়ি মন গুটিয়ে নিল অ্যাগনিস। কিন্তু থিয়োডোরকে কিছুই বলল না।

থিয়োডোর বোম্বাই পৌঁছবার দু'দিন পূর্বে প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত আগমন উপলক্ষে দরবার হয়ে গেল। সে দরবারে ডেভিডের নিমন্ত্রণ ছিল। ডেভিড আজকাল গভর্ণমেন্টের সমর্থক। সে বড়লাটের মতো বিশ্বাস করে ভারত এখনো স্বাধীনতা লাভের যোগ্যতা অর্জন করেনি; উপযুক্ত হলেই স্বাধীনতা পাবে। ডেভিড ভারতবাসীদের যোগ্য করে তোলবার কাজই হাতে

নিয়েছে। দরিয়া চলে গেছে অন্য পথে; স্বাধীনতা লাভের জন্য সর্বস্ব পণ করেছে সে। দরবারের প্রতিবাদ করায় তার জেল হয়েছে।

থিয়োডোর এবার ফিরে এসে গান্ধীর অদৃশ্য অস্তিত্বটা বড় বেশি করে অনুভব করতে লাগল। সকলের মুখে গান্ধীর নাম। সরকার পক্ষের সাহেবরা তাঁর নিন্দা করে, ভারতীয়েরা শ্রদ্ধায় নত হয়। ডেভিডের স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বাইরে কিছু না বললেও অন্তরে তারা গান্ধীর ভক্ত। ডেভিড তাদের মন ফেরাতে পারে না।

থিয়োডোর জানতে চাইল, "বাবা, তুমি গান্ধীকে দেখেছ ?"

"দেখেছি দূর থেকে। কালো কুচ্ছিৎ বৈশিষ্ট্যহীন একটা লোক। দরিয়া কি দেখেছে তার মধ্যে সে-ই জানে।"

"আমার গান্ধীর সঙ্গে একদিন আলাপ করতে ইচ্ছা হয়।"

ডেভিড চমকে উঠলো; বলল, "আমার উপদেশ যদি শোন তাহলে গান্ধী এবং তাঁর রাজনীতি থেকে দূরে থেকো।"

ভারতের সর্বত্র শত শত লোক জেলে যাচ্ছে; পাঞ্জাবে ও'ডায়ারের গুলীতে নিরাহ নরনারী প্রাণ দিল। কারো জেলের ভয় নেই। মাটির কুটির, নেংটির এক টুকরো কাপড়; এক মুঠো চাল বা গম এবং সাতাশ বছরের পরমায়ু। সুতরাং কিসের ভয় ? জেল বরং ভালো। যে লোকটি ভয় ভাঙ্গালো তাঁর অশরীরী অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। থিয়োডোরের মনে উন্মাদনা জাগে; চুপ করে থাকতে ভালো লাগে না, কিছু একটা করা চাই। দরিয়ার সঙ্গে দেখা করতে গেল জেলে; দরিয়া বলল, 'গ্রামে যাও, সেখানে কাজ করো।' গান্ধীর কথা উঠলো। দরিয়া বলল, 'যে লোক নিঃশেষে ত্যাগ করতে পারে, তার মত যা-ই হোক, তার উপর নির্ভর করা যায়। গান্ধী সেই জাতের লোক।'

বিদায় নেবার আগে থিয়োডোর জিজ্ঞাসা করল,

"দরিয়া জ্যেঠা, কি আশা নিয়ে তুমি জেলে আছ ?"

দরিয়ার দুই চোখ দীপ্ত হয়ে উঠল; বলল, "এই আশা নিয়ে আছি যে একদিন আমরা স্বাধীন হবো, নিজের পায়ে দাঁড়াব, জমির মালিক হবো, নিজেদের শাসনতন্ত্র রচনা করব এবং পরস্পরের সহযোগিতা দ্বারা স্বচ্ছন্দে আত্মসম্মান নিয়ে জীবন যাপন করব। একদিন তা দেখে যাব। দেখব, কঙ্কালসার দেহগুলি মাংসপুষ্ট হয়েছে, ক্ষুধাক্লিষ্ট শিশুদের কান্না আর শুনব না,—কারণ তাদের মুখে খাদ্য তুলে দিতে পারব।"

থিয়োডোর চলে এলো কলকাতায়, অ্যাগনিসের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া করতে। দুজনের মিলনে বাধা হয়ে দাঁড়াল ভারতবর্ষ। অ্যাগনিস সাম্রাজ্যবাদে বিশ্বাসী, থিয়োডোর ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারে আস্থাশীল। শুধু তাই নয়, সে সক্রিয়ভাবে এর জন্য কাজ করবে। থিয়োডোর কলকাতা থেকে পুণা ফিরে এল মধ্যবর্তী গ্রামগুলি দেখে দেখে। সঙ্কল্প স্থির হয়ে গেছে তার। গ্রামে গিয়ে সেবাকেন্দ্র খুলবে। ডেভিড গভীর দুঃখ পেল; ছেলেকে ঘিরে তার কত আশা ছিল। কিন্তু থিয়োডোর অটল। মনে পড়ল সে-ও তার বাবাকে এমনি বেদনা দিয়েছে।

থিয়োডোর উত্তরপ্রদেশের ভাঙ্গি নামে ছোট্ট একটি গ্রাম বেছে নিল কর্ম-কেন্দ্ররূপে। গ্রামের লোকদের সে লেখা-পড়া শেখায়, রোগে ওষুধ দেয়। আধুনিক সভ্যতার সম্পর্কহীন এই গ্রামে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিল থিয়োডোর। ডেভিড তখনো আশা ছাড়েনি। ভাবল, অ্যাগনিসের সহায়তায় থিয়োডোরকে ফিরিয়ে আনবে। পত্রালাপ করল, দেখা করল অ্যাগনিসের সঙ্গে। আর আশ্চর্য, পুত্রের জন্য ওকালতি করতে গিয়ে পিতা প্রেমে পড়ে গেল; বিষয়-বুদ্ধিসম্পন্না অ্যাগনিস তরুণ পুত্রকে ত্যাগ করে পরিণত বয়স্ক পিতাকে পতিত্বে বরণ করল। নব-দম্পতি চলে গেল নিউইয়র্ক। তরুণী বধূর পদতলে ভারতসেবার সাধু সঙ্কল্প ডেভিড চিরদিনের জন্য জলাঞ্জলি দিল।

থিয়োডোরের পরিচর্যায় ভাঙ্গি গ্রাম ধীরে ধীরে নতুন রূপ গ্রহণ করছে। কত নেতা দেখতে আসেন তার গ্রাম। ভারত স্বাধীন হবার পর কথা হলো এর আদর্শে ভারতের অন্য গ্রামগুলি গড়ে তুলতে হবে। দরিয়া তার কাজ দেখে খুব সন্তোষ প্রকাশ করেছে। থিয়োডোর দেখেছে গ্রামের লোক গান্ধী ছাড়া অন্য কাউকে ভালোবাসতে পারেনি। আর আর নেতারা দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছে, জেল খেটেছে, কিন্তু কোথায় যেন একটা দূরত্ব থেকে যায়, যার জন্য একাত্মবোধ সম্ভব হয়না। থিয়োডোর এক হতে পেরেছে গ্রামবাসীদের সঙ্গে; এইটে তার মস্ত বড় তৃপ্তি। প্রথম যখন এলো তখন রাত্রিবেলা এ-গ্রামের উপর গাঢ় ঘুম নামত না; ভারতের কোনো গ্রামেই নামে না। অর্ধভুক্ত বয়স্করা বিছানায় নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকে মাত্র; ক্ষুধার জ্বালায় শিশুরা সারারাত ট্যাঁ ট্যাঁ করে; তার উপর আছে মশা, বিছা ও মাকড়সার উপদ্রব; ভাঙা বেড়া দিয়ে হিংস্র জন্তুর আক্রমণের ভয়। গাঢ় ঘুম আসা সম্ভব ছিল না। এখন সে অনুভব করে ভাঙ্গি গ্রামের উপর প্রগাঢ় নিদ্রা নেমে আসতে শুরু করেছে, মনটা খুশীতে ভরে ওঠে।

স্কুল, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট কত কী! থিয়োডোর তার স্ত্রীর সাহায্যও পেয়েছে এসব গড়ে তুলতে। পুণার মিশনারী ফর্ডহামের মেয়ে রুথের চিঠি পেল একদিন। লিখেছেঃ আমি ভারতবর্ষের মেয়ে; এদেশে জন্ম হয়েছে, এ-দেশকে নিজের বলে জেনেছি। তোমার ব্রতের সঙ্গিনী করে নাও আমাকে।,

থিয়োডোরের মনে পড়ল বাইবেলে সলোমনের গান:

Come, my beloved, let us go forth into the field,

Let us lodge in the villages.

রুথকে বিয়ে করে নিয়ে এল। দু'জনে মিলে গ্রাম সাজাল, নিজেদের ঘর সাজাল। এলো ছেলে-মেয়ে। তাদের বড় মেয়ে লিভিকে উষ্ণ আবহাওয়ার জন্য বয়সের চেয়ে বড় দেখায়। প্রথম মাকে, তারপর বাবাকে লিভি জানাল সে হাসপাতালের ডাক্তার যতীন দাসকে বিয়ে করতে চায়। থিয়োডোরের মুখ কালো হয়ে গেল। সে ভারতবর্ষের জন্য সব ত্যাগ করেছে, কিন্তু ভারতীয়দের সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দেওয়া কল্পনার বাইরে। লিভি আপত্তির কারণ বুঝে উঠতে পারে না। সে আমেরিকা দেখেনি; এটাই তার দেশ; এখানকার লোকেরা তার বন্ধু। যতীনের কত প্রশংসা শুনেছে এতদিন বাবার মুখে, তবে এখন কেন অসম্মতি?

স্বামী-স্ত্রী ঠিক করল প্রথম জাহাজেই তারা আমেরিকা যাবে, লিভিকে দেবে কলেজে ভর্তি করে; তারপর কোথায় হারিয়ে যাবে কোন এক নগণ্য যতীন দাস! কিন্তু লিভিকে সহজে ঠেকানো গেল না। গভীর রাত্রিতে সে চলে যায় হাসপাতালের ব্যাচেলার্স কোয়ার্টারে। যতীনকে বলে, "তুমি আমাকে যেতে দিও না, জোর করে ধরে রাখ।" কিন্তু ভারতবর্ষের মতোই যতীন কেবল আকৃষ্ট করে, জোর করে ধরে রাখতে জানেনা। কয়েকটা রাত স্বপ্নের মত কেটে গেল। আমেরিকা যাবার আগের দিন যতীন বলল, "যদি ছেলে হয় কাউকে দিয়ে দিও।" লিভি বললে, "ছেলেকে সে রাখবে, ওই ছেলেই তার ভরসা।"

ম্যাকার্ড ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, ডেভিডও ভারত ত্যাগ করেছে, এবার চলল থিয়োডোর। অথচ তারা তো ভারতের মঙ্গল ব্রত নিয়েছিল, কষ্টও সহ্য করেছে। কিন্তু নিঃশেষে ত্যাগ করতে পারেনি কেউ। ম্যাকার্ড ও ডেভিড তাদের ছেলেকে উৎসর্গ করতে পারেনি, থিয়োডোর পারেনি রক্তের আভিজাত্য-বোধ ত্যাগ করে লিভিকে দান করতে। এরা যেন উচ্চাসন থেকে ভারতকে দয়া করতে এসেছিল। তাই ভারত তাদের নিজের বলে গ্রহণ করতে পারেনি।

লিভি সমুদ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে প্রার্থনা করে, হে ভগবান, যতীনের ছেলে দাও আমার কোলে। তাহলে সে আবার ভারতে ফিরতে পারবে, ফিরবে যতীনের বউ হয়ে। কিন্তু একদিন সকালে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল তার প্রার্থনা গেছে ব্যর্থ হয়ে, যতীনের সঙ্গে তার মিলন হয়েছে বন্ধ্যা। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদতে লাগল লিভি। মা এসে বলল, বোকা মেয়ে, কাঁদিস কেন? মাকে কি বলবে লিভি?

লিভি ও যতীনের মিলন যেমন নিষ্ফল হয়ে গেল তেমনি নিষ্ফল হয়েছে ভারত ও য়ুরোপের এতদিনকার মিলন। শ্বেতকায় ও অশ্বেতকায়দের মধ্যে যোগাযোগ ঘটেছিল; ছিল বৃহৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত। কত মহৎ জিনিষ গড়ে উঠতে পারত, স্থায়ী মিলনের স্বর্ণ-সেতুর ভিত্তি রচনা করা সম্ভব ছিল। কিন্তু সব ব্যর্থ, সব নিষ্ফল হয়ে গেল। বৃটিশ সরকার দু'শ বছর ভারত শাসন করে বিদায় নিল, কিন্তু পারল না ভারতের হৃদয় স্পর্শ করতে।

মিলনের এত বড় সুযোগ হারিয়ে শুধু লিভি কাঁদছে না। সেই সঙ্গে কাঁদছে মানবাত্মা, যে মানবাত্মা য়ুরোপ-এশিয়ার ঊর্ধ্বে, গায়ের শাদা কালো রঙের উপরে।

Publishers : Methuen & Co ; London, 12/6.

আধুনিক আরবী কবিতা

ইংরেজদের সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যেমন ইংরেজী ভাষা প্রসার লাভ করেছে তেমনি কোরাণের ভাষা হিসাবে যেখানে মুসলমান ধর্ম গেছে সেখানেই গেছে আরবী। আরবী ভাষা ছিল উত্তর ও মধ্য আরবের ভাষা। মুসলমান ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষুদ্র অঞ্চলের ভাষা নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। অষ্টম শতাব্দীতে বাগদাদ শহরের আব্বাসী বংশের রাজত্বে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি হয়। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, জীবনী এবং ভারতীয় ও অন্যান্য ভাষা থেকে অনূদিত বহু মূল্যবান গ্রন্থ এ সময় প্রকাশিত হয়েছিল। ক্রমে স্পেন থেকে ভারতের পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত সুবিস্তৃত অঞ্চলে আরবী ভাষার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল। উত্তর আফ্রিকার প্রায় সর্বত্র স্থানীয় ভাষার পরিবর্তে আরবী ভাষা গ্রহণ করা হয়েছে। আরবী ভাষার সংস্পর্শে এসে ফারসী বিশেষ রূপে প্রভাবান্বিত হয়েছিল। আবার ফারসীর কাছ থেকে আমরা হিন্দী, বাংলা প্রভৃতি উত্তর ভারতীয় ভাষায় অনেক আরবী শব্দ গ্রহণ করেছি।

সকল সাহিত্যেরই প্রথম যুগটা কাব্যের। আরবী সাহিত্যেও এর ব্যতিক্রম হয়নি; কিন্তু আরবী কাব্য-সাহিত্য বিকাশের সুযোগ দীর্ঘকাল পায়নি। কোরাণ পূর্ব যুগের আরবী কবিতার নিদর্শন প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহে পাওয়া যায়। এদের রচনা হতো মুখে মুখে, লোক-সঙ্গীত হিসেবে এসব কবিতা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। আমাদের দেশের ভাটিয়ালি গানের মতোই প্রাচীন আরবী গীতি-কবিতায় সহজ প্রাণের স্পর্শ অনুভব করা যায়। কোরাণ রচিত হবার পর সাহিত্যের অন্যান্য শাখার প্রতি একটা সাময়িক অবহেলা দেখা দিল; এবং বিশেষরূপে উপেক্ষিত হলো আরবী কাব্য। কারণ মহম্মদ কাব্য রচনা ও কাব্য পাঠ পছন্দ করতেন না। অষ্টম ও নবম শতাব্দী আরবী সাহিত্যে গদ্য প্রধান্যের যুগ। তারপর দীর্ঘকাল আরবী কবিরা গতানুগতিক রীতিতে কাব্য চর্চা করেছেন। য়ুরোপের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটবার পর আরবী কাব্য সাহিত্যে যুগান্তর এলো। নেপোলিয়নের মিশর আক্রমণ, ১৮৬০ সালে লেবাননে গৃহযুদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার হাতে শাসনভার চলে যাওয়া, ১৮৮২ সালে বৃটেন কর্তৃক মিশর অধিকার

প্রভৃতি ঘটনাগুলি আরবী ভাষা-ভাষী অঞ্চলে ভাববিপ্লবের সৃষ্টি করেছিল। য়ুরোপীয় চিন্তাধারা বিকীরণ করতে খৃস্টান মিশনারীরাও কম সাহায্য করেনি। মিশরের মহম্মদ আলী (১৮০৫-'৪৮) তাঁর নাতি ইসমাইল রিফায়া আল্ তিতাভিকে উচ্চশিক্ষার জন্য প্যারিস পাঠিয়েছিলেন। তিতাভি ফিরে এসে সর্বপ্রথম আরবী কবিতায় ফরাসী রীতি প্রয়োগ করলেন। ১৮৯৪ সালে খলিল মত্‌রান দেখালেন সৃষ্টিশীল আরবী কাব্যের নতুন সম্ভাবনা। আরবী সাহিত্যের প্রাচীন ঐতিহ্যকে অস্বীকার না করে তার সঙ্গে তিনি সুন্দর মিলন ঘটিয়েছেন য়ুরোপীয় ভাবধারার।

এর পর থেকে আরবী কবিতার দ্রুত রূপ পরিবর্তন ঘটেছে। দুটো বিশ্বযুদ্ধ আরব অঞ্চলে রাজনৈতিক পরিবর্তন এনেছে; সেই সঙ্গে মনের যে পরিবর্তন হয়েছে তা সবচেয়ে বেশী করে প্রতিফলিত হয়েছে আরবী কাব্যে। এখন আরবী কবিতার স্বর্ণযুগ চলছে। কিন্তু তার পরিচয় পাবার উপায় আমাদের নেই। আমরা ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, রুশ সাহিত্যের আধুনিকতম খবর পাই; কিন্তু আরবী সাহিত্যের জগৎ আমাদের কাছে প্রায় রুদ্ধ। এদেশে আরবী ভাষায় যাঁদের জ্ঞান আছে তাঁবা প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত। আধুনিক আরবী প্রায় নতুন রূপ পেয়েছে। সুপণ্ডিত এ, জে, আরবেরি কয়েকটি আধুনিক আরবী কবিতার ইংরেজী অনুবাদ করায় আমরা একটি নতুন কাব্যধারার পবিচয় লাভের সুযোগ পেয়েছি। এজন্য অনুবাদক আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

মোট পঁয়ষট্টিটি কবিতার মূল ও ইংরেজী অনুবাদ এই সংকলন গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এই কবিতাগুলি ১৯২০ সাল থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে রচিত। এখানে হেজাজ, এডেন, ইরাক, সিরিয়া ও লেবানন, প্যালেস্টাইন, মিশর, লিবিয়া টিউনিসিয়া, মরক্কো প্রভৃতি রাষ্ট্রের কবিদের কবিতা নির্বাচিত হয়েছে। এ থেকে দেখা যায় যে আরবী ভাষা কত বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করেছে। অথচ আশ্চর্য এই যে, যে-দেশে এই ভাষার উৎপত্তি সেই আরবের কোন কবির রচনাই নির্বাচিত হয়নি। আমেরিকা প্রবাসী কবিরা যে মাতৃভাষায় অনেক কবিতা লিখেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই সংকলন থেকে। তবে মিশরই এখন আরবী সাহিত্য চর্চার প্রধান কেন্দ্র। সংকলনের প্রায় অর্ধেক কবিতাই মিশরীয় কবিদের রচিত। সংকলনটির নাম Modern Arabic poetry.

সংকলনের কবিতাগুলি পাঠ করে আধুনিক আরবী কবিতার যে বৈশিষ্ট্যটি

সর্বপ্রথম মনে পড়ে তা হলো এদের প্রাঞ্জলতা। বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য ভাবধারায় পুষ্ট হয়েও প্রত্যেকটি কবিতা সুস্পষ্ট। ইঙ্গিত-সমৃদ্ধ করবার জন্য কোনো কবি তাঁর রচনাকে কুয়াশাচ্ছন্ন করেননি। এই বৈশিষ্ট্য শুধু আধুনিক কবিদেরই নয়; এটা আরবী কাব্য সাহিত্যেরই মূলগত বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন আরবী কবিতাও ছিল এমনি প্রাঞ্জল। প্রসিদ্ধ কবি আল-রুসাফি (১৮৭৫-১৯৪৫, ইরাকবাসী) নিজের সম্বন্ধে এক জায়গায় যা বলেছেন সে থেকেই আরবী কবিতার মূল সুরটি বোঝা যায়: "কথায় ও কাজে সরলতার আমি বিশেষ মূল্য দিই; সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি কপটতা ও ভণ্ডামীকে। কোন লোককে আমি কখনো প্রতারিত করিনি, অথবা পাঠক প্রতারিত হতে পারে এমন শব্দও ব্যবহার করিনি।"

আধুনিক আরবী কবিতায় মরুভূমি, বেদুইন, খেজুরকুঞ্জ এবং উটের পরিবেশ আশা করলে ব্যর্থ হতে হবে। সংকলনের কবিতাগুলিতে আরবী ভাষাভাষী অঞ্চলের ছাপ পড়েনি বলা যেতে পারে। শুধু কয়েকটি ব্যতিক্রম আছে। এই ব্যতিক্রমের মধ্যে আল্-রুসাফির ইরাকের অতীত গৌরববন্দনা, আল-আহদের সিরিয়ার সূর্যাস্ত এবং খলিল মিত্বানের আরবের জাগরণ উল্লেখ-যোগ্য। 'সিরিয়ার সূর্যাস্ত' কবিতাটিতে স্থানীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যের একটি সুন্দর ছবি পাই; এছাড়া অন্যত্র প্রকৃতি প্রায় অনুপস্থিতি। সিরিয়ার জাতীয় সঙ্গীত, আরবের জাগরণ, ইরাকীদের প্রতি আহ্বান প্রভৃতি কবিতা স্বাদেশিকতায় উদ্দীপ্ত, কিন্তু কাব্যগুণে প্রথম শ্রেণীর নয়। অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তু সার্বজনীন অনুভূতি। আরবী কবি না হয়ে পৃথিবীর অন্য যে কোন আধুনিক সাহিত্যের কবিও এদের রচনা করতে পারতেন। বর্তমান পৃথিবীতে লোভ, ঘৃণা, মুক্তির আকাঙ্খা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে জীবনে যে জটিলতা দেখা দিয়েছে আরবী কবিরা তার প্রভাব থেকে দূরে থাকতে পারেননি। আরবেরি আধুনিক আরবী কবিতার মোটামুটি তিনটি ধারা নির্দেশ করেছেন: (১) যে সব কবিতার আবেদন বিশ্বজনীন এবং যাদের উপর বিদেশী প্রভাব পড়েছে; (২) প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী কবিতা; (৩) প্রাচীন ও নবীন ভাবাদর্শের সমন্বয় ঘটেছে এমন কবিতা। বর্তমান সংকলনের প্রায় সব কবিতাই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। অল্প কয়েকটিকে তৃতীয় শ্রেণীতে ফেলা যায়। অনুবাদক ভূমিকায় বলেছেন, যে সব কবিতা ভাষান্তরিত করলে কাব্যগুণ ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কা আছে, ভাল হওয়া সত্ত্বেও তাদের বর্তমান সংকলনে স্থান দেওয়া হয়নি। এই জন্যই

হয়ত দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতা এবং আরব অঞ্চলের উপর রচিত কবিতা এখানে পাওয়া যায় না।

প্রেম বিষয়ক কবিতার সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। ভাবে বা ভাষায় চমকপ্রদ কিছু নেই, কিন্তু প্রত্যেকটির মধ্যেই এমন সহজ মাধুর্য আছে যা মন স্পর্শ করে। দু'এক জায়গায় বেশ নতুন লাগে; কবি তাঁর প্রেয়সীর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন:

And the rose, that sought in vain
Thy rare beauty to attain,
Slays herself in jealous mood
To suffuse thy cheeks with blood.

'আর্ট ও বেদনা' এবং 'শিলামূর্তি' কবিতা দু'টিতে ইংরেজী কাব্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ-দুর্দশার কথা বড় একটা উল্লেখ করা হয়নি। শুধু যক্ষ্মারোগীদের প্রতি কবির মর্মবেদনা ফুটে উঠেছে:

What are these corpses, upon couches thrown,
These heaps of the half-living and half-dead,
Pallid, as if the sickness in their bone
With the grave's dust their faces overspread ?

এ যুগের সংশয়, অতৃপ্তি ও হতাশা যে-সব কবিতার বিষয়বস্তু, কাব্যগুণে তারা অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ। মৃত্যু এসে প্রশ্ন করছে: আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছ কেন তোমরা? তোমাদের যে জীবন তার চেয়ে মৃত্যু ভালো:

What is thou world, but a boundless sea,
Wherein thou swimmest, tempestuously
Tossed, wave upon wave sweeping,
And over, the torrent endlessly weeping ?
Be glad, friend, and rejoice the more
To reach sooner the further shore.

বর্তমান সভ্যতা মানুষের মনে যে অতৃপ্তির আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে তা চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন কবি আবদ আল কাদির আল-কৎ:

I do not know this, but I sense the smart,
The crimson whips of yearning lash me yet,
The ceaseless guessing of my tremulous heart
What future I desire, what past regret.

আকাঙ্খার বস্তু সন্ধান করবার জন্য নানা পথে কবি ঘুরেছেন ; লক্ষ্য কখনো স্পষ্ট হয় না ; আজ যাকে চরম লক্ষ্য বলে মনে হয় কাল তাকে পেয়েই আবার অতৃপ্তি জেগে ওঠে ; অন্য কোন পথ ধরে নতুন কিছু পাবার জন্য কবি যাত্রা শুরু করেন। কি পেলে তৃপ্তি হবে তা বোঝা যায় না ; যত পাওয়া যায়, চাওয়া ততই বেড়ে ওঠে ঃ

Whatever thing in all my life I missed,
Whatever truth I look for all my days,
And when it seems that I have found my quest,
Anew the furnace setteth all ablaze.

এই সংকলনের শ্রেষ্ঠ কবিতা ইলিয়াস আবু শবাকাহর 'মৃত্যু-তৃষা'। এ যেন মৃত্যু পথের যাত্রী বর্তমান পৃথিবীর গান। আরবেরির অনুবাদ সর্বত্রই জড়তাহীন হয়েছে, এখানে তাঁর অনুবাদের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যাবে। আধুনিক আরবী কবিতার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হিসেবে সম্পূর্ণ কবিতাটির বাংলা অনুবাদ উদ্ধৃত করা হলো ঃ

স্বর্গকে করি ঘৃণা,
জানিনা কো মানবতা আছে কি না।
ভাগ্যের সাথে বিদ্রোহ করি, বিধাতা তো তৃণবৎ
ভোরের বেলায় লাগবে যে ভালো কালকের বাসি মদ।

দূর ক'রে দাও প্রশান্তি উজ্জ্বল,
ভাল লাগে ছায়া-পাণ্ডুর ছলোছল ঃ
এই দুনিয়ার মাঝে
রক্তে আমার শুধু আনন্দ বাজে,
বেহেস্তে আমি ঘৃণা করি আর
মানবতা চিনি না যে।

সুরার পেয়ালা ঢেলে দিও, ঢেলে নিও
বরতনুটিকে করো আরো বরণীয় ঃ
কালকের কথা ভাবা আর শুধু
বাতাসেতে জাল বোনা,
হয়তো আমরা কোনদিন জাগব না।

পৃথিবীর পারে যদি থাকে পরলোক,
সে-রহস্য আজো জানে নি তো কোনো লোক।
কামনার শিখা জ্বেলে দিয়ে লীলান্তরে,
উঠব আমরা ধ্বংস-শিখরে

নামব দু'জনে হাতে হাত ধ'রে মৃত্যুর গহ্বরে।
জীবনের এই কামনার বিদ্যুৎ,
ধুয়ে যাবে লাল মদিরা ধারায়,
লীলা-দেহে অদ্ভুত।

অনুবাদ : দিনেশ দাস

Publishers : Taylor's Foreign press ; London. 30/-

গারট্রুড্

এদেশের পাঠকদের কাছে হেরমান হেসের নাম সুপরিচিত। আর এই পরিচয় স্থাপিত হয়েছে প্রধানতঃ ভারতীয় কাহিনী অবলম্বনে রচিত তাঁর অনবদ্য উপন্যাস 'সিদ্ধার্থের' সাহায্যে। 'সিদ্ধার্থ' এবং তাঁর অন্যান্য প্রধান উপন্যাসগুলি দার্শনিক ভিত্তির উপর রচিত। কিন্তু Gertrude এর ব্যতিক্রম। 'গারট্রুড'-এ কোন দার্শনিক মতবাদ গল্পকে ছাপিয়ে ওঠবার সুযোগ পায়নি। কয়েকটি নর-নারীর প্রেম ও বেদনার কাহিনী মর্মস্পর্শী ভাষায় এখানে বলা হয়েছে।

কুন্ স্কুলে পড়বার সময় থেকেই বেহালা বাজানো শিখ্‌ছে ওস্তাদ রেখে। স্কুলের পড়া শেষ করে সে সঙ্গীত বিদ্যালয়ে প্রবেশ করবে স্থির করেছে। সঙ্গীতকে জীবিকার্জনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করবে। কুনের বাবার ইচ্ছা নয় একমাত্র ছেলে শিল্পী-জীবনের অনিশ্চয়তার মধ্যে যাক্। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও কুনের আগ্রহ দেখে শেষ পর্যন্ত সম্মতি দিতে হলো। কুন্ বড় শহরে এসে সঙ্গীত বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। শিক্ষকের নির্দিষ্ট পাঠ অনুসরণ করে বেহালা বাজায় কুন্; সে বাজনায় ব্যাকরণ নির্ভুল, কিন্তু প্রতিভার স্পর্শ নেই।

একদিন বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী শহরের বাইরে একটা পাহাড়ে বেড়াতে গেল। লিডি এবং কুন্ সারাদিন ঘুরল কাছাকাছি। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, এবার ফিরতে হবে। পূর্ণযৌবনা লিডির চোখের কোণে কি ইঙ্গিত ঝলসে উঠল। বলল, 'চলো, আমরা পাহাড়ের এই নির্জন ধারটা দিয়ে নেমে যাই।' খাড়া পাহাড়; বরফে ঢাকা; গাছের নিচে অন্ধকার জমে উঠেছে; কুন্ একটু দ্বিধা করল, কিন্তু লিডির আগ্রহ অগ্রাহ্য করতে পারল না। নামতে গিয়ে ওরা দু'জনে পড়ে গেল। লিডির কিছু হলো না, কুনের পা ভাঙ্‌ল। অনেক দিন পরে কুন্ যখন বিছানা থেকে নামল তখন তার শুধু নিজের পায়ের উপরে দাঁড়াবার শক্তি নেই। লাঠি নিয়ে চলতে হয়। একটি পা চিরদিনের জন্য অশক্ত হয়ে পড়েছে। এই একটি ঘটনা কুনের জীবন দু'ভাগে ভাগ করে দিল। ভবিষ্যৎ জীবনের সকল আশা ও স্বপ্ন হঠাৎ চলে গেল দুস্তর সমুদ্রের পরপারে। যে মন ছড়িয়ে

দিয়েছিল সংসারের শতমুখী রসধারায়, তা বেত্রাহত কুকুরের মতো ফিরে এলো নিজের মধ্যে।

• এতদিন কুনের সঙ্গীত চর্চায় যে ফাঁকটুকু ছিল, গভীর বেদনা তা পূর্ণ করে দিল। কুন্ একটি গান রচনা করে' তাতে নিজেই সুর দিয়েছে। কিন্তু ঠিক সঙ্গীত শাস্ত্রানুযায়ী হয়নি। তাই সঙ্গীত শিক্ষক তার রচনা সাদরে গ্রহণ করতে পারলেন না ; কিন্তু এমন একটি নতুন সৃষ্টির ইঙ্গিত পাওয়া গেল যাকে কিছু নয় বলে উপেক্ষা করাও অসম্ভব। শহরের শ্রেষ্ঠ গায়ক হেনরিক কুনের রচনায় উৎসাহ প্রকাশ করল। নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে কুনের গান গেয়ে শোনাল। অদ্ভুত মানুষ এই হেনরিক। চমৎকার দেখতে ; তার মতো ভালো গান ও অঞ্চলে কেউ গাইতে পারে না। বয়সে কুনের চেয়ে বড় ; কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই কুনকে আপন করে নিল। হেনরিকের সহায়তায় সঙ্গীত জগতে কুন্ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে ; একটি অপেরা হাউসে বেহালা বাদকের কাজও সংগ্রহ করে দিয়েছে হেনরিক।

শহরের খ্যাতনামা ব্যবসায়ী ইমৃথরেব সঙ্গেও পরিচয় হলো। ইমৃথর গানবাজনার ভক্ত। মাঝে মাঝে সে শিল্পীদের বাড়িতে আমন্ত্রণ করে আনে ; গান শোনে, বাজনা উপভোগ করে। দক্ষিণা দেয় মোটা টাকা। একদিন নিমন্ত্রণ হলো কুনের। কুন্ গিয়ে দেখল ইমৃথরের মেয়ে গারট্রুড তার কথা ও সুরকে রূপ দিয়েছে কণ্ঠের মাধুর্য দিয়ে। নিভৃত মনের আনন্দ-বেদনা দিয়ে যে সুর সৃষ্টি সে করেছে, একটি অপরিচিতা তরুণী তাকে মূর্ত করে তুলেছে দেখে কুনের খুব আনন্দ হলো। সে গারট্রুডেব কাছে কৃতজ্ঞ। তাই ইমৃথর যখন সেদিনকার বাজনার জন্য পারিশ্রমিক দিতে এলো কুন্ তা গ্রহণ করতে পারল না।

এর পর থেকে কুন্ প্রায়ই যায় গারট্রুডের বাড়ি। জলসা ঘরের এক কোণে বসে কুন্ বেহালা বাজায় আর এক কোণে পিয়ানো বাজিয়ে গারট্রুড গান করে। সুরের অদৃশ্য সোনালী সুতো ওদের দু'জনকে বেঁধেছে। অন্তরাল থেকে কে যেন সেই সুতো টানছে, সুতো ছোট হচ্ছে, ওরা পরস্পরের নিকটে আসছে। সুরের জগতে নিবিড় বন্ধুত্ব ওদের। বাস্তব জীবনেও সেই বন্ধুত্ব টেনে আনতে চাইলো কুন্।

সেখানেই কুন্ ভুল করল। অথচ এমন ভুল এতদিন সে করেনি। মেয়েদের সে এড়িয়ে চলেছে ; সে জানত মেয়েদের চোখে প্রেমিকের যোগ্যতা নেই

তার। তারা সহানুভূতি দেখায়, ভালোবাসতে পারে না। কুন্ আশাও করেনি, সহজ ভাবেই তা স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য মেয়ে এই গারট্রুড। আশ্চর্য তার ক্ষমতা। কুন্ নিজেকে ভুলে গেল। আত্ম-বিস্মৃত হয়ে ভালোবাসল ওকে। শুধু তাই নয়, গারট্রুডের কাছ থেকে প্রতিদানও চাইলো। গারট্রুড প্রত্যাখ্যান করল না। বলল, এখনও সময় হয়নি, অপেক্ষা করো।

কুন্ একটা বড় কাজে হাত দিয়েছে। একটি অপেরা রচনা করবে। অনেক গান, তাদের সুর দিতে হবে। গারট্রুড গেয়ে শোনায়, কুন্ পরীক্ষা করে কোন সুরটা ভালো। প্রথম পর্যায়েব কাজ শেষ হবার পর হেনরিক এলো। হেনরিক অপেরায গান গাইবে। সুতরাং রিহার্সালটা সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। গানের মহড়া গারট্রুডদের বাড়িতে। হেনরিকের সঙ্গে গারট্রুডের আলাপ হলো। সে আলাপ প্রেমে পরিণত হতে দেরী হলো না। কুন্ নিরুপায় দর্শক হয়ে থাকা ছাডা আর কি করবে? জীবনের মধুরতম স্বপ্ন ভেঙে গেল; কিন্তু এর চেয়ে বড় দুঃখ তাকে ভাবিয়ে তুলল। হেনরিক কোন মেয়েকে সুখী করতে পারেনি। কুন্ ওর জীবনের এদিকটার ইতিহাস জানে। মেয়েরা তার প্রতি আকৃষ্ট হয, কিন্তু কিছুদিন পরেই আঘাত পেয়ে ফিরে যায়। সে আঘাত গারট্রুডও পাবে; কুন্‌কে এই আশঙ্কা ভাবিয়ে তুলেছে। হেনরিকেব বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলে গারট্রুড ভাববে এটা ওর ঈর্ষা। তাই নীরবে চলে আসা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। ওদের বিয়ে উপলক্ষে কুন্ নতুন গান লিখে সুর দিল। সে গান বিয়ের দিন গির্জায় গাওয়া হলো।

হেনরিক ও গারট্রুডের দাম্পত্য জীবন বেশিদিন সুখে কাটল না। দু'জনেই পরস্পরকে ভালোবাসে, অথচ কি একটা দুর্বোধ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য তারা এক হতে পারল না। গারট্রুড ভাঙা মন ও ভাঙা দেহ নিয়ে ফিরে এলো বাবাব বাড়ি। হেনরিক তাকে ভুল বুঝে আত্মহত্যা করল। গারট্রুডের এত বড় দুঃখের দিনে কুন্ গিয়ে তার পাশে দাঁড়াল। ক্রমে শোক ফিকে হলো, দেহ সারল, মাঝে মাঝে গানও গাইতে আরম্ভ করল গারট্রুড। কখনো কখনো কুনের মনে নিরুদ্ধ বাসনা জেগে ওঠে।

কুনেব বাবা বলতেন, যৌবনে আত্মহত্যা করা সহজ। কারণ, যৌবনে আমরা নিজেদেরই ভালোবাসি। বয়স যত বাড়ে, আত্মহত্যা তত কঠিন হয়ে

পড়ে। কেননা, তখন জীবনের শিকড় নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে, তাদের আকর্ষণ বড় গভীর। আমার মৃত্যু কার মনে দুঃখ দেবে, আমার অভাবে কে অসহায় হয়ে পড়বে, এ সব চিন্তা মরতে দেয় না। কুনেরও এই অভিজ্ঞতা আছে। গারট্রুড যখন তাকে প্রত্যাখ্যান করে হেনরিককে গ্রহণ করল তখন কুন্ আত্মহত্যা করবে স্থির করেছিল। কিন্তু বাধা দিল মার টেলিগ্রাম: বাবা মৃত্যু শয্যায়, শীঘ্র এসো। মা একা, অসহায়। তাঁকে ফেলে স্বার্থপরের মতো মরতে পারল না।

গারট্রুড ছাড়া কুনের এখন অন্য কোন বন্ধন নেই। গারট্রুড কখনো তার প্রেয়সী হবে না, সে শুধুই বান্ধবী। তবু কুন্ তাকে ভালোবাসে। গারট্রুড কুন্‌কে ভালো না বাসলেও বন্ধু ব'লে স্বীকার করে; তার নিঃসঙ্গ নিরানন্দ জীবনে কুন্‌ই একমাত্র সঙ্গী। গারট্রুডের কথা ভেবেই কুনের পক্ষে আত্ম-হত্যা করা সম্ভব হয় না। সে গারট্রুডকে বেহালা বাজিয়ে শোনায়, গান করে, গল্প বলে, তাকে সঙ্গে করে বেড়াতে বের হয়। এর মধ্যেই কুন্ তার জীবনের তৃপ্তি ও শান্তি খুঁজে পেয়েছে। নিজের জন্য নয়, যাকে ভালোবেসে প্রতিদান পায়নি শুধু তার জন্য বেঁচে থাকা, এইটুকু তার জীবনের সার্থকতা।

Publishers : Peter Owen ; London, 12/6

গগ্যাঁ

জীবনী নয় তো, জীবন্ত উপন্যাস। বিয়োগান্ত গ্রীক নাটকের মতো সমাপ্তি। সে জীবনের শুরু হলো ৭ই জুন, ১৮৪৮ সাল। শিল্পী ইউজীন হেনরি পল গগ্যাঁর জন্মদিন। গগ্যাঁর যখন জন্ম হলো তখন ফ্রান্স গৃহযুদ্ধে বিক্ষুব্ধ। গগ্যাঁর বাবা ছিলেন বামপন্থী সাংবাদিক। লুই নেপোলিয়ন পূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করবার পর তাঁর আশঙ্কা হলো হয়তো রাজনৈতিক মতবাদের জন্য তাঁকে লাঞ্ছনা পেতে হবে। সুতরাং তিনি ফ্রান্স ত্যাগ করে সপরিবারে পেরু যাত্রা করলেন। কিন্তু জাহাজেই তাঁর মৃত্যু হলো। বিধবা মেরি ছেলে-মেয়ে নিয়ে পেরুর রাজধানী লিমা শহরে এসে উঠলেন এক আত্মীয়ের আশ্রয়ে। ফ্রান্সে ফিরে গেলেন না।

পেরুতে কাটল কয়েক বছর। বৃদ্ধ কাকার মৃত্যু হবার পর সেখানে থাকা আর সম্ভব হলো না। মেরি পুত্র-কন্যা নিয়ে আবার ফিরে এলেন ফ্রান্সে শ্বশুরের ভিটায়। কিছু জমি জমা ছিল। তাই দিয়ে কষ্টে দিন কাটে। গগ্যাঁর বয়স তখন আট বছর। স্কুলে ভর্তি হয়েছে। বিধবা মায়ের সকল স্বপ্ন ছেলেকে ঘিরে। গগ্যাঁর লম্বা ছাঁদের স্পর্শকাতর অদ্ভুত আঙুলগুলির দিয়ে চেয়ে চেয়ে মা ভাবেন, বড় হয়ে ও কী করবে? স্কুলের শিক্ষক বলেছেন, ও হয় গাধা হবে, নয় তো মস্ত বড় প্রতিভাশালী ব্যক্তি হবে। প্রতিবেশীরা কেউ কেউ বলেছে, গগ্যাঁ ভাস্কর হবে। ছুরির বাঁটে কত সুন্দর সুন্দর ছবি খোদাই করেছে, দেখনি তোমরা? কি জানি, কি আছে অদৃষ্টে! মায়ের মন ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্নের জাল বোনে।

সতেরো বছর বয়সে গগ্যাঁ সে জাল ছিঁড়ে দিল নিজের হাতে। পড়াশুনা আর ভালো লাগে না, সে যাবে খালাসী হয়ে সমুদ্রগামী জাহাজে। পূর্বপুরুষের কাছ থেকে পেয়েছে স্পেনের রক্ত; ছেলেবেলা কেটেছে দক্ষিণ আমেরিকার স্প্যানিশ উপনিবেশে। স্পেনের অশান্ত, ভবঘুরে আত্মা জেগে উঠেছে তার মধ্যে। মার চোখের জল তাকে ঠেকাতে পারল না। রোগা, লম্বা, লিকলিকে চেহারার তরুণ সমুদ্রের দুরন্ত আহ্বানে একদিন জাহাজে চড়ে বসল।

ফ্রান্স ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে চলাচলকারী জাহাজে গগ্যাঁ তৃতীয়

শ্রেণীর খালাসী। বয়লারে কয়লা দেয়, কাছি টানে, ডেক ধুয়ে পরিষ্কার করে। দীর্ঘ ছ' বছর ধরে এই কাজ করল। তারপর হঠাৎ জাহাজের কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে এলো ডাঙ্গায়। এসে দেখল, তার কোথাও আশ্রয় নেই প্যারিসের রাজপথ ছাড়া। মা মারা গেছেন; বড়বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। তেইশ বছর বয়সে গগ্যাঁ সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। তবু দুর্বল নয়। সমুদ্রের লোনা হাওয়া তার ক্ষীণ-দেহকে শক্ত সমর্থ করে তুলেছে। গগ্যাঁকে দেখলেই মনে হয় যেন একটা প্রচণ্ড শক্তির উৎস হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে তার দেহের মধ্যে বন্দী হয়ে পড়েছে। সমুদ্রের জীবন তাকে উপহার দিয়েছে একটি স্বপ্ন-কোরক। একজন সহকর্মী নাবিকের কাছে গল্প শুনেছে পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের বিচিত্র কাহিনী। রৌদ্রোজ্জ্বল সেই দ্বীপগুলিতে খাবার সংগ্রহের জন্য কাজ করতে হয় না, মেয়েরা আপনি এসে ধরা দেয়, নীতির দোহাই তাদের পায়ে বেড়ি পরায়নি। গগ্যাঁর অবচেতন মন অলক্ষ্যে পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের আদিম জীবনে ফিরে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

মৃত্যুর পূর্বে মা এক ভদ্রলোককে অনুরোধ করে গিয়েছিলেন গগ্যাঁকে সাহায্য করতে। সেই ভদ্রলোকের চেষ্টায় গগ্যাঁ একটা চাকরি পেল। স্টক এক্সচেঞ্জের চাকরি। বেতন ভালো, ভবিষ্যতে উন্নতির পথ খোলা। পকেটে টাকা আছে, কিন্তু গৃহের আশ্রয় নেই। নাবিক জীবনে মেয়েদের সম্বন্ধে বিভিন্ন বন্দরে সে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। কিন্তু ভদ্রঘরের কোনো অনাত্মীয়া মেয়ের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ হয়নি। মেৎ-এর সঙ্গে হঠাৎ আলাপ হয়ে গেল। কোপেনহেগেন থেকে মেৎ কয়েকদিনের জন্য প্যারিস বেড়াতে এসেছে; তেইশ বছর বয়স হলো, তবু বিয়ের সম্ভাবনা নেই। সে যুগে এটা রীতিমতো হতাশার কথা। মেৎ-এর নারীহৃদয় সর্বপ্রথম আকৃষ্ট হয়েছিল গগ্যাঁর দেহে পৌরুষের ব্যঞ্জনা দেখে। তার আকর্ষণ গভীর হলো গগ্যাঁর মুখে সমুদ্রজীবনের অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনে। মেৎ-এর দেহও স্বাস্থ্যসমুজ্জ্বল; সুন্দর গড়ন, দৃঢ়নিবদ্ধ ওষ্ঠ, স্থির শান্ত চোখ। এ মেয়ের মন কাদার মতো কোমল নয়; ভাঙবে, তবু নোয়াবে না। গগ্যাঁর ভালো লাগল। প্রস্তাব জানাল জীবনসঙ্গিনী হবার। মেৎ সানন্দে সম্মতি দিল। দুবার তাদের বিয়ে হলো; একবার ফরাসী রীতি অনুযায়ী, একবার কনের ডানিশ সামাজিক রীতি অনুসারে। নতুন জীবনের কতো আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মেৎ স্বামীগৃহে প্রবেশ করল। এক অদৃশ্য-চারিণী প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সতীন তার জীবনে ভাগ বসাবার জন্য যে অপেক্ষা

করছে, মেৎ ঘুণাক্ষরেও তা জানল না। বিয়ের কিছুকাল পরে মেৎ দেখল গগ্যাঁ ছুটির দিনে তুলি-রঙ্ নিয়ে বসে, ছবি আঁকে। পুরুষের একটা খেয়াল থাকা ভালো, মনে মনে মেৎ ভাবে। ছুটিতে স্বামীর সঙ্গে বেড়াবার ও গল্প করবার সুযোগ সঙ্কীর্ণ হওয়ায় একটু বিরক্তি বোধ করে শুধু। শিল্পী-বন্ধু সুফ্‌নেকারের সাহচর্য লাভ করে গগ্যাঁর খেয়াল ক্রমশঃ সাধনায় পরিণত হতে লাগল। গগ্যাঁ কোনদিন শিল্পবিদ্যালয়ে অথবা শিক্ষকের কাছে শিল্পচর্চার সুযোগ পায়নি। স্বাভাবিক শিল্প-প্রেরণায় সে ছবি আঁকে। এ সব ছবির মূল্য কি কে জানে! বন্ধুদের কথায় একটা প্রদর্শনীতে ছবি পাঠালো। কর্তৃপক্ষ তার এক-খানি ছবি প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচন করায় গগ্যাঁর উৎসাহ বাড়ল। যা ছিল অবসর বিনোদনের খেলা, তা হয়ে উঠল জীবনের একমাত্র সাধনা। চাকরিটা মনে হয় বন্ধন। যতটুকু সময় পায় প্যারিসের বিভিন্ন স্টুডিওতে ঘুরে বেড়ায়। শিল্পী-বন্ধুদের স্টুডিওতে বসে মডেল ভাড়া করে ছবি আঁকে। ১৮৮১ সালের ইম্‌প্রেশানিস্ট প্রদর্শনীতে Etude de Nu নামে একটি ছবি পাঠিয়ে গগ্যাঁ শিল্পী হিসাবে স্বীকৃতি পেল। দেগা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শিল্পীরা এবং প্যারিসের বিখ্যাত শিল্প-সমালোচকরা বললেন, নগ্ন নারীমূর্তির এমন বাস্তব ছবি একমাত্র রেমব্রাঁ ছাড়া আর কেউ এ পর্যন্ত আঁকতে পারেনি। এই স্বীকৃতি গগ্যাঁকে ভাবিয়ে তুলল। যেদিকে তাকায় অসংখ্য ছবির মিছিল চোখে পড়ে। সেই ছবিগুলি যেন তাকে প্রার্থনা জানায়ঃ 'পটের উপর রঙ বুলিয়ে আমাদের ফুটিয়ে তোল; শুধু তোমার দেখায় আমাদের তৃপ্তি নেই; সকলে দেখুক আমাদের।' বন্দিনী রূপসীর আর্তনাদে মধ্যযুগের বীরের হৃদয় যেমন কেঁদে উঠত, গগ্যাঁর মন তেমনি ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ছবির কান্না সে শুনেছে। তার হাতে আছে ওদের মুক্তি।

কিন্তু ছবির পায়ে সর্বস্ব দান না করলে শিল্পীর অধিকার সে পাবে না। শিল্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বড় ঈর্ষাপরায়ণ; ছবিকে ভালবাসলে আর কাউকে ভালবাসতে পারবে না। স্ত্রী, সন্তান, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য সবকিছু ত্যাগ করতে হবে। দীর্ঘ এগারো বৎসর সচ্ছল, স্বচ্ছন্দ জীবন কেটেছে; পাঁচটি সন্তানকে সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে; ভালবাসে মেৎকে। গৃহস্থ জীবনের সঙ্গে শিল্পীর জীবনকে খাপ খাওয়ানো যাবে না। মেৎ ছবি ভালো চোখে দেখে না, বিশেষ করে নগ্ন নারীমূর্তি আঁকবার পর থেকে সে রীতিমত বিরূপ হয়ে উঠেছে। ছেলেমেয়েরা একদিন বড় হবে, তারা নিজেদের জীবনের পথ বেছে নিয়ে চলে যাবে; বৃদ্ধ

পিতার জন্য তো কেউ বসে থাকবে না। তাদের জন্য কি গগ্যাঁ নিজের জীবনকে বলি দেবে? শিল্পের দাবিকে কি প্রত্যাখ্যান করবে সে? প্রত্যাখ্যান করলে জীবনের আর কি অর্থ রইলো? না, ছবি সে ত্যাগ করতে পারবে না। ছবি তার জীবন। ত্যাগ করল অর্থ, বিলাস, স্নেহ, প্রেম, গৃহসুখের আশা। এতদিন বিপথে ঘুরেছে; বয়স হলো পঁয়ত্রিশ। এখন দেখা পেল পথের। আর তো একদিনও নষ্ট করা যায় না। সময় নেই। ১৮৮৩ সালের জানুয়ারী মাসে চাকরি ছেড়ে তুলি হাতে ঘরে ফিরল। এবার শুধু ছবি আঁকবে। সারাক্ষণ কেবল ছবির সাধনা। মেৎ ভয়ে বিস্ময়ে কপালে করাঘাত করল।

মম্-এর উপন্যাস (The Moon and Six pence) থেকে এই ধারণা প্রচলিত হয়েছে যে, গগ্যাঁ পরিবারের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করে চলে গিয়েছিল। তা কিন্তু সত্য নয়; গগ্যাঁ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্ত্রী-পুত্রের কথা স্মরণ করেছে। শিল্পচর্চার পথে বাধা দিল পরিবারের দাবী অগ্রাহ্য করে শিল্পের পথে এগিয়ে যাবে, এই ছিল তার সংকল্প। তার শিল্প-প্রেরণাকে সহানুভূতির চোখে দেখে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে মেৎও এগিয়ে আসুক, এই ছিল তার গোপন আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু মেৎ সাধারণ মেয়ে; একটু জেদী এবং আত্মপরায়ণ। যে মসৃণ জীবনকে এতদিন জেনেছে তাকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করবার নির্বুদ্ধিতা সে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারবে না।

বছরখানেক মোটামুটি একভাবে কেটে গেল, জমানো টাকা ভেঙ্গে। গগ্যাঁ সারা দিন ছবি নিয়ে মত্ত। কোনোদিন ছবি আঁকার মূলনীতিগুলি শেখেনি; এখন শিখতে হচ্ছে প্রথম থেকে। অদম্য তার আশা; ছবি বিক্রি করে সংসার চালাতে পারবে, এমন দিনের দেরি নেই। কিন্তু বৃথা আশা; পুঁজি নিঃশেষ হয়ে গেল। ছেলেমেয়ে নিয়ে নিশ্চিত অনাহারের সামনে এসে দাঁড়াল। খেয়ালের বশে এমন ভালো চাকরি ছেড়ে দেওয়ায় বন্ধুবান্ধবেরর সহানুভূতি নেই; আর্থিক সাহায্য পাওয়া কঠিন। নিরুপায় হয়ে সপরিবারে গগ্যাঁ কোপেনহেগেন-এ শ্বশুর বাড়ির আশ্রয়ে এসে উঠল। মেৎএর তিরস্কার, শ্বশুর বাড়ির লোকদের বিদ্রূপ ও ঘৃণা কিছুদিনের মধ্যেই অসহ্য হয়ে উঠল গগ্যাঁর কাছে। ছ'বছরের প্রিয় পুত্র ক্লভিসকে সঙ্গে করে সে প্যারিসে ফিরে এলো। এবার তাকে নগ্ন নিষ্ঠুর ক্ষুধার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে হলো। অনাহারে, অচিকিৎসায় ছেলে মৃত্যু-শয্যায়; তার নিজের স্বাস্থ্য ভালো বলেই অনাহার সহ্য করেও চলতে পারে।

নিরুপায় হয়ে বোনের কাছ থেকে ভিক্ষে করে কিছু টাকা এনে ছেলেকে একটা সস্তা বোর্ডিং হাউসে রেখে এলো।

আশ্রয় নেই, খাদ্য নেই, পরিধানের পুরানো পোষাকটা ছাড়া দ্বিতীয় পোষাক নেই। মেৎ সব জানে; তবু ধিক্কার দিয়ে চিঠি লেখে টাকা দাবি করে। গগ্যাঁ আশ্বাস দেয়, সংসার চালাবার মতো উপার্জন হলেই সবাইকে নিয়ে আসবে। কিন্তু উপার্জনের আশা কই? ইম্প্রেশানিস্ট ও সিমবলিস্ট বন্ধুরা তার শিল্প-কীর্তিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তবু ছবি বিক্রি হয় না। গগ্যাঁর মৃত্যুর পরে যে-সব ছবি হাজার হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে, তাদের দিকে ক্রেতারা ফিরেও তাকায়নি বাঁচবার তাগিদে গগ্যাঁ দৈনিক চার ফ্রাঁ পারিশ্রমিকে প্যারিসের পথে পথে বিজ্ঞাপনের ছবিওয়ালা বড় বড় কাগজ আঠা দিয়ে এঁটে দেয়। এত করেও ফ্রান্সে শুধু নিজের গ্রাসাচ্ছদনের ব্যবস্থা করতে পারল না গগ্যাঁ।

পানামার কাছে টোব্যাগো নামে জনমানবহীন ছোট্ট একটা দ্বীপ আছে। সেখানে বাঁচবার জন্য কাজ করবার দরকার নেই। প্রকৃতির অজস্র দান। সারা দিন নিশ্চিন্ত মনে ছবি আঁকবে। সভ্যতার কলুষ স্পর্শ রহিত আদিম জীবনের মধ্যে ফিরে যাবার এতদিনের স্বপ্ন সফল হবে।

ফ্রান্স থেকে বিদায় নিল গগ্যাঁ। কিন্তু পেল না তার স্বপ্নের দ্বীপকে। ইতিমধ্যে পানামা খাল কাটা হয়েছে। খাল কাটার শ্রমিকরা সেই দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করেছে। দু'মুষ্টি অন্নের জন্য এখানেও উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়। নিরুপায় হয়ে গগ্যাঁ মার্টিনিক দ্বীপে নামমাত্র পারিশ্রমিকে মাটি কাটার কাজ আরম্ভ করল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অমানুষিক পরিশ্রম। রাত্রিতে মশার জ্বালায় ঘুমানো অসম্ভব। ম্যালেরিয়ার মড়ক লেগে আছে বারো মাস। শত শত লোক মরছে। এখানে গগ্যাঁর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল। কিন্তু দেশে ফিরে যাবার মতো পয়সা নেই। জাহাজে নাবিকের চাকরি নিয়ে শেষ পর্যন্ত প্যারিস এসে পৌঁছল।

আবার ক্ষুধার সঙ্গে রক্তাক্ত সংগ্রাম। সে সংগ্রামে মেৎ-এর কাছ থেকে একটু প্রেমসিক্ত সহানুভূতি পেলে সকল কষ্ট সহ্য করা হয়তো সহজ হতো। মার্টিনিক থেকে ফিরে লিখল: 'পাঁচ বছর ছেলেমেয়েদের দেখি নি। কোপেনহেগেন গিয়ে ওদের একবার দেখে আসতে বড় ইচ্ছা করছে।' মেৎ লিখল, 'আগে টাকা উপার্জন করো, তারপর ওদের দেখবে।'

গগ্যাঁর সবচেয়ে বড় সমঝদার ছিল প্রসিদ্ধ শিল্পী ভ্যান গগ্। গগ্যাঁর দুরবস্থা

দেখে ভ্যান গগ্ আমন্ত্রণ জানাল তার সঙ্গে থাকবার জন্য। বেশি দিন থাকা হলো না; ভ্যান গগের মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ায় একদিন উন্মুক্ত ছোরা নিয়ে তাকে আক্রমণ করতে এলো। গগ্যাঁ চলে এলো গগের আশ্রয় ত্যাগ করে।

মেৎ-এর নির্মম ব্যবহার, শিল্পীর প্রতি ফরাসীদের নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য এবং তার নিজের শোচনীয় আর্থিক দুরবস্থা গগ্যাঁকে সভ্যতার উপর বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছে। সভ্যতাবর্জিত আদিম সমাজে বাস করবার আকাঙ্ক্ষাটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তাছাড়া ফ্রান্স থেকে না পালালে অনাহারে শুকিয়ে মরতে হবে। সৌভাগ্যক্রমে কয়েকখানি ছবি বিক্রি হলো। সেই টাকা নিয়ে গগ্যাঁ তাহিটির জাহাজে উঠে বসল। যেদিন তার বিয়াল্লিশ বছর পূর্ণ হলো সেদিন গগ্যাঁ তাহিটিতে পা দিল। স্থানীয় সরল অধিবাসীরা তাকে নিজেদের মধ্যে সাদরে গ্রহণ করল। গগ্যাঁকে খাদ্য এনে দেয়; কোনো বিধিনিষেধ নেই, প্রতি রাত্রিতে এক-এক জন মেয়ে তার সঙ্গে রাত কাটিয়ে যায়। এইটে তাহিটি সমাজের স্বাভাবিক আতিথেয়তা। তেহুরা নামে একটি তরুণীকে সে গৃহিণী করে ঘরে আনল। বিয়ের বন্ধন নেই। যতদিন ইচ্ছা থাকবে। গগ্যাঁ ছবি এঁকে চলেছে; ছবি শেষ হলে মেৎকে পাঠিয়ে দেয়; বিক্রি করে তার কাছে টাকা জমিয়ে রাখবে। তারপর হিসাব করা হবে। ফ্রান্সের শিল্প-রসিক মহলে তার নাম পরিচিত, কাগজে তার সম্বন্ধে আলোচনা বের হয়। তাহিটিতে বছর দুই ধরে অনেক ছবি এঁকেছে। এবার গগ্যাঁর আশা হলো প্যারিসে ফিরে গেলে ছবি থেকে একটা স্থায়ী আয় হবে।

আবার প্যারিস। মেৎ অনেক টাকার ছবি বিক্রি করেছে। প্যারিসে থাকবার ব্যয় নির্বাহের জন্য তা থেকে কিছু টাকা চেয়ে পাঠালো। মেৎ টাকা দিতে অস্বীকার করল। পরিবার প্রতিপালনের জন্য তারই আরো টাকা দেওয়া দরকার। গগ্যাঁ ভেবেছিল তাহিটিতে আঁকা নতুন আঙ্গিকের ছবিগুলির প্রদর্শনী করবে। অধিকাংশ ছবিই মেৎ-এর কাছে। প্রদর্শনীর জন্য ছবিগুলি তার হাতে দিতেও সে অনিচ্ছুক। মেৎ এবার ছবি চিনেছে।

নতুন করে জীবন আরম্ভ করবার পূর্বেই দুর্ভাগ্যক্রমে গগ্যাঁর পা ভেঙে গেল। উত্থানশক্তি রহিত হয়ে দীর্ঘকাল অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট ভোগ করে গগ্যাঁ তাহিটি ফিরে যাবার সঙ্কল্প করল। শেষ বার প্যারিসে তার ছবির প্রদর্শনী করা হলো। শিল্প-রসিকরা প্রশংসা করলে কি হবে, ছবি বিক্রি হলো না। কবি মালার্মে গগ্যাঁর ছবির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মন্তব্য করলেন:

"It is extraordinary that anyone can put so much mystery into so much brightness."

মেৎকে তাহিটি যাবার জন্য বলতে গিয়েছিল শেষ বারের জন্য। মেৎ অস্বীকার করেছে। মেৎ-এর কাছে যে-সব অবিক্রিত ছবি ছিল, সেগুলো গগ্যাঁকে দেখতে পর্যন্ত দেয়নি। এবার সে তাহিটি এসে পৌছল রুগ্ন, অশক্ত দেহ নিয়ে। মারাত্মক সিফিলিস রোগ নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে। তেহুরা অন্য একজনকে নিয়ে ঘর করছে। গগ্যাঁ এবার ঘরে আনল পাহুরাকে। কিন্তু ভাঙা পায়ের যন্ত্রণা, সিফিলিসের ঘা, চোখের ক্ষীণ দৃষ্টি তার জীবন দুর্বিষহ করে তুলল। তার উপর অর্থাভাব তো আছেই। সংবাদ এলো, তার বড় আদরের মেয়ে অ্যালাইন মারা গেছে। মেৎ অভিযোগ করেছে পিতা তার কর্তব্য পালন না করায় অবহেলায় অচিকিৎসায় অ্যালাইনের মৃত্যু হয়েছে। গগ্যাঁ জীবনের ভার আর বইতে না পেরে ১৮৯৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আর্সেনিক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করল। কিন্তু মৃত্যু হলো না; শুধু শরীরটা আরো ভেঙ্গে পড়ল।

এত কষ্টের মধ্যেও ছবি আঁকার বিরাম নেই। তার জীবনের বেদনা ছবির উপর ছায়া ফেলে না। ছবিতে শুধু তাহিটির রৌদ্রোজ্জ্বল দৃশ্যের অপূর্ব বর্ণসুষমা।

তাহিটি থেকে গগ্যাঁ হিভা-ওয়া নামে একটি ছোট দ্বীপে এলো। এখানে বসবাসের জন্য নতুন বাড়ি করল। ছবি দিয়ে ঘর সাজাল, বাঁশের ও কাঠের খুঁটিতে নিপুণভাবে খোদাই করল নানা মূর্তি। শরীর আরো দুর্বল হয়ে পড়েছে। বেশি দুর হাঁটতে পারে না। কিন্তু মনের শক্তি তখনো যথেষ্ট ছিল। স্থানীয় সরল অধিবাসীদের উপর পাদ্রিরা এবং ফরাসী রাজকর্মচারীরা যে অত্যাচার করে গগ্যাঁ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে কাগজে প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করল। ফলে মানহানির দায়ে পড়তে হলো গগ্যাঁকে। বিচারে হাজার ফ্রাঁ জরিমানা এবং তিন মাসের জেল হলো। এই দণ্ড দেবার সুযোগ সরকার পেল না। গগ্যাঁর অবস্থা ধীরে ধীরে খারাপ হতে লাগল। চোখে প্রায় দেখতে পায় না; সর্বাঙ্গে ঘা; ভাঙ্গা পা-টা ফুলে উঠেছে; অসহ্য যন্ত্রণায় আচ্ছন্নের মতো সর্বদা পড়ে থাকে। সেই অপরিচিত দেশে কেউ দেখবার নেই, একটা সান্ত্বনার কথা বলবার লোক নেই। ১৯০৩ সালের মে মাসে হঠাৎ একদিন সকলের অজ্ঞাতে তার হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল। ঘরের এক কোণে অসমাপ্ত ছবি 'ব্রিটানির তুষার' দেখে মনে হয় সেই রৌদ্রের দেশে থেকেও মৃত্যুর পূর্বে গগ্যাঁর স্বদেশের তুষারের কথা বড় বেশি করে মনে পড়েছিল।

গগ্যাঁ মরে তিন মাসের জেল থেকে মুক্তি পেল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ জরিমানার টাকা আদায়ের চেষ্টা ছাড়ল না। গগ্যাঁর যত ছবি ও ভাস্কর্য ছিল জলের দামে নিলামে তাদের বিক্রি করে দেওয়া হলো। ফ্রান্সে যখন এই শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ পৌঁছল তখন গগ্যাঁকে ঘিরে একটি রোমান্টিক কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। য়ুরোপের সর্বত্র তার জীবন ও ছবি সম্বন্ধে অভূতপূর্ব আগ্রহের সৃষ্টি হলো। গগ্যাঁর ছবির দাম হু হু করে বাড়তে লাগল। যাদের কাছে তার ছবি ছিল সবাই লাভবান হলো। বলা বাহুল্য, সবচেয়ে বেশি লাভবান হলো মেৎ। গগ্যাঁ কিন্তু এ সব কিছুই জেনে যেতে পারল না। অনাহারক্লিষ্ট, তাহিটির হাসপাতালে ভিক্ষুক চিহ্নিত গগ্যাঁর দেহ হাজার হাজার মাইল দূরে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকের এক ক্ষুদ্র দ্বীপের মাটির সঙ্গে অনাদরে মিশে গেল।

ইংরেজী ভাষায় গগ্যাঁর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী অনেক দিন থেকেই পাওয়া যাচ্ছিল না। যে দু' একটি জীবনী লেখা হয়েছিল তা আর ছাপা নেই। Lawrence & Elisabeth Hanson তাঁর নতুন জীবনী লিখেছেন: The Noble Savage, a life of Paul Gauguin. বইটি বহু তথ্যে পরিপূর্ণ এবং গগ্যাঁর কতকগুলি ছবির প্রতিলিপিতে সমৃদ্ধ। বর্তমানে গগ্যাঁর এইটি একমাত্র সুলিখিত ও সুখপাঠ্য জীবনী।

Publishers : Chatto & Windus , London, 21/-

জেলে ও সমুদ্র

হেমিংওয়ে নোবেল পুরস্কার পেলেন এটা আমাদের দেশে অনেকেই সহজভাবে নিতে পারেননি। তিনি সত্যি সাহিত্যের এতবড় পুরস্কারটা লাভ করবেন সেকথা কারো কারো ধারণার বাইরে ছিল। ব্যাপারটা যেন আকস্মিক,—এমনি একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় সম্প্রতি প্রকাশিত প্রবন্ধ ও মন্তব্য থেকে। আসলে তা কিন্তু সত্য নয়। সিনক্লেয়ার লুইসা আমেরিকা থেকে প্রথম সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান ১৯৩০ সালে। তিনি ষ্টকহোমে পুরস্কার আনতে গিয়ে হেমিংওয়ের সাহিত্য-প্রতিভা সম্বন্ধে সুইডিশ অ্যাকাডেমির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তখন হেমিংওয়ের 'দি সান অলসো রাইজেস্' ও 'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস্'—এই দুটি উল্লেখযোগ্য বই মাত্র প্রকাশিত হয়েছে। সিনক্লেয়ারের সুপারিশের ফলে হেমিংওয়ে সুইডেনে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেন। ক্রমশঃ এই জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে। এবার নোবেল পুরস্কার ঘোষণার দিন সুইডেনের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সুইডিশ অ্যাকাডেমির আফিসে ঘন ঘন টেলিফোন আসতে লাগল, "পুরস্কারটা হেমিংওয়ে পেয়েছে তো?"

গত বছরও (১৯৫৩) পুরস্কার দেবার সময় চার্চিলের সঙ্গে হেমিংওয়ের নাম বিবেচনা করা হয়েছিল। চার্চিলের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল তাঁর বয়স। পরবর্তী বৎসর তাঁকে সম্মানিত করবার সুযোগ পাওয়া না-ও যেতে পারে। সুতরাং হেমিংওয়ের প্রশ্ন চাপা পড়ল। এবার হেমিংওয়ের সাহিত্য-প্রতিভার বিচার করা হয়েছে আইসল্যাণ্ডের ল্যাক্সনেস, ফ্রান্সের পল ক্লদেল ও অ্যালবার্ট কামু এবং এজরা পাউণ্ড প্রভৃতির সঙ্গে।

নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত সাহিত্যিকদের মধ্যে বার্ণার্ড শ' ও চার্চিল ছাড়া হেমিংওয়ের মতো অন্য কোনো লেখকের ব্যক্তিগত জীবনই জনসাধারণের নিকট আগ্রহের বস্তু নয়। হেমিংওয়ের ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি নিয়ে পাঠকদের মধ্যে ঔৎসুক্যের অন্ত নেই। তাঁর উপন্যাস ও গল্পের বিচিত্র নায়কদের মধ্যে পাঠকরা লেখককেই দেখতে পায়। এরূপ অনুমানের অবশ্যই ভিত্তি আছে। হেমিংওয়ে অ্যাড্‌ভেঞ্চার ভালোবাসেন, বিপদের সামনে মুখোমুখি দাঁড়াতে তাঁর ভয় নেই। এই দুঃসাহসিকতা হেমিংওয়ের চরিত্রগুলিকেও স্পর্শ করেছে।

হেমিংওয়ের জীবনের সবচেয়ে বড় অ্যাড্‌ভেঞ্চার ঘটেছে এ বছর জানুয়ারী মাসে। আফ্রিকার জঙ্গলে দু'বার বিমান ভেঙে হেমিংওয়ে ও তাঁর স্ত্রী আহত হয়েছেন। প্রথম বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মেরুদণ্ডের হাড় দু' জায়গায় ভেঙে যায় এবং কিডনির আঘাত হয় সাংঘাতিক। দ্বিতীয়বার যে বিমানে করে দেশে ফিরেছিলেন সেটাও ভেঙে পড়ল, ইঞ্জিনে জ্বলে উঠল আগুন। তাড়াতাড়ি বিমানের দরজা খুলতে গিয়ে আঘাতে হাত অবশ হয়ে পড়ল; তখন মাথার গুঁতো দিয়ে বিমানের দরজা খুলতে হলো। সেই গুঁতোর চোটে মাথার হাড় গেল ভেঙে। বাইরে এসে দেখা গেল বিমানের ইঞ্জিনে আগুন লেগে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আগুনের বৃত্ত থেকে বাইরে আসতে গিয়ে হেমিংওয়ের সমস্ত চুল পুড়ে গেল। তাঁর স্ত্রীর কয়েকটি পাঁজরার হাড়ও দুর্ঘটনায় ভেঙেছে। হেমিংওয়ে অনেক দুঃখ সহ্য করে শরীরের এই অবস্থা নিয়ে যখন ইতালীর হাসপাতালে এসে পৌঁছলেন তখন ডাক্তারেরা বিস্মিত হয়ে গেলেন হেমিংওয়ের জীবনীশক্তির পরিচয় পেয়ে। এতবড় আঘাত পেয়ে অন্য যে কোন লোক পথেই মারা যেত। হেমিংওয়ে এখনো সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি। তবু আফ্রিকার অরণ্যের আহ্বান তাঁর কাছে একটুও শিথিল হয়নি। এক লক্ষ একাত্তর হাজার টাকার নোবেল পুরস্কার পেয়ে আর একবার আফ্রিকা যাবার কথা স্থির করে ফেলেছেন। আফ্রিকার অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা তাঁর কতকগুলি গল্প অল্পদিনের মধ্যেই বেরুবে।

হেমিংওয়ের এক বন্ধু তাঁর বৈশিষ্ট্যকে কয়েক লাইন পদ্যে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন:

Veteran out of the wars before he was twenty ;
Famous at twenty-five ; thirty a master—
Whittled a style for his time from a walnut stick
In a carpenter's loft in a street of the April city.

—নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্

'এপ্রিল সিটি' হলো প্যারিস। প্যারিসে এক ছুতারের কারখানার উপরতলায় সস্তায় ঘর ভাড়া করে হেমিংওয়ে থাকতেন। সেখানে থাকতেই তাঁর সাহিত্য সাধনা শুরু হয়। প্রথম প্রথম সম্পাদকরা তাঁর গল্প প্রকাশের অযোগ্য বলে ফিরিয়ে দিতেন। হেমিংওয়ে হতাশ না হয়ে অধ্যবসায়ের দ্বারা এমন স্টাইল আয়ত্ত করলেন যে বছর চারেক পরে 'দি সান অলসো রাইজেস' প্রকাশিত হবার

সঙ্গে সঙ্গেই ইউরোপ ও আমেরিকায় তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। হেমিংওয়ের ভাষা আশ্চর্য রকম স্বচ্ছ, সরল ও বেগবান। ভাষা সম্বন্ধে তিনি বলেন : Prose is architecture, not interior decoration, and the Baroque is past. সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্র-কলায় অলঙ্করণের যে আতিশয্য ছিল তাকেই বলা হতো 'বারোক' রীতি। সংবাদপত্রের যুগে ভাষার অলঙ্করণ অচল হয়ে পড়েছে। নোবেল পুরস্কার কমিটি হেমিংওয়ের ভাষা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন :

His vigorous art and the influence of his style on the literary art of our times as manifested recently in his book "The Old Man and the Sea..."

'দি ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দি সী'তে শুধু যে হেমিংওয়ের রচনা রীতির সর্বাপেক্ষা সুন্দর বিকাশ দেখা যাবে তাই নয়, কাহিনীর নতুনত্বে এবং দৃষ্টিভঙ্গীর সজীবতায়নটি নতুন সৃষ্টি। গত বছর ঐ বইটির জন্য হেমিংওয়ে পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছেন।

'দি ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দি সী'র দৈর্ঘ্য বড় গল্পের চেয়ে একটু বড়, কিন্তু উপন্যাসের চেয়ে ছোট। কাহিনীর মধ্যেও চরিত্রের ও আখ্যায়িকার ভিড় নেই। এক বৃদ্ধ জেলে, সমুদ্র, বিরাট আকৃতির এক মার্লিন মাছ এবং একটি বালক এই কাহিনীর চরিত্র। হাভানা উপসাগরে বৃদ্ধ জেলে সান্টিয়াগো চুরাশি দিন যাবৎ মাছ ধরার চেষ্টা করছে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য বড় মাছ একটিও ধরতে পারেনি। প্রথম চল্লিশ দিন ম্যানোলিন যেত তার ডিঙ্গিতে মাছ ধরবার সঙ্গী হয়ে। কিন্তু চল্লিশ দিনেও যখন কোনো বড় মাছ ধরা পড়ল না তখন ম্যানোলিনের বাবা হতাশ হয়ে ছেলেকে নিয়ে দিল অন্য জেলের সঙ্গে। ম্যানোলিন স্যান্টিয়াগোর নৌকা থেকে চলে গেলেও তাকে ভুলতে পারল না। ঐ অঞ্চলে সান্টিয়াগো এককালে ছিল নামকরা জেলে। তার কুঞ্চিত মুখের রেখায় রেখায়, কাঁধে ও হাতে দড়ি এবং দাঁড় টানবার দাগে-দাগে অনেক অভিজ্ঞতা ও বীরত্বের কাহিনী আছে আত্মগোপন করে। ম্যানোলিন এই বৃদ্ধকে বীরের মতো পূজা করে, ভালোবাসে। এখন অন্য জেলের কাছে গিয়ে সে কিছু কিছু উপার্জন করছে। এই স্বোপার্জিত অর্থ দিয়ে বৃদ্ধ জেলেকে সে সাহায্য করতে উৎসুক। স্যান্টিয়াগো রোজ বিকেলে যখন হতাশ মনে অবসন্ন দেহে ফিরে আসে তখন ম্যানোলিন যায় এগিয়ে; সে ডিঙ্গির পাল গুটিয়ে কাঁধে করে, বড় মাছ মারবার বৃহৎ ট্যাঁটা

হাতে করে বৃদ্ধকে পৌঁছে দেয় তার কুটীরে। নারকেল গাছের খোল দিয়ে তৈরী কুটীর। এক কোণে একটা তক্তপোশ, জরাগ্রস্ত টেবিল ও চেয়ার,—এমনি সামান্য দু'চারটে আসবাবপত্র। জীর্ণ দেয়ালে টাঙানো আছে তার পরলোকগত স্ত্রীর একটি বিবর্ণ ফটোগ্রাফ। ম্যানোলিন হোটেল থেকে খাবার এনে দেয়, সান্টিয়াগো সামান্য একটু আপত্তি জানিয়ে তা খায়। খেতে খেতে গল্প করে বেসবল লীগ খেলার প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে। নিঃসঙ্গ কুটীরে শুয়ে শুয়ে রাত্রিতে সে স্বপ্ন দেখে যৌবনকালের,—যখন জাহাজে কাজ নিয়ে গিয়েছিল আফ্রিকার উপকূলে। জাহাজ থেকে দেখতে পেত সমুদ্রের তীরে সিংহেরা এসে দলে দলে খেলা করছে।

অন্য দিনের মতো আজও অন্ধকার থাকতে সান্টিয়াগো তার ডিঙ্গিতে উঠে বসল। নিজের নৌকায় যাবার আগে ম্যানোলিন তার জিনিসপত্র তুলে দিয়ে গেছে। পাল খাটিয়ে ডিঙ্গি ক্রমশঃ তীর থেকে দূরে চলল। তীরের গাছপালা প্রথম একটা নীল রেখায় পরিণত হলো, তারপর সে রেখাও গেল মিলিয়ে। উপুড় করা বাটির মতো মাথার উপরে নীল আকাশ। নিচে চঞ্চল সমুদ্র; পূর্বদিকে সমুদ্রের বুক চিরে আগুনের থালার মতো সূর্য উঠছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেন ঐ বুড়ো জেলে ছাড়া আর কেউ নেই। চারিদিকের সীমাহীন জলরাশির মধ্যে নৃত্যপরায়ণ ডিঙ্গিটা ব্যতিক্রম। মাঝে মাঝে দু'একটা সামুদ্রিক পাখী ডিঙ্গির উপর উড়ে আসে ডাঙ্গার বার্তা নিয়ে। সান্টিয়াগোর বড় ভালো লাগে ওদের দেখে, মনে হয় ওরা যেন আত্মীয়।

সার্ডিন মাছের টোপ গেঁথে কয়েকটা বড় বড় বঁড়শী সান্টিয়াগো সমুদ্রের জলে ফেলে দিল। স্রোতের টানে ভেসে চলল তার ডিঙ্গি। বঁড়শীর মোটা শক্ত সুতাগুলি হাতের মুঠায় ধরে অপেক্ষা করতে লাগল। অভিজ্ঞ কবিরাজের নাড়ী টেপার মতো সুতার কম্পনের অর্থ বুঝতে চেষ্টা করে সান্টিয়াগো। শত শত ফুট জলের নিচে কোন্ টোপটা কে ঠোকর দিয়ে গেল একটু, কে একটু টেনে পরীক্ষা করছে ; সুতার ওপারে তিমি না হাঙ্গর, না অন্য কোনো মাছ—তা সে অনুভব করতে চায়। সেই বুঝে সুতা টানবে বা ছাড়বে। কী ব্যগ্র প্রতীক্ষা ! হে ভগবান, অনেকদিন ব্যর্থতার গ্লানি সয়েছি, আজ যেন সফল হতে পারি ! সুস্বাদু সার্ডিন মাছ টোপ দিয়েছি, তোমরা এসে খাও। একা একা কথা বলে বৃদ্ধ জেলে ; জেলের এই সুন্দর স্বগতোক্তিগুলি গল্প এগিয়ে নিয়ে যায়।

হঠাৎ প্রচণ্ড টান পড়ল একটা সুতায়। দুরুদুরু বুকে সান্টিয়াগো সুতা

ছাড়তে লাগল। শেষ নেই, টেনেই চলেছে। নিশ্চয়ই খুব বড় মাছ। দু'দিন দু'রাত ধরে চলল মাছের সঙ্গে লড়াই। প্রাণান্তকর সংগ্রাম। সুতা টেনে ধরে থাকতে থাকতে হাতে খিল ধরে যায়, মনে হয় বুঝি হেরে গেল। কিন্তু সামলে নেয় অনেক কষ্টে। মাছের প্রচণ্ড টানে সুতায় হাত কেটে রক্ত বেরিয়ে যায়, তবু হাল ছাড়বার পাত্র নয় সান্টিয়াগো। এক বোতল জল এনেছিল সঙ্গে করে; তাই একটু একটু করে খায়, আর খায় টোপ ফেলবার কাঁচা মাছ। দু'দিন পরে বঁড়শীবিদ্ধ মাছটা আধমরা হয়ে জলের উপরে ভেসে উঠল। ট্যাঁটা দিয়ে সম্পূর্ণ ঘায়েল করে মাছটাকে দড়ি দিয়ে ডিঙ্গির সঙ্গে বাঁধল সান্টিয়াগো। প্রকাণ্ড বড় মার্লিন মাছ; এতবড় মাছ সে কখনো কাউকে ধরতে দেখেনি। বড় সুস্বাদু মাছ। চড়া দামে বিক্রি হবে। তাড়াতাড়ি পাল তুলে তীরের দিকে হাল ধরল।

কিন্তু দেখা দিল নতুন বিপদ। মাছের গন্ধ পেয়ে হাঙ্গর পিছু নিয়েছে। প্রথম দু'টো-একটা। ট্যাঁটা দিয়ে, ছুরি দিয়ে কয়েকটা হাঙ্গর মারল। দু'টো অস্ত্রই একটু পরে সমুদ্রের জলে ডুবে গেল। তারপর এলো হাঙ্গরের ঝাঁক। নিরুপায় সান্টিয়াগো দেখতে লাগল কেমন করে তার মুখের গ্রাস ওরা কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। যখন তীরে পৌঁছল তখন মাছের মাথা এবং তার বিরাট কঙ্কালটা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

হেমিংওয়ের পূর্বের কাহিনীগুলি মৃত্যুর ছায়া ও হতাশার গ্লানিতে ভারাক্রান্ত। 'ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দি সী'তে লেগেছে নতুন সুর। মমতায় ও সহানুভূতিতে গল্পটি স্নিগ্ধ। শুরুতেই ম্যানোলিনের বৃদ্ধ জেলের প্রতি আকর্ষণ পাঠকের মনকে কোমল করে। সান্টিয়াগোর সামুদ্রিক পাখী ও বঁড়শীবৃদ্ধ মাছটার প্রতি করুণা হেমিংওয়ের সাহিত্যে নতুন রস। সান্টিয়াগো তার প্রতিদ্বন্দ্বী মাছটাকে জয় করেও বীরত্ববিলাসী হয়ে ওঠেনি। বরং বলছে শক্তিতে ও ধৈর্যে মাছটা তার সমকক্ষ; মানুষের বুদ্ধি ট্যাঁটা আবিষ্কার করেছে, বঁড়শী আবিষ্কার করেছে, তাই সে জয়ী হতে পেরেছে। আর সবচেয়ে বড় কথা আশার বাণী। সান্টিয়াগো এত কষ্ট সয়েও হতাশ হয়নি। সে বলছে, মানুষের পক্ষে আশা না করা পাপ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি সান্টিয়াগোর হার হলো না? মাছটাকে জয় করেও তো পেল না। ম্যানোলিন সান্ত্বনা দিয়ে বলল, তোমার লক্ষ্য ছিল মাছটাকে ধরা; সে লক্ষ্য পূর্ণ হয়েছে। তুমি জয়ী। সকল বৃহৎ জয়ের পশ্চাতেই একটু বেদনা থাকে। একটু বেদনার ছায়া পড়লেও হেমিংওয়ে তাঁর কাহিনী হতাশার মধ্যে

শেষ করেননি। মাছের বিরাট কঙ্কালটা দেখেই ও অঞ্চলের জেলেরা সান্টিয়াগোর ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে নতুন ক'রে। মাছ পেল না, কিন্তু ফিরে পেল ম্যানোলিনকে। ম্যানোলিন বলল, কাল থেকে সান্টিয়াগোর সঙ্গেই মাছ ধরবে। বাবার কথা অগ্রাহ্য করেও। পরিশ্রান্ত সান্টিয়াগো বিছানায় শুয়ে শুয়ে বহুদিন পূর্বেকার আফ্রিকার উপকূলের সিংহ স্বপ্ন দেখছে, এই কথা দিয়েই কাহিনী শেষ করা হয়েছে। সিংহ শৌর্য ও সাহসের প্রতীক ; বিষাদের গ্লানি পাঠকের মন থেকে চলে যায়। আগামী দিনের উজ্জ্বল সম্ভাবনার মধ্যে কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে।

Publishers : Jonathan Cape ; London. 7/6.

গোত্র ও প্রবর

হিন্দু সমাজের উপরতলায় বিয়ের ব্যাপারে এত বাছ-বিচার রয়েছে যে, এর পরেও বিয়ে হওয়াটা বিস্ময়কর বলে মনে করা বিচিত্র নয়। পৃথিবীর আর কোনো সভ্য সমাজেই বিয়ের ব্যাপারে এমন বিধি-নিষেধ নেই। শুধু হিন্দু হলে চলবে না, পাত্র-পাত্রীর দু'জনকেই হয় বাঙালী, বিহারী কিংবা অসমীয়া হতে হবে। বাঙালীর মধ্যে উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের ব্যবধান রয়েছে। তারপর এই তিনখণ্ডের অন্তর্গত জেলা ও পরগণার গণ্ডীও নেহাৎ উপেক্ষণীয় নয়। এক ব্রাহ্মণের মধ্যেই কত বিভাগ ; কুলীন, বংশজ, শ্রোত্রীয় ; নিকষ ও ভঙ্গকুলীন ; মেল ও গোত্র, ইত্যাদি পার হবার পরও থাকবে ঠিকুজি মেলাবার পালা, কনের গায়ের রঙ এবং চুলের দৈর্ঘ্য বিচার এবং বর-পণের অঙ্ক নিয়ে চুলচেরা তর্ক। এতগুলি বাধার উজান ঠেলে বর-কনের পিঁড়িতে পৌঁছানোটা সত্যি আশ্চর্যজনক ঘটনা। এই বাধাগুলি যে শুধু পুত্র-কন্যার বিবাহ সমস্যাসঙ্কুল করে তুলেছে তাই নয়, জাতীয় সংহতিরও অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের মধ্যে যে আজও একাত্মবোধ জাগেনি, আজও যে আমরা এক জাতি এক প্রাণ হতে পারিনি, বিবাহের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী তার প্রধান কারণ বললে অত্যুক্তি করা হবে না। কারণ, যেখানে রক্তের সম্বন্ধ স্থাপন করবার সম্ভাবনা নেই, সেখানে নিবিড় ও স্থায়ী ঐক্যবোধ জাগা সম্ভব নয়। তাছাড়া বহু শতাব্দী যাবৎ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে রক্তের আদান-প্রদান চলছে বলে জাতির প্রাণশক্তির উর্বরতা ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে—যে যুগে আর্য-অনার্য, শক-হূণ দল মিলিত হয়ে এক জাতি গড়ে তুলেছিল, সেটাই ভারতের সবচেয়ে গৌরবের যুগ।

প্রাচীন হিন্দু সমাজের অনেক সংস্কার আমরা ত্যাগ করেছি। যে কটি এখনো ছাড়তে পারিনি এবং যাদের প্রভাব আমাদের জীবনে সুগভীর, তাদের মধ্যে একটি হলো সগোত্র বিবাহের বাধা। অবশ্য কয়েক বৎসর পূর্বে আইনের চোখে সগোত্র বিবাহ সিদ্ধ হবে স্থির হয়েছে। কিন্তু তবু এখনো সগোত্রে বিবাহ আমাদের সংস্কারে বাধে। মানব ধর্মশাস্ত্র বলেছেন, "অসপিণ্ডা চ যা মাতুর অসগোত্রা চ যা পিতুঃ"—সে হচ্ছে বিবাহের যোগ্য কনে। বৈদিক যুগের বহু পূর্ব থেকে এই আদর্শ আমরা অনুসরণ করে আসছি। হাজার হাজার বছরের

ব্যবধানে অনেক রীতি-নীতি বদলে গেছে; কিন্তু গোত্র আমাদের জীবনে তার প্রাধান্য অপ্রতিহত রেখেছে। অথচ মজা এই যে, গোত্র কি সে সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা কোথাও নেই। সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ হয়েছে এই ধারণা থেকে যে, এক গোত্রভুক্ত সবাই এক পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত,—সুতরাং রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ। গোত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি প্রচলিত মত এই: বহু পূর্বে মুনি ঋষিদের গরু রাখবার জন্য গোচারণ ভূমি ছিল। প্রত্যেক মুনির পৃথক পৃথক মাঠ থাকত; হিংস্র জন্তুরা যাতে গরুর ক্ষতি করতে না পারে তার জন্য মাঠের চার পাশে বেড়া দিয়ে সুরক্ষিত করা হতো। গরুকে ত্রাণ বা রক্ষা করে বলে গোচারণ ভূমির নাম দেওয়া হয়েছিল গোত্র। পাশাপাশি অনেকগুলি গোচারণের মাঠে থাকত। তাই পার্থক্য বোঝাবার জন্য মালিকের নাম যোগ করে নামকরণের রীতি ছিল। যেমন, শাণ্ডিল্য মুনির গরু রাখবার জায়গাকে বলা হতো শাণ্ডিল্য গোত্র। ক্রমে গরুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধার জন্য ঐ মাঠেরই এক পাশে মুনিরা সপরিবারে বাস করতে আরম্ভ করলেন। তখন থেকে শাণ্ডিল্য মুনির বংশধরেরাও শাণ্ডিল্য গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বলে পরিচিত হলো।

সমাজ পত্তনের গোড়ার দিকে সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ করবার হয়তো যুক্তি ছিল। লোকসংখ্যা তখন কম ছিল বলে পরস্পরের সম্বন্ধটা খুঁজে বার করতে কষ্ট পেতে হতো না। তাছাড়া বৃহৎ যৌথ পরিবারের নৈতিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যও সগোত্র বিবাহের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাবের কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু আজ যখন একই গোত্রে লক্ষ লক্ষ লোক আছে তখন তাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ করা যুক্তিসঙ্গত কিনা তা বিচার করে দেখা প্রত্যেক সমাজসেবীরই কর্তব্য। কেউ কেউ বলেন যে, গোত্র বললেই রক্তের সম্বন্ধ বোঝাবে,—এ ধারণা ভুল। তাঁরা বলেন যে, শাণ্ডিল্য গোত্রের অন্তর্ভুক্ত সবাই যে শাণ্ডিল্য মুনির বংশধর তা ঠিক নয়। কারণ, তাহ'লে বিভিন্ন জাতির মধ্যে একই গোত্রের লোক দেখা যায় কি করে? হয়তো শাণ্ডিল্য মুনির শিষ্যদেরই শাণ্ডিল্য গোত্র বলা হয় এবং শিষ্যদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ যে কোনো জাতই থাকতে পারে। আবার ভিন্ন মত অনুসারে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যান্য জাতির গোত্র নির্দিষ্ট হতো তাদের কুল পুরোহিতের গোত্র অনুসারে। সুতরাং অব্রাহ্মণদের মধ্যেও ব্রাহ্মণ্য গোত্র দেখা যায়।

গোত্র আমাদের জীবনকে এখনো বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত করছে।

নৃতাত্ত্বিক আলোচনায় এর মূল্য কম নয়। গোত্র সম্বন্ধে মূল গ্রন্থগুলি সংস্কৃতে। আমাদের মতো সংস্কৃত অনভিজ্ঞের পড়বার সুযোগ নেই। সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে পুরুষোত্তম পণ্ডিতের "গোত্র-প্রবর-মঞ্জরী" প্রসিদ্ধ। সম্প্রতি John Brough "গোত্রপ্রবর মঞ্জরী" ইংরেজীতে অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন। এই অনুবাদের মুখবন্ধস্বরূপ গোত্র সম্বন্ধে পঞ্চাশ পৃষ্ঠার যে আলোচনা করা হয়েছে তা বিশেষ মূল্যবান। হিন্দু সমাজের এই প্রয়োজনীয় দিকটির উপর বড় একটা আলোচনা হয়নি. এই জন্যই এই বইটি আমাদের নিকট সমাদর লাভ করতে পারে।

Publishers : Cambridge University Press ; London. 45/-

ক্ষুধা

ক্ষুধার মতো নগ্ন, নিষ্ঠুর সত্য আর কি আছে? বুদ্ধদেব বলেছেন অন্নের ক্ষুধা ও যৌন ক্ষুধা এই দুই সহজাত প্রবৃত্তি মানব ইতিহাসের ভিত্তি রচনা করে। অথচ এদের কথা নিয়ে আলোচনা হয না বললেই চলে। ক্ষুধা এবং যৌনতৃষ্ণার সঙ্গে একটা পাশবিক প্রবৃত্তির ধারণা মিশে আছে; তাই সভ্যতাগর্বী আমরা এ দুটি প্রবৃত্তিকে এড়িয়ে যেতে চাই, উল্লেখ পর্যন্ত করতে লজ্জা বোধ করি। ফ্রয়েডের অসীম সাহসকে ধন্যবাদ; তিনি প্রকাশ্যে যৌন আলোচনার পথ উন্মুক্ত করে গেছেন। কিন্তু খাদ্যের ক্ষুধা সম্বন্ধে সামান্যই আলোচনা হয়েছে,—বিশেষ করে খোলাখুলি নির্ভীক আলোচনা।

রাষ্ট্রপুঞ্জের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার কার্য-নির্বাহক সমিতির সভাপতি J. de Castro তাঁর 'Geography of Hunger' নামক নতুন পুস্তকে পৃথিবীব্যাপী ক্ষুধার নিষ্ঠুর ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছেন। যে সব দেশে ক্ষুধার প্রাধান্য তাদের কথা বিচার করেছেন বিস্তৃতরূপে এবং সে বিচার এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয়েছে। ক্ষুধাক্লিষ্ট দেশগুলির প্রতি তাঁর সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে, বড় রাষ্ট্রগুলিকে খাতির করে কথা বলেননি। F. A. O-র সঙ্গে যুক্ত বলে Castro-র কথার বিশেষ মূল্য আছে।

ক্ষুধা বলতে লেখক শুধু খাদ্যের অভাব বোঝেন না। তিনি একে বৃহত্তর অর্থে ব্যবহার করেছেন; অর্থাৎ পুষ্টির অভাবকেও তিনি ক্ষুধার পরিধির মধ্যে ফেলেছেন। এই অর্থে যুদ্ধের পরবর্তী হিসাব অনুসারে পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ লোক ক্ষুধার্ত। আজকের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো ক্ষুধিতের মুখে অন্নদানের ব্যবস্থা। যুদ্ধ ও রাজনৈতিক মতবাদের সমস্যা তার কাছে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। চীন, জাপান, ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য দরিদ্র দেশের একমাত্র সমস্যা হলো ক্ষুধা। অনেকে বলেন খাদ্যের অভাব মানুষের আর পাঁচটা সমস্যার মতোই চিরস্থায়ী, দূর হবার নয়। কিন্তু ক্যাস্ট্রো বলছেন খাদ্যাভাব সৃষ্টি করেছে মানুষ নিজে, সুতরাং দূর করা যায় ইচ্ছা করলেই। যারা জন-সংখ্যা বৃদ্ধির যুক্তি দেখায়, লেখক তাদের বলছেন যে বর্তমানে পৃথিবীর আবাদযোগ্য জমির আট ভাগের এক ভাগ মাত্র চাষ করা হয়। সুতরাং

বর্তমান জনসংখ্যার কয়েকগুণ বেশি লোকও বেশ স্বচ্ছন্দে খেয়ে বাঁচতে পারে।

জনবৃদ্ধি সম্বন্ধে ম্যালথাসের যে মতবাদ প্রায় বাতিল হয়ে গেছে তারই নতুন সমর্থকরা বলেন যে, জন্মনিয়ন্ত্রণ হলো খাদ্য সমস্যার হাত থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র পথ। কিন্তু ক্যাস্ট্রো বলছেন, একথা ভুল। খাদ্যের যেখানে অভাব সেইখানেই জন্মের হার বেশী,—যেমন ভারত, চীন ও জাপানে। যারা প্রোটিন ও অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য খেতে পায় তাদের মধ্যে জন্মহার আপনা থেকেই কম; একথার সত্যতা ইউরোপ আমেরিকার দিকে চাইলে বোঝা যাবে। আমাদের দেশের সম্পন্ন পরিবারগুলির প্রতি দৃষ্টি দিলেও এর সত্যতা প্রমাণিত হওয়া অসম্ভব নয়। ল্যাবরেটরীর পরীক্ষায়ও এই তথ্য সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং খাদ্যাভাব যত বাড়বে জন্মহার তত বৃদ্ধি পাবে। যারা পুষ্টিকর খাদ্য খেতে পায় তারা ফুটবল, রাগবি, হকি প্রভৃতি খেলার মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু অর্ধাহারী স্বল্পশক্তিসম্পন্ন লোকদের যৌনানুভূতির আনন্দ ছাড়া আর কিছুই থাকে না। একমাত্র উপায় হলো পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা যাতে জন্মহার স্বাভাবিক উপায়েই কমে আসবে।

পৃথিবীর যে সম্পদ আছে বর্ধিত জনসংখ্যাকে তা দিয়ে অনায়াসে খাওয়ানো যেতে পারে। শুধু আন্তরিক চেষ্টার অভাব। ক্ষুধা দূর করবার জন্য আমেরিকা, গ্রেটব্রিটেন ও রাশিয়া এক হয়ে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে না। অথচ সভ্যতা ধ্বংসকারী বিশ্বযুদ্ধের জন্য তারা পরস্পর হাত মেলাতে পারে। মারণাস্ত্র নির্মাণে যে বিজ্ঞান নিয়োজিত করা হয়, খাদ্যোৎপাদনে তার পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব হয় কই? বিজ্ঞান শুধু কৃষির উন্নতি করতে সক্ষম নয়, কৃত্রিম খাদ্যও প্রস্তুত করতে পারে। পুঁজিপতিরা টাকা ঢালবে ফ্যাক্টরী গড়ে তুলতে, শস্য ফলাবার জন্য টাকা নেই। কেউ কেউ মৃত্তিকা ক্ষয়ের একটা ভয়াবহ রূপ আঁকতে চেষ্টা করেন। কিন্তু আসল ভয় মনুষ্যসম্পদ ক্ষয়ের। একদল ভাগ্যবানের হৃদয় ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরুভূমির মতো নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে, আর একদল দেহ ক্ষয় করে মৃত্যু ও ব্যাধিকে আহ্বান করে আনছে।

ক্যাস্ট্রো ভারতবর্ষের খাদ্য সমস্যা পৃথকভাবে আলোচনা করেছেন। এখানে পৃথিবীর শতকরা কুড়িভাগ লোক মাত্র তিন শতাংশ ভূপৃষ্ঠের উপরে বাস করে। অনাহার, ব্যাধি এবং উচ্চ মৃত্যুহার ও দশ বছরে চার কোটি লোক বৃদ্ধি ভারতবর্ষকে ম্যালথাসের আধুনিক শিষ্যদের কাছে তাদের মতবাদের

সমর্থনে জীবন্ত দৃষ্টান্ত করে তুলেছে। কিন্তু ভারতবর্ষ এখনো এমন নিঃস্ব হয়নি যাতে সে তার সন্তানদের খাওয়াতে পারে না। খাদ্যাভাব সত্ত্বেও আবাদযোগ্য জমির দুই তৃতীয়াংশ মাত্র চাষ হয়। কৃষি পদ্ধতির যুগোপযোগী উন্নতি হয়নি। জলসেচের জন্য প্রকৃতির খেয়ালের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয়। উর্বর অঞ্চলের উপর অসম্ভব ভিড়; অপেক্ষাকৃত অনুর্বর জমি চাষ করতে যে অর্থ নিয়োগ ও বৈজ্ঞানিক সাহায্য প্রয়োজন তা পাওয়া যায় না। উপার্জনের জন্য প্রায় সমস্ত চাপই পড়ে জমির উপর। কৃষি ছাড়াও আছে খনিজ, বনজ এবং জল-সম্পদ। এদের দিকে দৃষ্টি দিলে লোকের দুর্দশা অনেকটা ঘুচবে। সাম্রাজ্য-বাদী ইংরেজ নিজের স্বার্থের জন্য দেশের শিল্পকে ধ্বংস করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের জনসংখ্যার অন্ততঃ শতকরা ৪০ জন ছিল শিল্প-নির্ভর। কিন্তু ইংরেজের কৌশলে শিল্প ধ্বংস হবার পর তারাও জমির উপর ভাগ বসাল। ইংরেজ চাষের জন্য যতটুকু করেছে তা হলো প্রধানতঃ তুলা, পাট ও আখের জন্য। ইচ্ছা করলে তারা যে খাদ্যশস্যের চাষ কত উন্নত করতে পারত তা চা-এর চাষ দেখলে অনুমান করা যায়। জমিদার, পুঁজিপতি ও চাষীদের মধ্যে যে ভেদ ছিল ইংরেজ তা দূর করবার চেষ্টা না করে বাঁচিয়ে রাখবার সহয়তা করেছে। আধুনিক কৃষিপদ্ধতি কিংবা হাতের কাজ শেখবার জন্য লেখাপড়া কিছু জানা দরকার। ইংরেজ তার মূলেও কুঠারাঘাত করেছে। ভারতবর্ষের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার মান খুব উন্নত ছিল। ইংরেজী শিক্ষার বাহন করায় হাজার হাজার দেশীয় স্কুল বন্ধ হয়ে গেল এবং অশিক্ষার অন্ধকার দেশকে গ্রাস করে ফেলল।

ভারতবর্ষের দুর্দশার কারণ সম্বন্ধে ক্যাস্ট্রো বলছেন ঃ

"Misery exists in India neither because the nation is overrun with people nor because her soil is saturated. The true causes have to do with inadequate exploitation of resources both natural and human, and with the extremely adverse effects of the British colonial system (P. 154)".

ক্ষুধাপীড়িত সকলের নিকটই বইটি সমাদর লাভ করবে।

Publishers: V. Gollancz ; London. 18/-

স্বপ্নরাজ্য

বর্তমানকে নিয়ে আমরা কোনোদিনই তৃপ্ত হতে পারি না। আজকের দুঃখ-কষ্ট, জীবনের অপূর্ণতা, মনকে নিরন্তর পীড়া দেয়। যে কাল-খণ্ডকে প্রত্যক্ষ করছি নানা অবিচার ও বেদনায় তার রূপ কলঙ্কিত। তাই কল্পনা করি, অতীতের দিনগুলি এর চেয়ে ভালো ছিল। স্বপ্ন দেখি, ভবিষ্যতে এমন একদিন আসবে যখন কারো মুখ থেকে কোনো অভিযোগ শোনা যাবে না। পৃথিবীর চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এমনি এক আদর্শ সমাজের পরিকল্পনা নিয়ে চিন্তা করছেন সভ্যতা বিকাশের সময় থেকে। প্রকৃতপক্ষে মানব সভ্যতার ধারা এই আদর্শে পৌঁছবার জন্য ক্রমাগত বয়ে চলেছে। অনাগত ভবিষ্যৎকালের অপরিস্ফুট আদর্শকে কেন্দ্র করে অনেক কবি-কল্পনা সৃষ্টির সুযোগ পাওয়া গেছে। আবার যুক্তি ও তথ্যের উপর ভিত্তি করে আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনারও অভাব নেই। গান্ধীজীর ফিনিক্স আশ্রম, টলস্টয় ফার্ম, ইত্যাদি অসংখ্য অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ক্ষুদ্র পরিসরে আদর্শ সমাজকে রূপ দেওয়া। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবিরোধ আদর্শে পৌঁছবার পথ নিয়ে, উদ্দেশ্য সকলেরই এক। সবাই বলছেন, এই পথে গেলে আদর্শ সমাজকে পাওয়া যাবে।

এই আদর্শ সমাজ গঠনের কতকগুলি পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত হবার আশা করা যায় না। কিন্তু আদর্শ হিসাবে এরা সুন্দর; অমন একটি রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে বাস করবার লোভ মন উন্মুখ করে তোলে। স্যার টমাস মুর 'ইউটোপিয়া' নামক কাব্যগ্রন্থে এমনি একটি রাষ্ট্রের ছবি এঁকেছেন। এ বই এত বিখ্যাত হয়ে পড়েছিল যে, বইয়ের নাম থেকে ইংরেজী ভাষায় একটি শব্দ সৃষ্টি হয়ে গেছে। ইউটোপিয়া এখন এমন একটি আদর্শ রাষ্ট্র বোঝায়, যেখানে শুধুই আদর্শচরিত্র নাগরিকরা বাস করে। সেখানে ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা নেই; অবিচার, অভাব ইত্যাদি নেই। সমস্যাক্লিষ্ট সমাজের বাস্তব অবস্থা কি হতে পারে তা দেখানো উদ্দেশ্য নয়, লেখক যা হওয়া উচিত মনে করেন তারই ছবি আঁকেন। এ ছাড়া যে সব পরিকল্পনা কাল্পনিক এবং বাস্তবে পরিণত হবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত,—তাদেরও আমরা ইউটোপিয়ান বলি।

হিন্দুর ইউটোপিয়ার স্বপ্ন সত্যযুগে সফল হয়েছিল। কিন্তু সেই স্বর্ণযুগ অতীত হয়ে গেছে। আমাদের কালবিবর্তন হয় ধাপে ধাপে; সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে। প্রত্যেক ধাপেই আমরা আদর্শ সমাজ বা সত্যযুগ থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাই। সত্যযুগের উৎপত্তি হয়েছিল বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথির রবিবারে। এ যুগে পাপ নেই, সকলেই পুণ্যকর্মা। সত্যযুগের মানুষরা লম্বায় একুশ হাত; ব্যাধিতে তাদের মৃত্যু হয় না; সকলেরই ইচ্ছামৃত্যু। খাবার খায় সোনার থালায়। তখন সকলেই ছিল ধর্মপরায়ণ, তীর্থসেবী এবং সত্যবাদী। প্রত্যেকটি বীজ অঙ্কুরিত হতো, একটিও ব্যর্থ হতো না। সকল ঋতুতে সমান শস্য পাওয়া যেত। কারো দুঃখ ছিল না, সকলের মুখ আনন্দোৎফুল্ল। আজকের সমস্যাপীড়িত মানুষকে হরিবংশ আশার কথা শুনিয়েছেন। সত্যযুগ অতীতেই শেষ হয়ে যায়নি, ভবিষ্যতে আবার সত্যযুগ আসবে। হরিবংশ বলছেন: কলিযুগের শেষে ধর্ম যখন নিঃশেষে লোপ পেয়ে যাবে তখন সত্যযুগের শুরু হবে,—রাত্রি শেষে সূর্যোদয়ের মতো। গান্ধীজীর রামরাজ্যের পরিকল্পনা হয়তো এই আগামী সত্যযুগের পূর্বস্বপ্ন।

হরিবংশের চেয়েও আশার কথা শুনিয়েছেন আমাদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। বলেছেন:

> কলিঃ শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ।
> উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সংপদ্যতে চরন্॥
> চরৈবেতি। চরৈবেতি॥

কলিকাল হল ঘুমিয়ে থাকা, ঘুম ভাঙ্গলে হল দ্বাপর, বিছানা ছেড়ে উঠলে হল ত্রেতা এবং সামনে এগিয়ে চলা হল সত্যযুগ। সুতরাং এগিয়ে চল, সামনে এগিয়ে চল।

এই সত্যযুগ তো আমাদের হাতের মুঠোয়। এগিয়ে চলার মন্ত্রকে গ্রহণ করলেই পেতে পারি।

ইউরোপে আদর্শ রাষ্ট্র বা সত্যযুগের প্রথম পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্লেটো রূপ দিয়েছেন তাঁর 'রিপাব্লিকে'। প্লেটোর রাষ্ট্রে তিন শ্রেণীর লোক থাকবে। শাসক শ্রেণীতে থাকবে দেশের শ্রেষ্ঠ নাগরিক, তাদের কাজ হবে শাসনকার্য পরিচালনা করা; দ্বিতীয় বা ক্ষত্রিয় শ্রেণীর প্রধান গুণ হবে সাহসিকতা এবং এদের উপরে দায়িত্ব থাকবে দেশরক্ষার; তৃতীয় শ্রেণীতে থাকবে সাধারণ নাগরিক, যারা প্রথম শ্রেণীর নেতৃত্বে কাজ করে যাবে। প্রথম শ্রেণীর যুক্তিবাদী মন থাকবে, সংস্কার

বা ভাবাবেগ তাদের প্রভাবান্বিত করবে না। প্রত্যেক শ্রেণী নিজের কর্তব্য করে যাবে, অপরের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে। বিদ্যায় বুদ্ধিতে যে সব নাগরিক শ্রেষ্ঠ তাদের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার ভার থাকলে প্রত্যেক নাগরিক পরোক্ষে শাসনযন্ত্রের সুষ্ঠু প্রয়োগের মধ্য দিয়ে উপকৃত হবে। প্লেটোর এই রাষ্ট্র-পরিকল্পনা পরবর্তীকালে মানুষের চিন্তাধারার উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।

ইউটোপিয়া কিংবা স্বর্ণরাজ্যের পরিকল্পনা সাধারণতঃ রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক অনিশ্চয়তার যুগে দেখা দেয়। এথেন্সের ইতিহাসের এক সঙ্কটক্ষণে 'রিপাব্লিক' লেখা হয়েছিল। অন্যান্য প্রায় সকল ইউটোপিয়া লেখা হয়েছে ষোড়শ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে বর্তমান কালের মধ্যে। মধ্যযুগে ইউরোপে ইউটোপিয়া রচনার সুযোগ ছিল না। কারণ তখন জীবন ছিল ধর্মের ছকে বাঁধা। চার্চের নির্দেশ ও সমর্থনের অতিরিক্ত কিছু থাকতে পারে এমন কথা কল্পনা করাও ছিল পাপ। চার্চ যেভাবে জীবন ও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, সন্তুষ্ট চিত্তে তাকে গ্রহণ করে নেওয়া ছিল রীতি। মধ্যযুগ শেষ হয়ে গেলে মানুষের মনে জাগল জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে প্রশ্ন; এলো চিন্তার স্বাধীনতা। বর্তমান পরিবেশের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখায় আর বাধা রইল না।

স্যার টমাস মূরের 'ইউটোপিয়া' (১৫১৬) এই জাতীয় স্বর্ণরাজ্য পরিকল্পনার মধ্যে সর্বপ্রথম। মূর তাঁর 'ইউটোপিয়ার' প্রথম খণ্ডে তদানীন্তন ইংলণ্ডের শোচনীয় সামাজিক অবস্থার ছবি দিয়েছেন। ইংলণ্ডে তখন ধীরে ধীরে শিল্প-বিপ্লবের প্রথম লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে; অর্থগৃধ্নু হাঙ্গরেরা ভেসে উঠতে আরম্ভ করেছে সমাজের উপরতলায়। দ্বিতীয় খণ্ডে মূর তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা দিয়েছেন। এখানে প্রত্যেককে কিছু-না-কিছু দৈহিক পরিশ্রম করে জীবিকার্জন করতে হবে। কয়েকজন বিদ্বান ব্যক্তি ছাড়া এমন কেউ থাকতে পারবে না যে বসে বসে খাবে। প্রত্যেকে দৈনিক ছ'ঘণ্টা করে রাষ্ট্রের সম্পদ উৎপাদনে সাহায্য করবে। যুদ্ধ ও সকল প্রকার বিলাসিতা বর্জনের নীতি রাষ্ট্র পালন করবে কঠোরভাবে। রাজা নির্বাচিত হবেন নাগরিকদের দ্বারা এবং রাজার জীবনযাত্রা হবে ঠিক সাধারণ লোকের মতো। মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজা শাসন করবেন না, তাঁর লক্ষ্য হবে সকলের সুখ ও শান্তি। শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, মত প্রকাশের

স্বাধীনতা, শ্রমিক প্রভৃতি সমস্যা সম্বন্ধে মূরের মতামত আধুনিকতাপন্থী। মূর এসব কথা লিখলেও নিজে তাকে কার্যকরী করবার চেষ্টা করেননি। তিনি লর্ড চ্যান্সেলর হয়েছিলেন; কিন্তু রাজরোষে পড়ে আবার প্রাণ হারাতে হয়েছিল।

এর পর উল্লেখযোগ্য কাম্পানেল্লার City of the Sun বা সূর্যনগর। ১৫৬৮ সালে কাম্পানেল্লা ইতালীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং খুব অল্প বয়সে যোগ দেন ডোমিনিকান সন্ন্যাসীদের দলে। রাজদ্রোহের মিথ্যা অভিযোগে তাঁকে দীর্ঘ সাতাশ বছর কারাবাস করতে হয়েছে। কাম্পানেল্লার স্বর্ণরাজ্য একটি প্রাচীরঘেরা সুপরিকল্পিত নগর। এখানে তিনি যে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার ছবি দিয়েছেন তা খৃস্টীয় আশ্রমের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এসেছে। কিন্তু প্রশাসন, সামাজিক সম্পর্ক, শিল্প নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি সম্বন্ধে কাম্পানেল্লার মতামত চিরকালই আগ্রহের সঙ্গে পড়া হবে। এই রাষ্ট্রের নাগরিকরা সমষ্টিগতভাবে সমাজের মঙ্গলের জন্য কাজ করবে; কিন্তু দৈহিক ও মানসিক উন্নতির জন্য যে নিজেকে একা সাধনা করতে হবে সে কথা ভুললে চলবে না। বিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তির উপরেই গভর্ণমেণ্টের ভার থাকবে। সকল কার্যের মূল লক্ষ্য হবে সাম্য;—সমাজের মঙ্গলের জন্য ব্যষ্টিকে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। এই পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সকলের জন্য খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা, রাষ্ট্র কর্তৃক উৎপাদিত দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ, কায়িক পরিশ্রমের প্রতি সম্মান এবং শিল্পী ও লেখকদের প্রতি শ্রদ্ধা।

বেকনের Novus Atlantis (1627) কাম্পানেল্লার মতো সাম্যবাদে পূর্ণ নয়। এখানে বেকন বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন বিজ্ঞানের জন্য রাষ্ট্রের কি করা কর্তব্য। বেকনের পরিকল্পনায় সলোমনস্ হাউস নামে একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেন্দ্র প্রাধান্য লাভ করেছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা যে সব নতুন তথ্য ও জিনিস আবিষ্কৃত হবে তারা মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করবে। বেকন কোন্ কোন্ বিষয়ে গবেষণা করতে হবে তার একটা তালিকাও প্রস্তুত করেছেন এবং ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্বন্ধে এমন কতকগুলি ইঙ্গিত তিনি দিয়েছিলেন, যা আজ সফল হয়েছে। বিজ্ঞান সাধনা সম্পর্কে বেকনের স্বপ্ন অনেকটা সফল হয়েছে, কিন্তু তাতে মানুষের দুঃখ লাঘব হয়েছে কতটুকু?

স্বর্ণরাজ্য পরিকল্পনাগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ রুশোর Social Contract (1762) বা সামাজিক চুক্তি। রুশো পূর্ববর্তীদের মতো ইউটোপিয়ার মতো

অচেনা দ্বীপ, স্বর্ণনগর কিংবা সুদূর অ্যাটলান্টিসের ন্যায় কোনো জায়গায় আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। তাঁর মতবাদ নিছক কল্পনা নয়, বাস্তবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। পাঠকের মনে হবে তাঁরও এর সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। রুশোর মতবাদের পেছনে একটা যুক্তির কাঠামো অনুভব করা যায় বলে শ্রদ্ধা জাগে। রুশো বলছেন, পরিপূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে আমরা জন্মেছি। প্রকৃতির কাছ থেকে যে স্বাধীনতা পেয়েছি, তাতে আমাদের স্বাভাবিক অধিকার। নিজেদের সুবিধার জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কিছুটা খর্ব করে আমরা সমাজ গড়েছি। এই সমাজ বা রাষ্ট্রের উপরে বসিয়েছি রাজাকে, তাঁর সঙ্গে চুক্তি করেছি সু-শাসনের। কু-শাসন হলে রাজাকে পদচ্যুত করবার অধিকার রয়েছে জনসাধারণের। ক্ষমতা আমাদের, রাজার নয়। মানুষ পৃথিবীতে আসবার পরে এমনি আদর্শ রাষ্ট্র ছিল, যেখানকার নাগরিকরা প্রকৃতিদত্ত পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করত। সেই স্বাধীনতা এখন সকলের হাত থেকে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে চলে গেছে বলেই এত দুঃখ। আমরাই বে-দখল-কারীদের ক্ষমতা কেড়ে নিতে পারি। আমাদের প্রচেষ্টার পেছনে থাকবে নৈতিক অধিকারের জোর। রুশোর এই মতবাদ ইউরোপের বহু দেশে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং তাঁর নিজের দেশে সাহায্য করেছিল বিপ্লবকে দ্রুততর করতে।

উপরোক্ত চারটি প্রধান ইউটোপিয়া মানুষের চিন্তাধারার উল্লেখযোগ্য একটি দিকের পরিচয় দিতে সক্ষম। সম্প্রতি একটি খণ্ডে এই চারটি ইউটোপিয়া একসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। মানব সমাজের বিকাশ ও অগ্রগতি নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন তাঁদের কাছে বইটি সমাদর লাভ করবে। বইটির নাম Famous Utopias.

Publishers : Tudor publishing Co, New York. 3.00,

ভবানী জংশন

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা ও ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির মধ্যে ৩৪৭ বৎসরের ব্যবধান। বৃটেনের সঙ্গে ভারতের এই দীর্ঘ সাড়ে তিনশ' বছরের যোগাযোগের ইতিহাসের মধ্যে কত বিচিত্র নর-নারী, কত আশ্চর্য ঘটনা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। এর মধ্যে উপন্যাসের অনেক উপাদানও খুঁজে পাওয়া যাবে। বহু লেখক এখান থেকে উপাদান সংগ্রহ করে উপন্যাস লিখেছেন; এঁদের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। কিন্তু সাড়ে তিনশ' বছরের কাহিনীকে উপন্যাসের মারফৎ ফুটিয়ে তোলবার দুঃসাহসিক পরিকল্পনা কেউ করেননি। একজন নতুন লেখক পঁয়ত্রিশখানি উপন্যাস লিখে সাড়ে তিনশ' বছরের একটি ধারাবাহিক ছবি দেবেন বলে স্থির করেছেন, এবং ইতিমধ্যেই তাঁর চারখানা বই প্রকাশিত হয়েছে।

জন মাস্টার্স নতুন লেখক হলেও বয়সে নবীন নন। তিনি ভারতীয় সেনা-বাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসার। এখন আছেন আমেরিকায়। সংবাদপত্রের এক রিপোর্টারের সঙ্গে আলাপ করতে করতে তিনি একদিন বললেন যে, ভারত সম্বন্ধে আমেরিকার কাগজে যে সব প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত হয় সেগুলি ভ্রান্তিপূর্ণ এবং নেহাৎ বাজে লেখা। রিপোর্টার আমন্ত্রণ জানাল; বলল, আপনি ভালো করে লিখুন না? মাস্টার্স পরদিনই দশ পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধ লিখে ফেললেন এবং তার পরিবর্তে কিছু দক্ষিণাও পেলেন। পেন্সনের টাকা যথেষ্ট ছিল না; উপার্জন করা প্রয়োজন। আকস্মিকভাবে লেখা থেকে অর্থাগমের সুযোগ দেখতে পেলেন মাস্টার্স।

বৃটেনের স্যাভেজ পরিবারের যে সব লোক ভারতে কার্যোপলক্ষে এসেছিল তাদের নিয়ে পঁয়ত্রিশটি উপন্যাস লিখবেন বলে মাস্টার্স পরিকল্পনা করেছেন। এই পঁয়ত্রিশটি উপন্যাসে ৩৪৭ বছরের কাহিনী থাকবে। মাস্টার্স-এর নিজের পরিবারও ভারতের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নরূপে ১৬০ বছর যাবৎ যুক্ত ছিল। এ পর্যন্ত মাস্টার্স চারখানা উপন্যাস লিখেছেন; কিন্তু তাঁর উপন্যাসগুলি পরিকল্পনানুযায়ী কালানুসারী নয়। প্রথম উপন্যাস 'নাইট রানার্স অব বেঙ্গল' ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ কেন্দ্র করে লেখা। তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস Bhowani Junction ভারতে স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনা নিয়ে রচিত।

সিরিজ পূর্ণ করবার জন্য মাস্টার্স এই পরিণত বয়সে নতুন লেখা আরম্ভ করে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন তা বিস্ময়কর। প্রত্যেক বৎসর একখানি উপন্যাস সম্পূর্ণ করবেন, এই তাঁর সংকল্প।

'ভবানী জংশন' বৃটেন ও আমেরিকায় ১৯৫৩ সালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে স্বীকৃত হয়েছে। ভবানী মধ্য-ভারতের একটি কাল্পনিক রেলওয়ে জংশন। এই জংশনের প্রধান রেলপথ দিল্লী-ডেকান রেলওয়ে। রেললাইন, ইঞ্জিন, সিগন্যাল এবং প্লাটফর্ম শুধু গল্পের পটভূমিকাই নয়, অনেক সময় এদের কাহিনীর জীবন্ত চরিত্র বলে মনে হয়।

গল্পের শুরু ১৯৪৬ সালের মে মাসে। যুদ্ধ শেষ হয়েছে। যুদ্ধ উপলক্ষে যে সব বৃটিশ সৈন্য এসেছিল তারা একে একে ভারত ত্যাগ করে যাচ্ছে। ভারত তখনো স্বাধীনতা লাভ করেনি সত্য, কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির অনিবার্যতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভবানী জংশনের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে যেমন বহু দূর থেকে ইঞ্জিন ছুটে আসতে দেখা যায়, তেমনি উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী প্রত্যেকে অনুভব করছে স্বাধীনতা অবশ্যম্ভাবীরূপে এগিয়ে আসছে, আর বেশী দেরী নেই। এই অনুভূতির মধ্যেই কাহিনীর জন্ম। ভিক্টোরিয়া ও টেলর অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের প্রতিনিধি, রণজিৎ, সারাভাই ও কে, পি, রায় ভারতের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করবার জন্য ব্যগ্র; রোডনি স্যাভেজ বৃটিশ-শক্তির প্রতিভূ; জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গোবিন্দস্বামী ব্যুরোক্রাটিক সরকারের অঙ্গ হিসাবে রোডনির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ঠেকিয়ে রাখতে। ভবানী জংশনের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা পুরুষানুক্রমে রেলে চাকরি করছে; ভারতীয়দের চেয়ে তারা সকল বিষয়ে অধিকতর সুবিধা পায় এবং এটা তাদের প্রাপ্য বলে মনে করে। ইংরেজেরা তাদের স্বীকার না করলেও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা মনে করে তারা ইংরেজদের সগোত্র। বৃটেনের মুখের দিকে চেয়ে থাকাই এদের স্বভাব; ভারতীয়দের এত অবজ্ঞা করে যে একদিন এরা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পাবে একথা তাদের পক্ষে বিশ্বাস করাও কঠিন। ভিক্টোরিয়া জোন্স এই সমাজে বড় হয়েছে। তার বাবা ইঞ্জিন ড্রাইভার; আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব অধিকাংশই কাজ করে রেলে; থাকে রেলের কোয়ার্টারে। ভিক্টোরিয়া যুদ্ধের ক'বছর ডব্লু, এ, সি-তে চাকরি করেছে। চাকরি এবার শেষ হবে। শেষ হবার আগে কয়েক মাসের ছুটি পেয়ে বাড়ি এসেছে।

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের বদ্ধ আবহাওয়ায় ভিক্টোরিয়া নিয়ে এলো নতুন

জীবনের ইঙ্গিত। যুদ্ধ-বিভাগের কাজ করতে গিয়ে সে বৃহত্তর জীবনকে দেখবার সুযোগ পেয়েছে। বৃটিশ অফিসারদের দেখেছে ঘনিষ্ঠরূপে; চিনতে পেরেছে ভারতবাসীকে। সৈন্য-বিভাগে থাকতেই সে উপলব্ধি করে এসেছে ভারতের স্বাধীনতা কেউ ঠেকাতে পারবে না। কিন্তু সবচেয়ে বেশী করে উপলব্ধি করেছে তাদের সমাজের অসহায়তাকে। এতদিন তারা ইংরেজদের মুখ চেয়ে ছিল, বৃটেনকে বলত 'হোম', এদেশকে ভাবত বিদেশ। এখন বৃটিশ অফিসারদের সঙ্গে পরিচয়ের পর বুঝতে পেরেছে তারা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের স্বীকৃতি দেয় না, বরং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। বৃটিশ-শক্তির বশংবদ ভৃত্য হয়ে চিরদিন ভারতীয়দের বিরুদ্ধাচরণ করে এসেছে; সুতরাং ভারত স্বাধীন হবার পর অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের অবস্থা কি হবে? তাদের গৃহ নেই, দেশ নেই; যাদের মুরুব্বী কল্পনা করে এতদিন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা উদ্ধত ব্যবহার করবার জোর পেয়েছে আজ তারাও চলে যাবে। ভিক্টোরিয়া স্থির করে এসেছে সে ভারতের মেয়ে, ভারতের সঙ্গেই সে তার ভাগ্য যুক্ত করবে এখন থেকে।

প্যাট্রিক টেলর ভিক্টোরিয়ার ছেলেবেলার বন্ধু। যৌবনে সে বন্ধুত্ব অন্তরঙ্গতায় পরিণত হলো। যদিও মৌখিক বাগদান হয়নি তবু ওরা দু'জন এবং পরিবারের অন্য সকলেই জানে একদিন ওদের বিয়ে হবে। ভিক্টোরিয়া অনেক দিন পরে বাড়ি এসে টেলরকে নতুন চোখে দেখল। টেলর যেন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের সকল দোষ, সকল সংকীর্ণতার প্রতীক। তার গায়ের রঙ ততটা ফর্সা নয়; পাছে তাকে কেউ 'নেটিভ' বলে ভুল করে তাই সে সর্বদা টুপি পরে থাকে,—রাত্রিতেও। কথায় কথায় 'ব্লাডি' ব্যবহার করে, ভারতীয়দের প্রতি অবজ্ঞার শেষ নেই; অকারণে তার রুক্ষ মেজাজ আত্মপ্রকাশ করে; এবং চারিত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য ভিক্টোরিয়ার অনুপস্থিতিতে তার বোনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করতে দ্বিধাবোধ করেনি।

বেশিদিন ছুটি ভোগ করা হলো না ভিক্টোরিয়ার। কর্ণেল রোডনি স্যাভেজ এক গুর্খা বাহিনী নিয়ে ভবানীতে উপস্থিত হলো। তখন নিখিল ভারত রেল ধর্মঘট সমাসন্ন। বৃটিশ সৈন্য বোম্বাই স্পেশাল ট্রেণ ভবানী জংশন হয়ে যাবে বোম্বাই; বোম্বাই থেকে তারা দেশে ফিরবে। গভর্ণমেণ্টের আশঙ্কা রেল ধর্মঘটের সুযোগে বার্মায় সুভাষচন্দ্রের ভূতপূর্ব সহকর্মী পলাতক কম্যুনিস্ট কে, পি, রায় সৈন্য বোম্বাই ট্রেণ ধ্বংসের চেষ্টা করবে। তাই কর্ণেল স্যাভেজ এসেছে রেললাইনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে। ভিক্টোরিয়ার প্রতি হেডকোয়ার্টার

থেকে নির্দেশ এলো ছুটি বাতিল করে কর্ণেল স্যাভেজের দপ্তরে হাজির হতে। ভিক্টোরিয়া হলো স্যাভেজের ব্যক্তিগত সহকারী; তার প্রধান কাজ রেল-দপ্তর ও সেনা-দপ্তরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা। প্যাট্রিক টেলর ভবানী•জংশনের ট্র্যাফিক অফিসার। সুতরাং প্রায়ই যেতে হয় তার আপিসে। টেলর প্রথম থেকেই স্যাভেজকে সুনজরে দেখতে পারেনি। সুতরাং দুই-পুরুষ ও এক-নারীর চিরন্তন সমস্যা শুরু হলো। ধীরে ধীরে আর একজন ভিক্টোরিয়ার জীবনে প্রবেশ করে গল্পের ধারায় নতুন বাঁক সৃষ্টি করল; সে রণজিৎ কাসেল, টেলরের সহকারী। ভিক্টোরিয়া দেখল, বৃটিশ কিংবা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যত পুরুষের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে রণজিৎ তাদের কারো মতো নয়। একটু পরিচয় হবার পরই তারা ভিক্টোরিয়ার দেহের উপর দাবী জানাতে চায়। সম্প্রতি এমনি এক তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে সে হেডকোয়ার্টার থেকে ফিরেছে। একজন বৃটিশ অফিসার প্রেমের লোভ দেখিয়ে তাকে প্রতারিত করেছে, কিছুই কেড়ে নিতে বাকি রাখেনি। সেই প্রতারিত হবার জ্বালা, সর্বস্ব খোয়াবার বেদনা, বৃটিশ জাতির উপর ঘৃণার সৃষ্টি করেছে। শান্তি খুঁজল নিজেদের সমাজে। কিন্তু এখানেও দেহ-সর্বস্ব আকর্ষণ, প্রেম নেই। যৌনানুভূতির উগ্রতা তাদের রক্তে। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের আদি জননী যে দুর্বল মুহূর্তে বিদেশীর নিকট আত্মদান করেছিল, সে মুহূর্তটি এখনো তাদের রক্তে জাগ্রত হয়ে আছে। কর্ণেল স্যাভেজ ভিক্টোরিয়ার রূপ দেখে আকৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু সে আকর্ষণ অশোভন হয়ে আত্মপ্রকাশ করেনি। অফিসার সুলভ কাঠিন্যের বর্ম দিয়ে নিজেকে সে গোপন করে রেখেছে। কিন্তু তার সহকর্মী মেকলের মধ্যে পশু প্রবৃত্তি জেগে উঠল, ভিক্টোরিয়াকে অপমানিত করবার চেষ্টাও করল। এদের সকলের থেকে পৃথক এই শিখ যুবক রণজিৎ। সে ভিক্টোরিয়াকে মানুষ হিসাবেই দেখে, শুধু মেয়ে বলে দেখে না। এই সম্মানটুকু পেয়ে ভিক্টোরিয়া রণজিৎ-এর প্রতি আকৃষ্ট হলো। রণজিৎ কংগ্রেসপন্থী; সে স্বপ্ন দেখে ভারত শীঘ্রই স্বাধীনতা লাভ করবে, স্বাধীনতা পেলে এ দেশ ফুলের মতো ফুটে উঠবে। ভিক্টোরিয়াও এই স্বপ্নের অংশভাগী হতে চায়। স্বাধীন ভারতে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বলে কোন সম্প্রদায় থাকবে না, সব 'ইণ্ডিয়ান' হবে, এই হলো ভিক্টোরিয়ার কামনা।

রেলের ধর্মঘট আরম্ভ হয়েছে। বোম্বাই ও করাচীর নৌ-বিদ্রোহের গুজব ছড়াচ্ছে লোকের মুখে মুখে। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা রেল ধর্মঘটে যোগ দেয়নি, তারা

কাজ করছে এবং সে জন্যই খুব জরুরী কয়েকটা গাড়ী চলাচল সম্ভব। সৈন্য মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও কয়েকটি ট্রেণ দুর্ঘটনা ঘটল এবং এগুলো যে ভবানীতে বসে কে, পি, রায়ই করাচ্ছে সে বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। শোভাযাত্রা, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ, স্থানীয় কংগ্রেস সভাপতির সদলবলে রেল লাইনের উপর শুয়ে গাড়ী চলাচলে বাধা সৃষ্টি করা, জনতা কর্তৃক জেল আক্রমণ প্রভৃতি নানা ঘটনায় ভবানী জংশন উদ্বেল হয়ে উঠেছে। কর্ণেল স্যাভেজ-এর আশঙ্কা হতো ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের বুঝি পুনরভিনয় হবে। এই ভবানীর নিকটেই আছে তার এক পূর্ব পুরুষের সমাধি ; ১৮৫৭ সালের বিপ্লবে মারা গিয়েছিল।

অনেক রাত হয়েছে ; স্টেশন, রেল লাইন সব নির্জন, চারিদিকে একটা থমথমে ভাব। ভিক্টোরিয়া কাজ সেরে বাড়ি যাবে,—মেকলে সঙ্গে এলো এগিয়ে দিতে। এক অন্ধকার কোণে মেকলে ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করল ; কুমতলব বুঝতে পেরে ভিক্টোরিয়া রেল লাইন থেকে একটা লোহার ডাণ্ডা তুলে মেকলের মাথায় উন্মত্তের মতো আঘাত করতে লাগল। মেকলের প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ভিক্টোরিয়ার পোষাক রক্তে লাল, এক মুহূর্তের বিপর্যয়ে সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। ঠিক সে সময় রণজিৎ এসে দাঁড়াল তার পাশে। তাকে নিয়ে গেল তার মার কাছে। রণজিৎ-এর মা কে, পি, রায়ের সমর্থক, রাজনীতিতে চরমপন্থী। একজন বৃটিশকে মেরেছে বলে সে সুখী হলো, এমন ব্যবস্থা করল যে খুনের সকল প্রমাণ লোপ পেয়ে গেল। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে রণজিৎ-এর উপর বেড়ে গেল তার আকর্ষণ। প্রায়ই তাদের বাড়ি বেড়াতে যায়। ক্রমে সে গাউন ছেড়ে শাড়ী পরতে আরম্ভ করল ; রণজিৎকে বিয়ে করবে তাও ঠিক হয়ে গেল। বিয়ের আগে দু'জনে গেল গুরুর কাছে শিখ ধর্মে দীক্ষিত হতে। কিন্তু ভিক্টোরিয়াকে যখন নিজের নাম বদলে নতুন নাম গ্রহণ করতে বলা হলো তখন হঠাৎ কি এক ভাবান্তর ঘটল তার মধ্যে ; সে যেন বিভীষিকার সম্মুখ থেকে ছুটে এলো পাগলের মতো, ধরা দিল কর্ণেল স্যাভেজের বাহুবন্ধনে। স্যাভেজও এতদিনের গাম্ভীর্যের মুখোশ ত্যাগ করে তাকে গ্রহণ করল। তাদের অন্তরঙ্গতা কেন্দ্র করে টেলরের ঈর্ষা নতুন করে জেগে উঠল ; যে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজ রণজিৎকে বিয়ে করবে বলে তাকে একঘরে করেছিল, তারাই এখন ভিক্টোরিয়ার সৌভাগ্য কল্পনা করে চঞ্চল হয়ে উঠল। স্যাভেজ হয়তো তাকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে বিলেতে। এমন সৌভাগ্য ক'জন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ের হয়? স্যাভেজ কিন্তু ক'দিন

পরেই অনুভব করল ভিক্টোরিয়া শুধুই মেয়ে, নারী হয়ে বিকশিত হবার সম্ভাবনা তার নেই। তাই ভিক্টোরিয়াকে শেষ পর্যন্ত অনেক ঘোরালো পথ অতিক্রম করে ফিরে আসতে হলো টেলরের কাছেই। ভিক্টোরিয়া নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখেছিল, কিন্তু রক্তের ইতিহাসকে অস্বীকার করে আদি জননীর ঐতিহ্যের উর্ধ্বে উঠতে পারল না। এখানেই তার ট্র্যাজেডি।

Publishers : Michael Joseph ; London. 12/6

ফুটবল

বল খেলা আজকের নয়। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে কন্দুক ক্রীড়ার কথা উল্লেখ দেখা যায়। অন্যান্য প্রাচীন সমাজেও নিশ্চয় এর প্রচলন ছিল। কিন্তু বর্তমান ফুটবল খেলা যে ইংরেজদের দান সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইংরেজরা যেখানে গেছে সেখানেই ফুটবল প্রচলিত হয়েছে; যেখানে যায়নি সেখানেও ফুটবল গৃহীত হয়েছে। পৃথিবীর সর্বত্র লক্ষ লক্ষ লোক ফুটবল খেলা থেকে আনন্দ পাচ্ছে; অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বর্তমান জগতে ফুটবলের প্রভাব অসামান্য। ফুটবল খেলার নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে অসংখ্য বই লেখা হয়েছে; কিন্তু ফুটবলের সামাজিক মূল্য নিয়ে কোন আলোচনা ছিল না। সুখের বিষয় Morris Marples এই অভাব দুর করেছেন A History of Football লিখে।

খৃস্ট জন্মের তিন শত বৎসর পূর্বে গ্রীস দেশে হারপস্টাম নামে এক প্রকার খেলার প্রচলন ছিল। বর্তমান ফুটবলের সূচনা সেই খেলার মধ্যেই হয়েছিল বলা চলে। গ্রীস থেকে হারপস্টাম খেলা গিয়েছিল রোম-এ; বৃটেন আক্রমণকারী রোমানদের কাছ থেকে ইংরেজরা এই খেলাটি পেয়েছিল। অবশ্য এর মধ্যে হারপস্টাম-এর এতটা রূপান্তর ঘটেছে যে প্রাচীন গ্রীসের খেলার সঙ্গে এর যোগাযোগটা কষ্টকল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়।

কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন যে, ফুটবল খেলা আরো পুরনো। প্রাগৈতিহাসিক যুগের সংস্কারের মধ্যে এর প্রথম জন্ম। বল হলো সূর্যের প্রতিরূপ। সূর্য সকল প্রাণের জনক। সুতরাং আদিম সমাজে বিশ্বাস ছিল যে জমিতে সূর্যের মতো আকার বিশিষ্ট কোনো মন্ত্রপূত বস্তু পুঁতে রাখলে জমি উর্বর হবে। একজন নৃ-বিজ্ঞানী বলেন যে, জমি উর্বর করার জন্য আদিম সমাজে পশু বলি দেবার পর বিচ্ছিন্ন মুণ্ডটা কে নেবে তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত; কারণ মৃত পশুর মাথা মাটির নিচে পুঁতলে জমি উর্বর হবে, এবং এই ধারণা থেকেই ফুটবল খেলার সূচনা।

চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ইংলণ্ডে ফুটবল খেলা জনপ্রিয় হতে আরম্ভ করে। কিন্তু বর্তমান জনপ্রিয়তা অর্জন করতে ফুটবলকে অনেক বাধার মধ্য দিয়ে

আসতে হয়েছে। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে আইন দ্বারা ফুটবল খেলার অধিকার সঙ্কুচিত করা হয়েছিল। ছুটির দিনে, অবসর সময়ে সকলে ফুটবল নিয়ে এমন মেতে উঠত যে গভর্ণমেণ্ট শঙ্কিত হয়ে উঠল। আগে তীরধনুক নিয়ে শিকার করাটা ছিল চিত্তবিনোদনের প্রধান উপায়। তীরধনুক তখন যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র ছিল বলে অবসর বিনোদনের এই অভ্যাসটা যুদ্ধের সময় দেশরক্ষায় সাহায্য করত। ফুটবল নিয়ে মেতে থাকলে লোকে তো তীরধনুকের ব্যবহারটাও ভুলে যাবে। এছাড়া আরো একটা বাস্তব কারণ ছিল। বৃটেনে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত গ্রাম ও শহরের রাজপথে ফুটবল খেলা হতো। তার ফলে জনসাধারণের ছুটির দিনে পথ চলা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ত। এলিজাবেথান যুগে পিউরিটানরা আর একটা কারণে ফুটবলেব বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করল। ছুটির দিনে কোথায় গির্জায় গিয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করবে, তা নয় ফুটবল নিয়ে পথে পথে হুল্লোড়! সুতরাং ধর্ম রক্ষার জন্য ফুটবল বন্ধ করা প্রয়োজন।

কোন বাধাই ফুটবল খেলাকে বন্ধ করতে পারেনি। রাজরোষ, পাদ্রিদেব বিরোধিতা, এবং খেলা উপলক্ষ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও প্রাণহানি,—কিছুই ফুটবলের জনপ্রিয়তা হ্রাস করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। বরং জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। জনপ্রিয়তার প্রধান কাবণ এই যে, ফুটবল খেলার নিয়ম-কানুন সরল ও সহজবোধ্য এবং খেলার ব্যয় খুব কম। অনেকে এক সঙ্গে খেলতে পারে ; তাছাড়া ফুটবল খেলায় যেরূপ ঐক্যবোধ জাগে, এমন আর কোনো খেলাতেই হয় না। ছাত্রদের মধ্যে একসঙ্গে কাজ করবার মনোবৃত্তি জাগরিত করবার জন্য উনবিংশ শতাব্দীতে বৃটেনের স্কুলে ফুটবল খেলার প্রচলন করা হয়। কলকারখানার যুগ আসবার পর লোকে শুধু শনি ও রবিবার দেহ সঞ্চালনেব সুযোগ পায়। ফুটবল খেলার মধ্যে সে সুযোগ যেমন পাওয়া যায় এমন আর কিছুতেই নয়। স্থপতিদের কৌশলে স্টেডিয়াম নির্মিত হয়েছে বলে হাজার হাজার দর্শক খেলা দেখে আনন্দ লাভ করবার সুযোগও পেয়েছে।

ফুটবল অ্যাসোসিয়েশান স্থাপিত হয়ে খেলার নতুন নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করায় ফুটবলের জনপ্রিয়তা বেড়েছে। পৃথিবীর, বিশেষ করে বৃটেনের, আর্থিক ক্ষেত্রেও ফুটবলের প্রভাব কম নয়। শত শত লোক শুধু ফুটবল খেলার রিপোর্ট লিখে জীবিকা নির্বাহ করছে। ফুটবল পুল প্রতিযোগিতায় লক্ষ লক্ষ টাকার লেন-দেন হয়। বৃটেনে পাঁচ লক্ষ লোক নিয়মিত ভাবে ফুটবল খেলে। প্রায়

নয় কোটি লোক খেলা দেখতে যায় এবং প্রতি বৎসর দশ কোটি টাকার অধিক দর্শনী তারা দেয়। ক্রিকেট খেলার দর্শক পঞ্চাশ লক্ষের বেশি হয় না। ফুটবলের নেশা এমন প্রবল যে, অনেকে ছুটি না নিয়ে খেলা দেখতে চলে যায় বলে চাকরি হারায়।

১৯৪৯-৫০ সালে বৃটেনে ৬৯৮০ জন 'প্রফেশানেল' ফুটবল খেলোয়াড় ছিল। যে সব খেলোয়াড়ের বয়স বিশ বৎসর বা তার বেশি তারা মাসিক পাঁচ ছ'শ টাকা বেতন পায়। কিন্তু তাদের খাওয়া, বেড়ানো, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি সকল ব্যাপারে ক্লাবের ম্যানেজারের আজ্ঞাবহ হয়ে থাকতে হয়।

Publishers : Secker & Warburg ; London. 21/-

পূর্বরাগ

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের অন্য সব কিছুর মতো প্রেমের পদ্ধতিও বদলায়। এই পরিবর্তন ভালো কি মন্দ, সে তর্ক করবার প্রয়োজন নেই; তবে একথা বলা যায় যে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। কেননা, আমাদের জীবনে ক্ষুধা ও প্রেম প্রবলতম দুটি অনুভূতি। অন্ন গ্রহণ করে ক্ষুধা তৃপ্ত করা যায়; কিন্তু প্রেমের প্রাণ হলো অতৃপ্তি। প্রেম হৃদয়ের জিনিস বলে জীবনে তার প্রভাব ক্ষুধার চেয়ে গভীর। কাব্যে, উপন্যাসে, নাটকে প্রেম প্রাধান্য লাভ করেছে। সুতরাং জীবনে কোনরূপ পরিবর্তন এলে প্রেমকেও তা স্পর্শ করবে। এই পরিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করবার সামাজিক মূল্য আছে। অথচ এবিষয়ে আলোচনা বড় একটা হয়নি।

প্রেমের মোটামুটি দুটো স্তর। প্রথমটি বিবাহের পূর্ববর্তী; দ্বিতীয়টি পরবর্তী। বিবাহের পূর্ববর্তী প্রেম যুগে যুগে অধিকতর ঔৎসুক্য জাগিয়েছে। সাহিত্যে এই জাতীয় প্রেমেরই প্রাধান্য এবং মানুষের কল্পনা চিরদিন তা আকৃষ্ট করে। ইংরেজীতে একে বলে কোর্টশিপ। বাঙলায় কি বলব? কোর্টশিপ-এর মতো 'পূর্বরাগ' সক্রিয়তাব্যঞ্জক নয়ঃ একটি বিশেষ মানসিক অবস্থা বোঝায় মাত্র। তবু পূর্বরাগ ছাড়া কোর্টশিপের অন্য কোনো সন্তোষজনক প্রতিশব্দও নেই।

পূর্বরাগ মানব সমাজেই নিবদ্ধ নয়। পশু জগতেও পূর্বরাগের খেলা স্বাভাবিক। বিজ্ঞানীরা পশুদের পূর্বরাগ নিয়ে বড় বড় বই লিখেছেন; কিন্তু মানুষের পূর্বরাগ তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। অবশ্য বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রসঙ্গক্রমে পূর্বরাগের স্তুতি গেয়েছেন। তিনি বলেছেন, পূর্বরাগ না থাকলে সহজেই প্রেমে অবসাদ আসবে, জীবন বিস্বাদ হয়ে পড়বে। কিন্তু আজকাল পূর্বরাগের রূপ দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। দীর্ঘকাল ধরে নানা কলা-কৌশলের সাহায্যে মন দেয়া-নেয়ার খেলা একালের ব্যস্ত জীবনে সম্ভব নয়। এখন অনেক ক্ষেত্রেই প্রেম-নিবেদনটা ব্যবসায়ে লেন-দেনের 'পর্যায়ে' নেমে এসেছে। গভীর একনিষ্ঠ ভালোবাসারও অভাব দেখা যায় আজকাল। পূর্বে ভালোবাসা জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করত; এখন ভালোবাসা জীবনের একটি দিক মাত্র।

পঁচিশ ত্রিশ বছর পূর্বেও ইংলণ্ডে যারা আত্মহত্যা করত, তাদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা ছিল হতাশ প্রেমিকদের। এখন সকল দেশেই আত্ম-হত্যাকারীদের মধ্যে ব্যর্থ প্রেমিকদের সংখ্যা প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে। এটা অবশ্য দুঃখের কথা নয়। প্রেম একবার ব্যর্থ হলে জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে, এমন ধারণা আর নেই। একালের তরুণ-তরুণী নতুন আশা নিয়ে নতুন প্রেমের সন্ধান করে। একজনের কাছ থেকে যা পেল না আর একজন তা দিয়ে জীবন পূর্ণ করে দেবে।

সংস্কৃত সাহিত্যে পূর্বরাগ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। নায়ক-নায়িকার চিত্রদর্শন বা গুণকীর্তনে প্রেমের সঞ্চার সে যুগে সম্ভব হলেও এখন তা সম্ভব নয়। আমাদের বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধা-কৃষ্ণের পূর্বরাগ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যাবে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমাদের জীবনে এবং সাহিত্যে প্রেম ও পূর্বরাগ নতুন রূপ লাভ করেছে। অনেক দিন যাবৎ পূর্বরাগ সঞ্চারের জন্য বাঙলা উপন্যাসে নায়িকাকে গুণ্ডার হাতে পড়তে হতো। স্বদেশী যুগে এই গুণ্ডা ছিল মাতাল গোরা সৈন্য। হঠাৎ নায়ক এসে গুণ্ডার কবল থেকে নায়িকাকে রক্ষা করত। তারপর থেকেই প্রেমের জন্ম। নায়িকা হয়তো চলেছে ঘোড়ার গাড়ীতে; হঠাৎ ঘোড়া ক্ষেপে গেল। কোথা থেকে হলো নায়কের আবির্ভাব, রক্ষা করল নায়িকার জীবন। তারপর চায়ের আমন্ত্রণ; চায়ের আসরে শুরু হলো মন দেওয়া-নেওয়ার পালা। সহ-শিক্ষাকেও আমাদের লেখকরা পূর্বরাগ সঞ্চারের সুযোগ বলে গ্রহণ করেছেন। নায়ক-নায়িকার আলাপ হতো পুকুরঘাটে, গৃহ সংলগ্ন উদ্যানে; ক্রমশঃ স্থান পরিবর্তন হলো চায়ের আসরে, বাড়ীর ছাদে এবং প্রায়ান্ধকার সিঁড়ির কোণে। মেয়েরা যখন বাইরে বেরুতে আরম্ভ করল, তখন স্কুল-কলেজের পথে, ট্রামে-বাসে, লেকের ধারে অথবা গড়ের মাঠে স্থান পরিবর্তিত হলো। এখন হয়েছে আপিস, রেস্তরাঁ, সিনেমা ইত্যাদি। বারো তেরো বছরের অপরিচিতা মেয়ের সামনে দাঁড়াতে এক সময় বাঙালী যুবকের বুক দুরু দুরু করত। অথচ এখন মেলামেশার দেখা-শোনার এত সুযোগ পেয়েও প্রেমে পড়বার প্রবণতা কম কেন, তার সামাজিক কারণটা অনুসন্ধানের যোগ্য।

ইংলণ্ড ও আমেরিকায় পূর্বরাগের রূপান্তরের ইতিহাস লিখেছেন E. S. Turner; বইটির নাম A History of Courting. এ ধরণের বই আর চোখে পড়েনি। মানুষের গভীরতম অনুভূতিটির রূপান্তরের ইতিহাস শুধু

চিত্তাকর্ষক নয়, শিক্ষাপ্রদও। কোর্টশিপ শিক্ষা দেবার জন্য য়ুরোপের অনেক ভাষায় বহু বই প্রকাশিত হয়েছে। তবে ইংরেজীতে বোধ হয় সবচেয়ে বেশী। ভিক্টোরীয় যুগে মেয়েদের সাময়িক পত্রিকায় কোর্টশিপ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য একটি নিয়মিত বিভাগ থাকত। দুটি হৃদয় পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য কত বিচিত্র পদ্ধতিই না অবলম্বন করেছে! কত ছল, কত কৌশল, কত সংস্কার! প্রেম নিবেদনের কুটিল পথ বিজ্ঞানের যুগে অনেকটা সহজ হয়েছে। তবু টেলিফোন, টেলিভিশান, সিনেমা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি এযুগে প্রেমকে প্রভবান্বিত করেছে এবং সাহায্যও করেছে। সামাজিক জীবনে প্রেমকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করবার যে সব উপায় বিচারপতি লিণ্ডসে, বারট্রাণ্ড রাসেল এবং মুর তাঁর 'ইউটোপিয়ায়' নির্দেশ করেছেন, টার্ণার তাদেরও আলোচনা করেছেন।

আমাদের দেশের সংবাদপত্রে পাত্র-পাত্রী স্তম্ভের বিজ্ঞাপন বিদেশীদের চোখে পরিহাসের জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে। টার্ণারের বই থেকে দেখা যাবে ইংলণ্ডে এ ধরনের বিজ্ঞাপন বহু পূর্বেই বের হতো। এবং পাত্রীর রূপ বর্ণনায় শালীনতার সীমা অতিক্রম করতে বাধত না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে লণ্ডনের ঘটকরা যেরূপ মারাত্মক ছিল, আমাদের ঘটকদের সম্বন্ধে তা কল্পনাও করতে পারি না। তখন বিবাহযোগ্য কোন লোক পথে বেরুলেই পাদ্রির চেলারা পেছনে লাগত; লোভ দেখাত: "বিয়ে করবেন? ধনী, সুন্দরী মেয়ে আছে।" এই লোভে পড়ে বহু লোক বিয়ে করত ভালো করে খোঁজ-খবর না নিয়ে এবং না ভেবেচিন্তে। এর সামাজিক কুফলটা এতদুর গড়িয়েছিল যে, এরকম হঠাৎ-বিয়ে বন্ধ করবার জন্য পার্লামেণ্টকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল। ইংলণ্ডে বাধা পেয়ে পাদ্রিরা কিছুকাল পর্যন্ত তাদের মক্কেলদের স্কটল্যাণ্ডে নিয়ে বিয়ে দিত।

এ সব তো অতীতের কথা। কোর্টশিপের ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল নয়, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কোর্টশিপ বা পূর্বরাগ অবশ্য চিরদিনই বাধা পেয়ে এসেছে। অভিভাবক মেয়েকে কোনো যুবকের সঙ্গে অনাবশ্যকরূপে ঘনিষ্ঠ হতে দেখলে চিরদিনই বাধা দিয়ে এসেছেন। পার্কে নিরিবিলি বসে একটু ঘনিষ্ঠ হবার জো নেই; পুলিশী শাসন সেখানে উদ্যত হয়ে আছে। পথে-ঘাটে যেখানেই দুটি তরুণ-তরুণীকে দেখা যায় তাদের হাব-ভাব, কথাবার্তা লক্ষ্য করবার জন্য চার-দিকে কৌতূহলী মানুষের অভাব নেই। একটু স্বস্তি নেই, সহস্র রকম বাধা। তবু এই বাধা এবং আরো অনেক বড় বড় বাধা অতিক্রম করেও পুরুষ ও নারী

পরস্পরের প্রতি প্রেম নিবেদন করে এসেছে। সমাজের উপর প্রণয়ীরা অত্যাচারও কম করেনি। ইংলণ্ডে প্রতি বৎসর রেল গাড়ীতে হাজার হাজার বাল্ব নষ্ট হয়। কামরা অন্ধকার করবার জন্য প্রেমিক-যুগল বাল্ব গাড়ীর জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

এখন মানুষের মন বদলে গেছে, জীবন সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটেছে। পূর্বরাগের বিপদ সেখানেই। প্রেম সম্বন্ধে রহস্য ও রোমাঞ্চের মাত্রা উল্লেখযোগ্যরূপে নেমে গেছে, অদূর ভবিষ্যতে হয়তো একটুও অবশিষ্ট থাকবে না। এটা আবিষ্কারের যুগ। যতদিন নর-নারীর আকর্ষণের কারণটা সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত না হবে ততদিন প্রেম কিছু রহস্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। মনো-বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ থেকে আজ আমরা ভালবাসার প্রত্যেকটি ইঙ্গিতের ব্যাখ্যা খুঁজে পাই। বিজ্ঞানীরা দেহকেও নতুন করে আবিষ্কার করেছেন। ডি, এইচ, লরেন্স তাই বলেছেন, The human body is only just coming to real life.

রহস্য ও রোমাঞ্চের যে কুয়াশা প্রেমকে ঘিরে থাকে বিজ্ঞানের আবিষ্কার সে কুয়াশাকে ধীরে ধীরে দূর করে দিচ্ছে। তাছাড়া নর-নারী আজকাল পরস্পরের যত নিকটে এসেছে পূর্বে কখনো তা হয়নি। কিছুকাল পূর্বেও অন্তরাল থেকে চুড়ির টুংটাং একটু শব্দ এসে পুরুষের চিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত করবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এখন চুড়ির অধিকারিণীরা চুড়ি খুলে পুরুষের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে, হয়েছে তাদের কর্ম-সঙ্গিনী। অপরিচয়, অর্ধপরিচয় রহস্য সৃষ্টির যে সুযোগ দেয়, আজ সে সুযোগ আর নেই।

বিয়েটা যে ভবিষ্যতে পরস্পরের সুবিধাজনক সর্তে পর্যবসতি হবে, তার ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে। কম্যুনিস্টপন্থীরা রোমান্স-শূন্য বিবাহকে ত্বরান্বিত করবার জন্য ব্যগ্র বলে কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি সংবাদ থেকে দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। ব্রহ্মদেশের কম্যুনিস্ট পার্টির নিয়ম অনুসারে পার্টির কোন সভ্য 'আমি তোমাকে ভালবাসি,' 'তুমি কি সুন্দর' প্রভৃতি বুর্জোয়া সুলভ ভাবপ্রবণ কথা ব্যবহার করে প্রেম নিবেদন করতে পারবে না। পার্টির অনুমোদিত পদ্ধতি হলো এই: মহিলা সভ্যার নিকট সভ্য গিয়ে বলবে, 'তুমি পার্টির জন্য যেরূপ প্রাণ দিয়ে কাজ করছ তা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি; তোমার সঙ্গে মিলিতভাবে পার্টির কাজ করব, এই আমার ইচ্ছা।' এই প্রেম নিবেদনও পার্টির কার্যকরী সমিতিকে আগে না জানিয়ে করা চলবে না। পার্টি কর্তৃক

নির্দিষ্ট প্রেমসংক্রান্ত নিয়ম-কানুন অগ্রাহ্য করলে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত শাস্তি হতে পারে। জীবনযাত্রা কঠোর হয়ে পড়াটাও কোর্টশিপের মাধুর্য হ্রাসের কারণ। যৌবন-প্রাপ্তির পরও দীর্ঘকাল পর্যন্ত বিবাহের জন্য অপেক্ষা করতে হয় প্রধানতঃ আর্থিক কারণে। দশ-বিশ বৎসর ধরে কঠোর সংগ্রাম করবার পর আমরা প্রায়ই জীবনবিদ্বেষী হয়ে পড়ি, রোমান্সের বাষ্পটুকুও আর অবশিষ্ট থাকে না। সহজ ও সুস্থ উপায়ে ভালবাসার অনুভূতিকে তৃপ্ত করতে না পেরে আমাদের মন এবং দৃষ্টিভঙ্গী বিকৃত হয়ে যায়।

লুই মামফোর্ড তাঁর 'দি কালচার অব সিটিজ' গ্রন্থে বলেছেন যে, বর্তমান নাগরিক সভ্যতা কোর্টশিপের সুযোগ দেয় না। শহরের বাড়িগুলির প্ল্যান এমনভাবে তৈরি যে তরুণ-তরুণীরা ভাব আদান-প্রদানের জন্য একটু নিরিবিলি স্থান খুঁজে পায় না। কলকাতার অধিবাসীদের সেকথা আর বুঝিয়ে বলবার দরকার নেই। বাঙলা প্রেমের সাহিত্যে ছাদের দান উল্লেখযোগ্য। এখন ছাদ বিদায় নিয়েছে প্রেমের কাহিনী থেকে। একটি ছাদের নিচে তো এখন একটি প্রেমার্ত হৃদয় নেই; হয়তো আছে দশ জোড়া। তাই কারো মনোবাসনাই পূর্ণ হবার নয়।

Publishers : Michael Joseph, London. 15/-

শয়তান

মানুষ যেদিন থেকে চিন্তার শক্তি লাভ করেছে, সেদিন থেকেই সে সচেতন হয়েছে ভালো-মন্দ, মঙ্গল-অমঙ্গলের দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ এই দ্বন্দ্বকে রূপ দিয়েছে পাথরে খোদাই বিচিত্র মূর্তির মধ্যে। আদিম মানব-সমাজে এখনো বহু উপকথা প্রচলিত আছে যা থেকে অমঙ্গলের ভয়ঙ্কর রূপটা উপলব্ধি করা যায়। সকল ধর্মেরই প্রথম প্রার্থনা অমঙ্গল হতে মঙ্গলের পথে যাবার, ভালো মন্দের দ্বন্দ্বে জয়লাভ করে জীবনকে শুভকর করবার। কিন্তু অশুভকে জয় করব কি করে? তাকে চোখে দেখা যায় না, তার গতিবিধির হদিস্ নেই। সে আছে আমাদের অন্তরে, অস্থি মজ্জার সঙ্গে মিশে। অন্তরবাসা বলেই সে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শত্রু। আদিম মানুষও একথা বুঝতে পেরেছিল। তাই হিংস্র পশুর সঙ্গে বনে বাস করেও অমঙ্গলের পাপমূর্তি ভুলতে পারেনি; ভয় করেছে।

অন্তরে যার প্রভাব অনুভব করি তার নিরাকার অস্তিত্ব কল্পনা করে সন্তুষ্ট হতে পারি না। দেবতাকে রূপ পরিগ্রহ করতে বাধ্য করি; তেমনি পাপকেও রূপ দেবার চেষ্টা মানুষ করে এসেছে। পাপ ও অমঙ্গলের সবচেয়ে সফল রূপ-কল্পনা শয়তান। অথচ এই শয়তান কথাটি কত আলগাভাবে আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করি। ঘোরতর দুষ্কৃতিকারীকে এবং যে ছেলে দুষ্টুমি করে তাকেও, সমানভাবেই শয়তান আখ্যা দেই। হিব্রু ভাষায় শয়তান (Satan) শব্দের অর্থ প্রতিপক্ষ। ইহুদি, খৃস্টান ও ইসলাম ধর্মে শয়তানকে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। ঈশ্বর সকল মঙ্গলের আধার, তেমনি শয়তানের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করেছে পৃথিবীর সকল পাপ ও অমঙ্গল। শয়তান দেবদূত; একদিন সে ঈশ্বরের সকল শুভ প্রচেষ্টায় প্রধান সাহায্যকারী ছিল; কিন্তু নিজের শক্তি সম্বন্ধে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়ে ক্রমশঃ সে গর্বিত হলো, বিদ্রোহ করল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে। শাস্তিস্বরূপ সে স্বর্গচ্যুত হলো। এর পর থেকে শয়তানের কর্মক্ষেত্র হলো পৃথিবী। তার একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষকে ঐহিক সুখের লোভ দেখিয়ে প্রলুব্ধ করে আত্মার ধ্বংসসাধন করা। এতে ঈশ্বরের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে, আর তার অনুচরের সংখ্যা বাড়বে। শয়তানের পতন হলেও সে অমর, ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী। এই শক্তিকে জগতের মঙ্গলের জন্য প্রয়োগ না করে যা-কিছু

ভালো তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। শয়তানকে এত ভয় তার অতিমানবীয় শক্তির জন্য।

শয়তান যদিও ইহুদি, খৃস্টান ও ইসলাম ধর্মের শাস্ত্রকারদের সৃষ্টি, তবু পৃথিবীর সর্বত্র সে স্থায়ী আসন পেয়েছে। কারণ পাপের এমন সুন্দর রূপকল্পনা আর নেই। আমাদের শাস্ত্রে শয়তানের প্রতিরূপ পাওয়া যাবে না। যম, কল্কি, ভূত, প্রেত, অসুর কেউ শয়তানের মতো ভয়ঙ্কর নয়। ব্রহ্মা তপস্যামগ্ন মহাদেবকে মোহিত করবার জন্য কামদেবকে নিযুক্ত করলেন। কিন্তু আবার ভাবনা হলো, একা কাম পারবে তো? চিন্তিত ব্রহ্মার নিঃশ্বাস বায়ু থেকে জন্ম নিল মহাবলশালী ভীষণাকৃতি জীব; এদের কারো মুখ হাতীর মতো, কারো সিংহের মতো, কারো গাধার মতো; আকারও নানা প্রকার,—অতি দীর্ঘ, অতি খর্ব, অতি স্থুল, অতি কৃশ। কারো এক চোখ, কারো বা তিন। কারো এক রঙ, কারো বহু রঙ। প্রত্যেকে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, মুখে কেবল 'মার কাট' শব্দ। তাই থেকে এদের নাম হলো 'মার'। এরা ব্রহ্মার আদেশে কামদেবের অনুচর হলো। বৌদ্ধশাস্ত্রে 'মার' স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। মার হচ্ছে কাম, অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা; আকাঙ্ক্ষাই নতুন জন্ম গ্রহণের মূল কারণ; সুতরাং নির্বাণের পরিপন্থী এবং বৌদ্ধ ধর্মের শত্রু। বুদ্ধদেব যখন বোধিতরুমূলে যোগমগ্ন ছিলেন তখন মার তাঁকে ছলনা করতে এসে ব্যর্থ হয়। 'ললিতবিস্তরে' বুদ্ধের উপরে মারের আক্রমণের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা জীবন্ত ও ভীতিপ্রদ; শয়তানের এমন ভয়ঙ্কর রূপের তুলনা বেশি নেই। এই বর্ণনার চিত্ররূপ দেখা যায় মধ্য এশিয়ার তুং-হুয়াং গুহার প্রাচীরগাত্রে। মার বৌদ্ধ জগতের সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করেছে। জরথুষ্ট্র প্রবর্তিত প্রাচীন পারসিক ধর্মমত অনুসারে অহ্রিমণ হলো শয়তান। মঙ্গলময় দেবতা অহুরমজদ বারো হাজার বছর ক্রমাগত যুদ্ধ করে অহ্রিমণকে পরাজিত করেছেন।

কিন্তু শয়তান অজেয়; তার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করতে সাহিত্যিকরাও সহায়তা করেছেন। বহু শতাব্দী ধরে শয়তানের চরিত্র সাহিত্যিকদের আকৃষ্ট করেছে। দান্তে, মিলটন, ব্লেক হতে আরম্ভ করে বারট্রাণ্ড রাসেলের গল্প 'স্যাটান ইন দ্য সুবার্বস'এ শয়তানের বিচিত্র রূপ দেখা যায়। ফাউস্ট শয়তানের কাছে ঐহিক সুখের বিনিময়ে আত্মাকে বন্ধক রেখেছিল; এই একটি কাহিনী নিয়ে কত সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে! মার্লো, গ্যেটে, টমাস মান ফাউস্টকে অমর করেছেন। ম্যাতুরিণ এবং বালজাকের মেলমথরূপী শয়তান অভিনব সৃষ্টি;

সাধারণ মানুষের মতো সে প্যারিসের নাগরিক হয়ে জেঁকে বসেছে। ডস্টয়ভেস্কির উপন্যাসে শয়তান প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে। ফরাসী এবং রাশিয়ান সাহিত্যেই শয়তানের আধিপত্য বেশি দেখা যায়। সাহিত্য ছাড়া শিল্পেও শয়তানের প্রভাব কম নয়। বৌদ্ধশিল্পে মার-এর একটি বড় স্থান আছে—বিশেষ করে তিব্বত ও চীনে। সকল দেশের সকল যুগের শিল্পীই পাপের বেদনাবোধ থেকে শয়তান বা তার অন্য কোনো প্রতিরূপকে আঁকতে চেষ্টা করেছেন। আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে পিকাসো শয়তান সম্বন্ধীয় কয়েকটি ছবি এঁকেছেন। বর্তমান জীবন থেকে সাম্য, ঐক্য, আদর্শনিষ্ঠা দূর হয়ে যাওয়ায় পৃথিবীতে যে দানবীয় সভ্যতা সৃষ্টি হয়েছে শিল্পী তাকেই রূপ দিয়েছেন।

সংসারে যদি শয়তানের রাজত্ব, তাহলে ঈশ্বর কোথায় গেলেন? তাঁর দেখা পাওয়া যায় না কেন? যে কথাটা কেউ কেউ চুপি চুপি বলেছিলেন সে কথা হেগেল সর্বপ্রথম স্পষ্ট করে বললেন, ঈশ্বরের মৃত্যু হয়েছে; তাই শয়তানের রাজত্বের অর্থ বোঝা যায়। হেগেল ঈশ্বরের মৃত্যুর কথা বললেও তাঁর ছিল রিসারেকশানের আশা। কিন্তু নীটশের মধ্যে সে আশা নেই। তিনি বলেন, পৃথিবীর বর্তমান অবস্থায় ভগবানের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, আমাদেরও আর প্রয়োজন নেই তাঁকে। ঈশ্বরের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু তাঁর প্রেত-ছায়ার প্রভাব এখনও রয়েছে আমাদের মনে, হয়তো আরো কিছুকাল থাকবে।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তর্ক না তুলেও বলা যায় যে, শয়তানের সঙ্গে আমাদের নিরন্তর সংগ্রাম করতে হয়। সংসারে যে পাপ, অন্যায় ও অমঙ্গল দেখতে পাই তার জন্ম আমাদেরই মনে। এই জন্যই তার সঙ্গে সংগ্রামটা বড় মর্মন্তুদ হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের এই ভীষণতম শত্রুর স্বরূপ কি? Satan নামক সংকলন গ্রন্থ থেকে তা অনেকটা জানা যাবে। বিভিন্ন লেখক শয়তানের বিভিন্ন দিক নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। যদিও এখানে আলোচনা হয়েছে প্রধানতঃ খৃস্টধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে, তথাপি শয়তান সম্বন্ধে সকলের কৌতূহলই বহুল পরিমাণে তৃপ্ত হবে।

Publishers: Sheed & Ward, London. 30/-

আলেয়া

আলবার্তো মোরাভিয়া অল্প সময়ের মধ্যে যেরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন খুব কম লেখকের ভাগ্যেই তা ঘটে। কোনো কোনো সমালোচকের মতে মোরাভিয়ার জনপ্রিয়তার মূলে আছে তাঁর রচনায় যৌনচিত্রের আধিক্য। এই অভিযোগের মধ্যে প্রকৃত কারণের ভগ্নাংশ মাত্র পাওয়া যাবে। যৌনচিত্রকে মূলধন করে এক ধরনের পাঠক আকৃষ্ট করবার কৌশল কোনো কোনো লেখক আয়ত্ত করেছেন। এ সব লেখকের রচনা সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করতে পারে না। মোরাভিয়ার রচনায় যৌনচিত্রের আধিক্য থাকলেও এটাই তাঁর একমাত্র সম্বল নয়। তাঁর রচনার প্রধান গুণ গল্প বলবার সাবলীল ভঙ্গী। ভাষা স্বচ্ছ ও সরল; রচনারীতিকে বৈশিষ্ট্য দান করবার জন্য ভাষার কান মুচড়ে তাকে অস্বাভাবিক করেননি মোরাভিয়া। এ জন্যই গল্পপিপাসু সাধারণ পাঠকের নিকট মোরাভিয়া সহজেই সমাদর লাভ করতে পেরেছেন।

মোরাভিয়ার জন্ম হয়েছে রোম নগরীতে ১৯০৭ সালে। রোমের জীবনই তাঁর সকল কাহিনীর প্রধান উপজীব্য। যৌবনের দ্বন্দ্ব, বারবনিতার প্রেম ও হতাশা, ঈর্ষাপরায়ণ স্বামী, দাম্পত্য কলহ, ব্যর্থ লেখকের বেদনা, ইত্যাদি তাঁর রচনার বিষয়বস্তু। এদের বাস্তবানুগ চিত্র এঁকেছেন মোরাভিয়া। জীবনের বাস্তব ছবি আঁকতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই যৌনচিত্র এসে গেছে। মনোরঞ্জনের সস্তা উপায় হিসাবে যৌনচিত্র আনা হয়নি।

মোরাভিয়ার নবতম উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে A Ghost at Noon নামে। দাম্পত্য জীবনে ভুল বোঝার বিয়োগান্ত কাহিনী বলা হয়েছে এই উপন্যাসে। রোমের তরুণ নাট্যকার রিকার্ডো মল্‌টেনি বিয়ে করেছে এমিলিয়াকে। রিকার্ডোর আয়ের কোনো নিশ্চিত পথ নেই, অত্যন্ত কষ্টে দিন কাটে। ছোট্ট একটি ঘরে স্বামী-স্ত্রী নানা দুঃখের মধ্যে বাস করে। কিন্তু বিয়ের প্রথম দু' বৎসর এসব কষ্ট তাদের একটুও গায়ে লাগেনি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ছিল নিবিড় নিখাদ প্রেম। অর্থাভাবজনিত দুঃখ কষ্ট সে প্রেমে ফাটল ধরাতে পারেনি। হঠাৎ রিকার্ডোর অর্থোপার্জনের একটা সুযোগ এসে গেল। বাত্তিস্তা নামক একজন ধুরন্ধর ফিল্‌ম প্রযোজক রিকার্ডোকে ফিল্‌মের

কাহিনী লেখবার জন্য নিযুক্ত করল। এমিলিয়ার একান্ত আগ্রহ একটি সুন্দর সুসজ্জিত ফ্ল্যাটে সংসার পাতবার। কিছু অগ্রিম টাকা পেয়ে রিকার্ডো একটি ফ্ল্যাট লীজ নিয়ে এমিলিযার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করল। কিন্তু রিকার্ডো বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করল যে, নতুন বাড়িতে এসে এবং আর্থিক সচ্ছলতার মধ্যে থেকেও এমিলিয়ার প্রেম যেন ধীরে ধীরে ফুরিয়ে আসছে। রিকার্ডোর মনে সন্দেহ জাগল। এমিলিয়া তাকে পূর্বের মতো আর কেন ভালবাসে না? বাত্তিস্তার সঙ্গে এমিলিয়ার পরিচয় হয়েছে। কে জানে, তার অজ্ঞাতে সে পরিচয় কতদূর এগিয়েছে! হয়তো ঐ জন্যই এমিলিয়া তাকে অবহেলা করে। কিন্তু কারণটা না জানা পর্যন্ত রিকার্ডোর মনে স্বস্তি নেই। বার বার প্রশ্ন করে একদিন এমিলিযার মুখ থেকেই শুনতে পেল সে তাকে অবজ্ঞা করে; কিন্তু কারণটা কিছুতেই বলল না। রিকার্ডো তবু বার বার পুরনো দিনের নিবিড় প্রেম দাবি করে। এমিলিযার বিরক্তির শেষ নেই, প্রেমহীন দাম্পত্যজীবনে লাভ কি? এর চেয়ে ভালো বিবাহ বিচ্ছেদ।

এই সঙ্কটমুহূর্তে বাত্তিস্তা প্রস্তাব করল ক্যাপ্রির মনোরম শান্ত পরিবেশে রিকার্ডো। স্ক্রিপ্ট তৈরি করলে সুবিধা হবে। রোমের কোলাহলে এ কাজ ভালো হতে পারে না। ক্যাপ্রিতে বাত্তিস্তার বাড়ি আছে। এমিলিযা সঙ্গে যেতে পারে; বাত্তিস্তাও যাবে কযেক দিনের জন্য বেড়াতে। আর যাবে প্রস্তাবিত ফিল্মের ডিরেক্টার। রিকার্ডো ভাবল, মন্দ নয়, নতুন পরিবেশে হযতো এমিলিযা বদলাবে। কিন্তু ক্যাপ্রিতে এসে নিশ্চিত প্রমাণ পেল বাত্তিস্তা এমিলিযার প্রতি আকৃষ্ট। হঠাৎ একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে রিকার্ডো দেখল এমিলিয়া বাত্তিস্তার মোটরে রোম ফিরে গেছে। রিকার্ডোর জন্য রেখে গেছে ছোট্ট একটি চিঠি; লিখেছে, রোমে ফিরে এমিলিয়া স্বাধীনভাবে থাকবে। তবে বাত্তিস্তার সঙ্গে কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা শুনতে পেলেও যেন বিস্মিত না হয়।

রিকার্ডো উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে নৌকা ভাড়া করে সমুদ্রে বেড়াতে বেরিয়ে পড়ল। হঠাৎ সে দেখল এমিলিয়াও সেই নৌকায় বসে আছে। শুধু তাই নয়, রিকার্ডো যেন আবার ফিরে পেয়েছে সেই প্রেমময়ী এমিলিয়াকে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। এমিলিয়া কোথাও নেই, ছিলও না, নৌকায় শুধু রিকার্ডো। পরে রিকার্ডো সংবাদ পেল যে সময় সে এমিলিয়াকে নৌকায় দেখেছিল, প্রায় সে সময়ই রোম যাত্রার পথে এক দুর্ঘটনায় এমিলিয়া মারা গেছে।

কাহিনীর প্রথম অংশে প্রেমমুগ্ধ রিকার্ডোর সন্দেহ, ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, জোর করে ভালোবাসা আদায়ের হাস্যকর চেষ্টা এবং তার বেদনা সুন্দর ফুটেছে। পাঠকের মনে কখনো রিকার্ডোর প্রতি সহানুভূতি, কখনো বা বিতৃষ্ণা জাগে। 'অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে লেখক দাম্পত্য জীবনে দ্বন্দ্বের ছবি এঁকেছেন। অবশ্য তাঁর পূর্ববর্তী উপন্যাস Conjugal Love এর সঙ্গে এই ছবির অনেক স্থানে সাদৃশ্য দেখা যাবে।

এমিলিয়ার আকস্মিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কাহিনী সমাপ্ত করবার কৌশলটাও নাটকীয় মনে হয়। দু'বছর গভীরভাবে ভালবাসবার পর হঠাৎ এমিলিয়া স্বামীকে অবজ্ঞা করতে আরম্ভ করল কেন সে বিষয়ে লেখক কিছু না বলায় নায়িকার চরিত্র অস্বাভাবিক মনে হবে। কিন্তু মোরাভিয়া এই দ্বন্দ্বের কারণ সম্বন্ধে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দিয়েছেন। সেই ইঙ্গিত থেকে এমিলিয়ার চরিত্র বোঝা যেতে পারে। বাত্তিস্তার নতুন ফিলম হবে ইউলিসিসের কাহিনী নিয়ে। রিকার্ডো তার স্ক্রিপ্ট লিখছে। ছবির জার্মাণ ডিরেক্টর ইউলিসিসের কাহিনীর এক নতুন ব্যাখ্যা দিল রিকার্ডোকে। ইউলিসিস হলো সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতীক, পেনিলোপ আদিম মনোবৃত্তির মূর্তিমতী রূপ। বিয়ের পরও সুন্দরী পেনিলোপের প্রণয় প্রার্থীর সংখ্যা কম ছিল না। তারা নানা উপহার নিয়ে আসত, গ্রীসের তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থা অনুসারে সে-সব উপহার গ্রহণ করতে হতো। ইউলিসিস প্রণয়প্রার্থীদের উপেক্ষা করত, হয়তো বা একটু করুণাও। ভাবত, পেনিলোপ আমাকে ভালোবাসে, সে সাধ্বী স্ত্রী, আমার কোনো ভয় নেই। যে বেচারারা ওর ভালোবাসা পেল না তারা যদি দু'টো কথা বলে', কিছু উপহার দিয়ে, একটু আনন্দ পায়, তা পাক্ না। কিন্তু পেনিলোপ স্বামীর এই উদারতায় ক্ষুব্ধ হয়। আদিম মানবসমাজের ঐতিহ্য তার রক্তে। সে দেখতে চায় স্বামী তার প্রণয়প্রার্থীদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠবে, দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করে তাদের হত্যা করবে। সেই রক্তে তৃপ্ত হবে পেনিলোপ। আর এটাই তো পুরুষের মতো কাজ, স্বামীর কর্তব্য। নারীর প্রেম এ রকম বীর্যবান পুরুষদেরই প্রাপ্য। কিন্তু ইউলিসিস অচঞ্চল, শান্ত, ভদ্র। সুতরাং পেনিলোপের মনের গভীর তলদেশে স্বামীর প্রতি বিতৃষ্ণার বীজ উপ্ত হলো। ক্রমে ক্রমে সেই বিতৃষ্ণা অবজ্ঞায় পরিণত হলো, স্বামীর প্রতি প্রেম রইলো না বিন্দুমাত্রও। ইউলিসিস বুঝল না কেন সে স্ত্রীর ভালোবাসা হারিয়েছে; প্রেমহীন সংসারে নিরানন্দ পরিবেশ দুঃসহ হয়ে উঠল। তাই সে চলে গেল ট্রয়ের যুদ্ধে। যুদ্ধ শেষ হবার

পর সবাই বাড়ি ফিরবার জন্য ব্যস্ত ; কিন্তু ইউলিসিসের ব্যস্ততা নেই। যে স্ত্রী ভালোবাসে না, অবজ্ঞা করে, তার সাহচর্যে জীবন কাটানোর চেয়ে বড় বিড়ম্বনা আর কি আছে? ইউলিসিস অনেক ঘুরে, দীর্ঘকাল পরে বাড়ি ফিরল। হয়তো আশা ছিল, পেনিলোপ তার বিলম্ব দেখে অন্য কাউকে বিয়ে করবে। কিন্তু পেনিলোপ পাণিপ্রার্থীদের কাউকে গ্রহণ করেনি। ইউলিসিসকে ভালোবাসে বলে নয়, স্ত্রী হিসাবে নিজের ধর্ম রক্ষার জন্যই দ্বিতীয় বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রেমহীন জীবন এবং যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ইউলিসিসের চরিত্র অনেকটা পরিবর্তিত করেছে। এবার সে স্ত্রীর প্রণয়প্রার্থী-দের হত্যা করতে দ্বিধা করল না। তার ফলে সে ফিরে পেল স্ত্রীর ভালোবাসা ; ফিরে পেল প্রৌঢ়া পেনিলোপের মধ্যে তরুণী নববধূকে।

পেনিলোপের মতো এমিলিয়ার মনেও গোপন আকাঙ্ক্ষা ছিল যে বাত্তিস্তার তার প্রতি অশোভন মনোযোগের বিরুদ্ধে রিকার্ডো প্রতিবাদ করবে, প্রয়োজন হলে তাকে হত্যা করে পৌরুষের পরিচয় দেবে। রিকার্ডো তাকে এগিয়ে দিয়েছে বাত্তিস্তার হাতে। এমিলিয়া তাই স্বামীকে অবজ্ঞা করতে আরম্ভ করেছিল। অবশ্য এই ব্যাখ্যাটা শুধু ইঙ্গিতেই বলা হয়েছে।

Publishers . Secker & Warburg , London 12/6.

দরিদ্রশালা

১৯৫১ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন পার লাগেরকভিস্ট। তাঁর সবচেয়ে বড় সাহিত্যকীর্তি 'বারাব্বাস'। এই জন্যই বাইরে ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁর নাম। কিন্তু স্বদেশে তিনি নাট্যকার হিসাবেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। অবশ্য তাঁর নাটকে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত নেই; ইব্‌সেনের বাস্তবতাও পাওয়া যাবে না, বরং স্ট্রীণ্ডবার্গের নাটক তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর নায়ক-নায়িকারা কাজের চেয়ে কথা বলে বেশি; তাদের গতিবিধি রূপক ও কল্পনার রাজ্যে। এই জন্যই লাগেরকভিস্টের নাটক মঞ্চে ততটা সাফল্য অর্জন করেনি। কিন্তু সুইডেনের বিদগ্ধ সমাজে তাঁর নাটকগুলি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। লাগেরকভিস্ট তাঁর রূপক নাটকগুলিকে সমাজের হীনতা ও নীচতার বিরুদ্ধে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেছেন।

Midsummer Dream in the Work-house লাগেরকভিস্টের একটি নাটকের সদ্য প্রকাশিত ইংরেজী অনুবাদ। তাঁর অন্যান্য নাটকের বৈশিষ্ট্যগুলি এখানেও পাওয়া যাবে। তিন অঙ্কের মাত্র তিপ্পান্ন পৃষ্ঠার বই; ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত নেই বললেই চলে। তবু একটি রূপকের সাহায্যে বর্তমান পৃথিবী সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা সম্ভব হয়েছে।

সুইডেনের মতো প্রচণ্ড শীতের দেশে মিডসামার ডে (২৪শে জুন) জাতীয় আনন্দের দিন। কিন্তু দরিদ্রের আনন্দের অবকাশ নেই। বছরের সব ক'টি দিনই তাদের কাছে এক সুরে বাঁধা, বেদনার সুর। ২৩শে জুন সন্ধ্যাবেলা ওয়ার্ক-হাউস বা দরিদ্রশালার কয়েকটি বিকলাঙ্গ এবং বৃদ্ধ মিডসামার ডে নিয়ে আলোচনা করছে। এদের মধ্যে কেউ বৃদ্ধ, কেউ অন্ধ, কারো নিম্নাঙ্গ অবশ, আবার এক জন বদ্ধ কালা। এরা আগে ধনিকের অর্থ উৎপাদনে সাহায্য করত; মজুর ছিল কল-কারখানা এবং অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রে। কাজ করতে গিয়ে তাদের অঙ্গহানি হয়েছে। এখন এসেছে দরিদ্রশালায়, কিছু কাজ করে দেবার পরিবর্তে আশ্রয় পেয়েছে। এদের মধ্যে একজন হলো জোনাস্; সে অন্ধ। আগে কাজ করত জাহাজে, দৃষ্টি হারিয়ে এসেছে দরিদ্রশালায়। সে অন্ধ হলেও তার কান বড় প্রখর, এবং বাইরের চোখ হারিয়ে সে পেয়েছে মনের চোখ।

তার কল্পনাপ্রবণ মন অনাগত ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে। মিডসামার রাত্রিতেও সে দেখল এমনি একটি স্বপ্ন। আর সেই স্বপ্নের সঙ্গে তার নিজের জীবনের ঘটনাগুলি একাকার হয়ে গেছে। জোনাস স্বপ্নচারী হয়ে এসেছে এক রাজসভায়। সেখানকার আসল রাজাকে এক প্রবঞ্চক যাদুদণ্ডের প্রভাবে সিংহাসনচ্যুত করে রাজ্য অধিকার করে বসেছে। সে যাদুদণ্ড হলো অর্থের প্রলোভন। নতুন রাজার পকেটে টাকা ঝন্‌ঝন্‌ করে ওঠে, আর তারই লোভে ছোটে মেয়েরা। রাণী নিজেও এই লোভের ফাঁদে পা দিয়ে স্বামীকে ভুলেছে। জোনাস যখন জাহাজের চাকরি নিয়ে বিদেশে ঘুরছিল তখন তার স্ত্রীও ঠিক এমনি করে একজন ধনীর প্রলোভনে লুব্ধ হয়ে তাকে ত্যাগ করে গিয়েছিল। রাণী অপূর্ব সুন্দরী ; কিন্তু নতুন রাজার সঙ্গে যোগ দেবার পর থেকে তার হৃদয় পাথরে পরিণত হয়ে গেছে। অন্তরের কাঠিন্য বাহিরের চাকচিক্য থেকে বোঝবার উপায় নেই। এক ভয়ঙ্কর ড্রাগনের নাগপাশের চাপে সকল মানুষের মন পাষাণ হয়ে গেছে। সেই ড্রাগনকে হত্যা করবার সংকল্প নিয়ে জোনাস গিয়ে উপস্থিত হল রাজসভায়। জোনাস প্রতারক রাজাকে আহ্বান করে বলল, সিংহাসনে বসবার অধিকার তোমার নেই ; তুমি চুরি করে অর্থ সঞ্চয় করেছ। রাজা হবার মালিক আমরা।

নাটকের রূপকটির মধ্য দিয়ে লাগেরকভিস্ট বলতে চেয়েছেন যে, আজকের পৃথিবী একটা দরিদ্রশালার মতো। অর্থ উপার্জনের অন্ধ উন্মত্ততায় আমাদের দেহ ও মন বিকলাঙ্গ হয়ে পড়েছে। তার জন্য দায়ী মুষ্টিমেয় ধনিক, যারা টাকার লোভ দেখিয়ে আমাদের কিনে রেখেছে। ধনিকদের হাতে যে টাকা, সে টাকায় তাদের অধিকার নেই। অর্থের যাদুদণ্ড দিয়ে কৌশলে তারা পৃথিবীর উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে ; অথচ রাজ্যের প্রকৃত মালিক হলো দরিদ্রশালার অধিবাসীরা, অর্থাৎ সাধারণ লোক। বিজ্ঞান আমাদের জীবনের বহিরঙ্গকে চাকচিক্যময় করেছে, কিন্তু মানুষের মন, বিশেষ করে ক্ষমতাধরদের হৃদয় পাষাণে পরিণত হয়ে গেছে। প্রস্তরীভূত হৃদয়গুলি বিগলিত করবার জন্য জোনাসের মতো কোনো নির্ভীক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বীরের প্রয়োজন। জোনাসের স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়, সে জেগে ওঠে দরিদ্রশালার নিষ্ঠুর বাস্তব পরিবেশে ; নাটকের যবনিকা পড়ে ; তবু মনে এমন এক পৃথিবীর আশ্বাস জেগে থাকে যেখানে আনন্দ ও প্রেম প্রাধান্য লাভ করবে।

Publishers : Wm. Hodge ; London. 5/-

লাগেরকভিস্টের গল্প

লাগেরকভিস্টের নতুন গল্প-সঙ্কলন The Marriage Feast and Other Stories বেরুলো। গত ত্রিশ বছরে পার লাগেরকভিস্ট যে সব গল্প লিখেছেন তাদের মধ্য থেকে উনিশটি গল্প নির্বাচন করে এই সঙ্কলনটি প্রকাশ করা হয়েছে। লাগেরকভিস্ট বাস্তবধর্মী লেখক নন, জীবনের একটি রসমণ্ডিত ছবি আঁকবার জন্যই তিনি গল্প বলেন না ; তাঁর গল্পের পশ্চাতে বিশেষ একটি বক্তব্য থাকে ; এই বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করে বলবার জন্যই তিনি গল্পের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বর্তমান সমাজে অর্থের প্রতি অন্ধ আসক্তি, যুদ্ধলিপ্সা, নীতি-হীনতা প্রভৃতি যে সব ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে গল্পের সাহায্যে তিনি তাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর অধিকাংশ গল্পই পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীর মতো সংক্ষিপ্ত ও সরল ; কিন্তু এদের অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গ মর্মস্পর্শী। এই ব্যঙ্গের উৎস মানুষের প্রতি দরদ, তাই গল্পগুলি সহজেই রসোত্তীর্ণ হতে পেরেছে।

দু' পৃষ্ঠার গল্প A Hero's Death-এর মধ্যে অর্থলিপ্সা মানুষকে যে কত নৃশংস করে তুলেছে তারই মর্মান্তিক চিত্র পাওয়া যায়। এক যুবক শহরের গির্জার চূড়ার উপর থেকে মাথা নিচের দিকে দিয়ে লাফিয়ে পড়ে প্রাণত্যাগ করবে। যুবক এর জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা পাবে। এই মৃত্যুর দৃশ্য দেখিয়ে শহরের লোকদের আনন্দ দেবার ভার নিয়েছে একটি বিশেষ কোম্পানী। তারাই টিকিট বিক্রি করে তামাসা দেখাবার আয়োজন করেছে। টিকিট কেনবার জন্য সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। যুবকের সম্বন্ধে কৌতূহলের শেষ নেই। এতদিন যার নাম কেউ শোনেনি এখন কাগজে তার ছবি বেরুচ্ছে ; তার জীবনী, দৈনন্দিন জীবন যাত্রা সম্বন্ধে খুঁটিনাটি খবর ইত্যাদি ফলাও করে সংবাদপত্রে বেরুতে লাগল। বাড়িতে, রেস্তরাঁয়, আপিসে, ট্রামে-বাসে সর্বত্রই এই নিয়ে আলোচনা। তামাসার দিন গির্জার চারদিক জনসমুদ্রে পরিণত হলো। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে খেলা শেষ হয়ে গেল। চূড়া থেকে পড়ে যুবকের মাথাটা চূর্ণ হয়ে গেছে, হাত-পা থেঁৎলে গেছে। যারা চড়া দাম দিয়ে টিকিট কিনে তামাসা দেখতে এসেছিল তারা বাড়ি ফিরল এই প্রশ্ন নিয়ে : 'এমনি করে প্রাণ দিয়ে লাভ কি ?'

The Lift that Went Down into Hell মনে দাগ কেটে যাবার মতো একটি রূপক গল্প। ধনী ব্যবসায়ী মিঃ স্মিথ শহরের সেরা হোটেলের ছাদের উপর একটি মেয়েকে নিয়ে এসেছে সন্ধ্যাটা স্ফূর্তিতে কাটাবে বলে। মেয়েটি স্বামীর নিষেধ অগ্রাহ্য করে বাড়ি থেকে চলে এসেছে। তারা-ভরা আকাশের নিচে দামী সুরার নেশায় চমৎকার কাটল সন্ধ্যাটা। রাতটাও একসঙ্গে কাটাবার সঙ্কল্প করে তারা ছাদ থেকে নামবার জন্য লিফ্‌টে চড়ল। নিঃশব্দ নরম গতিতে লিফ্‌ট নামছে। লিফ্‌টের সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে তাদের সান্নিধ্য নিবিড় হলো। যখনি তারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করছে বা চুম্বন করছে, তখনি লেখক ধুয়ার মতো 'the lift went down' কথা ক'টি ব্যবহার করায় পাঠক এই ইঙ্গিত পাবে যে, শুধু লিফ্‌টই নামছে না, দু'টি মানুষও নিচে নেমে যাচ্ছে।

হঠাৎ ওদের খেয়াল হলো অনেক সময় পার হয়ে গেল, লিফ্‌ট তবু থামছে না। বাইরে ঘন অন্ধকার; তার মধ্য দিয়ে অবিরাম গতিতে লিফ্‌ট নামছে। লিফ্‌ট থামল এসে একেবারে নরকের দুয়ারে। শয়তান সেলাম করে অভ্যর্থনা জানাল। ওরা দু'জন প্রথম তো ভয়ে হতবাক হয়ে পড়ল। কিন্তু শয়তান আশ্বাস দিয়ে বলল, 'নরক আজকাল আগের মতো নেই, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এখন কাউকে শারীরিক যন্ত্রণা দেওয়া হয় না। যাই হোক, আপনারা তো শুধু রাতটা থাকবার জন্যই এসেছেন? সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি, কোনো অসুবিধা হবে না।'

ওদের একটা আলাদা ঘর ঠিক করে দেওয়া হলো। অনেক দিনের নিষিদ্ধ আশা যখন পূর্ণ হতে চলেছে তখন ওদের ঘরে একটি ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে প্রবেশ করল মদের গ্লাস নিয়ে। মেয়েটি চমকে উঠল। এ তো তার স্বামী! কপালে একটা গভীর ক্ষত। বুঝতে বাকি রইলো না স্ত্রীর ব্যবহারে মর্মাহত হয়ে রিভলভারের গুলীতে আত্মহত্যা করেছে তার স্বামী। মেয়েটি এই দৃশ্য সইতে পারল না; ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো। শয়তান বলেছিল এখন নরকে শারীরিক যন্ত্রণা দেওয়া হয় না, কিন্তু ভোগ করতে হয় মানসিক যন্ত্রণা। মেয়েটি সেই যন্ত্রণা ভোগ করছে; মানসিক যন্ত্রণাভোগ ও অনুশোচনার ফলে সে আবার উপরে ওঠবার অধিকার পেল। এবার লিফ্‌ট তাদের নিয়ে উপরে উঠতে লাগল।

এমনি করে প্রত্যেকটি গল্পই ইঙ্গিতময় এবং রূপকধর্মী। শুধু প্রথম গল্প

Marriage Feast নিছক গল্প হিসাবে পড়া যায়। হোটেলের বেয়ারা স্যামুয়েলসন ও ফ্রিডার বিয়ে। বিয়ের দিনটি ওদের কেমন কেটেছে তারই চিত্র। ফ্রিডা ছোট্ট একটি দোকান করে কিছু টাকা জমিয়েছে, তারই জোরে বিয়ে করবার সাহস পেয়েছে। বিয়ের বয়স দু'জনেরই পার হয়ে গেছে অনেক দিন ; দেখতেও অত্যন্ত সাধারণ, হয়তো কুৎসিত। স্যামুয়েলসনকে কোনো মেয়ে আমল দেয়নি ; তাই ফ্রিডা যখন তার কাছে এসে বিয়ের প্রস্তাব করল তখন সে বিস্মিত হয়ে গেল। আজ বিয়ের দিনে মনে হচ্ছে যেন একটা রূপকথা সত্য হতে চলেছে। স্বপ্ন সফল হবার আনন্দ আছে, কিন্তু আশঙ্কাও যায় না মন থেকে। যদি শেষ মুহূর্তে কোনো বাধা আসে ? ফ্রিডা বধূবেশ পরছে, কিন্তু মনে কেবল উৎকণ্ঠা। পাদ্রি ঠিক সময় মতো আসবেন তো ? বিয়ের কেক এসে পৌঁছেছে তো ? অতিথিদের সমাদর হচ্ছে কি ? বিয়ের পরে বাসর ঘরে স্বামীকে প্রথম চুম্বন দিতে গিয়ে ফ্রিডার বাঁধানো দাঁত খুলে গেল। তবু তারা দুজনে নবজন্ম লাভ করেছে ; এই নতুন জীবনের রোমাঞ্চকর মধুর অনুভূতি ছিল তাদের কল্পনারও অতীত। গল্পটি লাগেরকভিস্টের একটি সার্থক সৃষ্টি।

Publishers : Chatto & Windus ; London. 12/6.

য়ুরোপ-আমেরিকার ডাক্তাররা একালের রোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেই তৃপ্ত নন। ইতিহাসের পাতা থেকে তাঁরা বিবিধ রোগের বিবরণ সংগ্রহ করে গবেষণা করেন। মিশরের মমি পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয়ের চেষ্টাও তাঁরা করেছেন। ক্ষয়রোগের জন্য আমরা বর্তমান সভ্যতাকে দায়ী করি। কিন্তু প্রাচীন যুগের মমির মধ্যেও নাকি ক্ষয়রোগের চিহ্ন পাওয়া গেছে। মোনালিসার যে রহস্যময় হাসি কত কবি ও শিল্পীকে প্রেরণা দিয়েছে, একজন ডাক্তার বলেছেন সে হাসির মধ্যে কোনো রহস্য নেই। আসলে মোনালিসার কোনো এক রকম দাঁতের যন্ত্রণা ছিল। যন্ত্রণা সত্ত্বেও শিল্পীর সামনে মডেল হয়ে দাঁড়িয়ে সে জোর করে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করত। অ্যানাটমির নির্ভুল প্রমাণ থেকে নাকি মোনালিসার রহস্যময়তা অনায়াসে ভেদ করা যায়।

মানুষের কল্যাণের জন্য রোগ সম্বন্ধে গবেষণার প্রয়োজন। শুধু একালের রোগ সম্বন্ধে নয়, অতীতেরও। প্রাচীন কালের রোগ সম্বন্ধে সামান্য বিবরণই পাওয়া যায়। ইতিহাসে অন্য অনেক কথা আছে, রোগের কথা বড় একটা নেই। মহামারী ইত্যাদি দেখা দিলে তার উল্লেখমাত্র থাকে। রোগের লক্ষণ ও ক্রমপরিণতির বিবরণ জানা যায় না। রাগ একটি বিশেষ ব্যক্তিকে আশ্রয় করে বিকাশ লাভ করে। সুতরাং সেই ব্যক্তির জীবনকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানতে পারলে রোগের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবে।

কিন্তু সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠাপন্ন লোকদেরই জীবনী রচিত হয় এবং এঁদের জীবনীতে অনেক তুচ্ছ বিবরণ দেওয়া হলেও রোগের কথাটা সাধারণতঃ ভালো করে বলা হয় না। অথচ ব্যক্তির জীবনে পরিবার সমাজ ইত্যাদির যতটা প্রভাব রোগের প্রভাব তার চেয়ে বেশি।

বিখ্যাত লোকদের রোগ ও মৃত্যুর বর্ণনা যতটুকু সংগ্রহ করা গেছে তার উপর নির্ভর করে কিছু কিছু গবেষণা হয়েছে। বুদ্ধদেব কোন্ রোগে পরলোক-গমন করছেন সে বিষয়ে ওদেশে যে কিছু কিছু গবেষণা হয়েছে তা এতদিন আমরা কিছুই জানতে পারিনি। তেত্রিশ জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির রোগ ও মৃত্যু সম্বন্ধে

যে সব অনুসন্ধান হয়েছে তাদের সঙ্কলন করে ফিলিপ-মার্শাল ডেল্ লিখেছেন, "Medical Biographies."

প্রথমেই আছে বুদ্ধের মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা। মহাপরিনির্বাণ সূত্রে বুদ্ধের মৃত্যুর পূর্ববর্তী তিন মাসের ঘটনাবলীর বিস্তৃত বিবরণ থাকায় অনুসন্ধানে সুবিধা হয়েছে। বুদ্ধদেবের প্রথম জীবন কেটেছে ভোগ ও বিলাসের মধ্যে। গৃহত্যাগ করে তিনি আরম্ভ করলেন কঠোর তপস্যা। দীর্ঘ ছ'বছর শুধু ফল-মূল খেয়ে তাঁর দিন কেটেছে। তাঁর খাদ্যে প্রোটিনের কোনো অংশই ছিল না বলা যেতে পারে। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর তিনি ভিক্ষুদের উপযোগী পরিমিত আহার আরম্ভ করলেন। তখন থেকে তাঁর স্বাস্থ্য ভালোই ছিল। তবু প্রথম জীবনে অপরিমিত ভোগবিলাস এবং পরবর্তী জীবনের কঠোরতার ফলে পরিপাক যন্ত্রের ক্রিয়া যে সুস্থ ছিল না একথা অনুমান করা যেতে পারে।

বুদ্ধের মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব থেকে তাঁর গৃহী ভক্তরা নানা স্থানে উৎসব ও ভোজের আয়োজন করতে লাগল। পাছে ভক্তরা ক্ষুণ্ণ হয়, এজন্য তিনি এসব উৎসবে যোগদান করতেন। বৈশালী নগরে বুদ্ধদেব অম্বপালী গণিকার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। অম্বপালী বুদ্ধদেব ও তাঁর অনুচরবর্গকে প্রচুর ভোজে আপ্যায়িত করে। যে আম্রবনে উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল বুদ্ধের সেবায় অম্বপালী পরে তা উৎসর্গ করে দেয়।

অম্বপালীর প্রদত্ত ভোজ বুদ্ধদেবের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছিল। তিনি বৈশালীর নিকটবর্তী এক গ্রামে এসে গুরুতররূপে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর রোগ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। কিছুদিন বিশ্রামের পর একটু সুস্থ হয়ে বুদ্ধ কুশীনগর যাত্রা করেন। কুশীনগরের পথে বুদ্ধদেবকে 'পাবা' গ্রামে চুন্দ নামক একজন কর্মকারের আতিথ্য গ্রহণ করতে হয়। চুন্দ বুদ্ধ ও তাঁর অনুচর ভিক্ষুদের জন্য পোলাও, শূকরমাদ্দব, ইত্যাদি মুখরোচক খাদ্যের আয়োজন করেছে। শূকরমাদ্দব শূকরমাংস দিয়ে প্রস্তুত ব্যঞ্জন। চুন্দকে সন্তুষ্ট করার জন্য বুদ্ধদেব শূকরমাদ্দব গ্রহণ করলেন। কিন্তু খাবার পরই তাঁর শরীর অস্বস্তিতে পূর্ণ হয়ে গেল। চুন্দকে তিনি আদেশ করলেন শূকরমাদ্দব যা এখনো বাকি আছে তা মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে। কারণ, এ খাদ্য কারো পক্ষে সহজে পরিপাক করা সম্ভব হবে না।

খাবার পর থেকেই বুদ্ধদেবের তীব্র যন্ত্রণা আরম্ভ হলো ; শরীর পড়ল দুর্বল হয়ে। আর আরম্ভ হলো রক্তপাত। কোথা থেকে রক্তপাত হয়েছে তা

স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা না থাকলেও অনুমান করা কঠিন নয় যে, রক্ত পড়েছে পেটের ভিতর থেকেই। তাঁর অসুখের সংবাদে চুন্দ হয়তো অপ্রতিভ হবে, উৎসবের সকল আয়োজন পণ্ড হবে,—এই সব ভেবে বুদ্ধদেব তাঁর একান্তসচিব আনন্দকে নিয়ে কুশীনগর অভিমুখে যাত্রা করলেন। শিষ্যদের বলে গেলেন, আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি, তোমরা পরে এসো।

কিন্তু সেই অসুস্থ শরীরে বেশি দুর যাওয়া সম্ভব হলো না। একটু গিয়েই দেহ অবসন্ন হয়ে পড়ল। গাছের নিচে উত্তরীয় পেতে বুদ্ধদেব শুয়ে পড়লেন। অত্যন্ত তৃষ্ণা পেয়েছে, আনন্দকে বললেন জল আনতে। অল্প দূরেই ককুত্থা নদী। আনন্দ জল আনতে গেলেন। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে। জল না আসা পর্যন্ত বুদ্ধদেব তিনবার 'জল' 'জল' বলে চীৎকার করে উঠলেন। জল পান করবার পর ক্রমশঃ তাঁর শরীর সুস্থ হলো। ভালো হয়ে গেছেন মনে করে আবার যাত্রা করলেন কুশীনগরের পথে। কিন্তু বেশি দুর যাওয়া সম্ভব হলো না। পুনরায় তিনি গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়লেন। তাঁর চারদিকে গ্রামবাসীরা এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। ডান পাশে কাত হয়ে বুদ্ধদেব তাঁদের ধর্মোপদেশ দিতে লাগলেন ধীরে ধীরে। এখন বেদনার চিহ্ন নেই। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁর দুর্বলতা যে বাড়ছে তা স্পষ্টই দেখা যায়। উপদেশ দিতে দিতে শান্ত পরিবেশে বুদ্ধদেব নির্বাণ লাভ করলেন। তাঁর মুখের উপর গভীর প্রশান্তির ছাপ; কোথাও বিন্দুমাত্র যন্ত্রণার চিহ্ন নেই।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করতে হলে প্রধানতঃ এই কটি লক্ষণের কথা মনে রাখতে হবে: (১) গুরু ভোজনের পর আকস্মিক অসুস্থতা; (২) রক্তপাত; (৩) প্রবল তৃষ্ণা; (৪) মৃত্যুর সময় কোন প্রকার বেদনার অভাব।

রক্তপাত সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ পাওয়া না গেলেও বুঝা যায় যে, মস্তিষ্কের কোন শিরা ছিঁড়ে রক্তপাত হয়নি। তাহ'লে শরীরের কোন কোন অংশ অবশ হবার লক্ষণ দেখা দিত এবং স্বাভাবিকভাবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কথাবার্তা বলাও সম্ভব হতো না। রোগলক্ষণ বিচার করে মনে হয় বুদ্ধদেবের ডিওডেনাম অঞ্চলে গভীর ক্ষত ছিল। ক্ষতের নিকটবর্তী একটি শিরা গুরুভোজনের উত্তেজনায় ফেটে প্রচুর রক্তপাত আরম্ভ হয়। হাঁটবার সময় রক্তপাত বৃদ্ধি হওয়ায় দুর্বল হয়ে পড়তেন। শুয়ে বিশ্রাম করলে রক্তপড়া বন্ধ থাকত। তাই শেষ মুহূর্তে তিনি দুর্বল হয়ে পড়লেও বেদনা বোধ করেননি।

ক্রিস্টোফার কলাম্বাস দ্বিতীয়বার আমেরিকা অভিযানে বেরিয়ে পাঁচ মাস যাবৎ জ্বরে অচৈতন্য হয়ে ছিলেন। কারো কারো অভিমত যে, তাঁর টাইফয়েড জাতীয় কোন জ্বর হয়েছিল। কলাম্বাস তৃতীয় অভিযানেও জ্বর ও বেদনায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। তাঁর সঙ্গীরা একে বাত বলে উল্লেখ করলেও প্রকৃত রোগ তা ছিল না। চতুর্থ অভিযানে কলাম্বাস আরথ্রাইটিসে আক্রান্ত হন। প্রায় অচল অবস্থায় তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। হৃদ্‌পিণ্ডের বাত তাঁর মৃত্যুর কারণ।

বিখ্যাত ইংরেজ লেখক ডীন সুইফট সারা জীবন নানা রোগে ভুগেছেন। রোগগ্রস্ত অসহায় লোকদের যে কী কষ্ট তা তিনি ভালো করেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই মৃত্যুর পূর্বে সুইফট তাঁর সম্পত্তি দিয়ে গেছেন পাগল ও জড়বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের জন্য হাসপাতাল করতে। সুইফট নিজে মস্তিষ্কের রোগে মারা গেছেন।

দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট-এর স্বাস্থ্য বরাবরই খারাপ ছিল। স্বাস্থ্যহীনতার জন্য তিনি বিয়ে করেননি। স্বাস্থ্য যাতে ভালো থাকে তার জন্য কাণ্ট-এর যত্নের বিরাম ছিল না। মোজা আট্‌কাবার জন্য বন্ধনী ব্যবহার করলে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যেতে পারে আশঙ্কায় তিনি অনেক ভেবে চিন্তে মোজা পরবার এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। এত সাবধান থেকেও অনেক কষ্ট পেয়ে তাঁকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে।

বিশ্ববিখ্যাত বীর নেপোলিয়ন কখনো ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন না। প্রথম দিকে তাঁর ঘুরে ঘুরেই জ্বর হতো,—বোধ হয় ম্যালেরিয়া। সিস্টাইটিস্, খোসপাঁচড়া ইত্যাদিও ছিল। নেপোলিয়নের আহারে বিন্দুমাত্র রুচি ছিল না। তেতো ওষুধের মতো সামান্য কিছু খেতেন শুধু বাঁচবার জন্য। মাঝে মাঝে সেই সামান্য খাবার খেয়েও পেটে এমন তীব্র বেদনা উঠত যে, তিনি মেজেতে শুয়ে গড়াগড়ি করতেন। রাশিয়া অভিযানের সময় তাঁর পা ফুলত। যকৃতের বিকৃতির লক্ষণ। ইংরেজরা তাঁকে সেণ্ট হেলেনায় বন্দী করে রাখল। সেণ্ট হেলেনার স্বাস্থ্য কখনো ভালো ছিল না। মারাত্মক আমাশার জন্য সবাই তখন সেণ্ট হেলেনাকে ভয় করত। চিকিৎসার অবহেলা ও অন্যান্য কারণে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় নেপোলিয়নের মৃত্যু হলো। মৃত্যুর পরে শব ব্যবচ্ছেদ করে তাঁর মূত্রাশয় থেকে পাথর পাওয়া গিয়েছিল। নেপোলিয়নের রোগ লক্ষণ ইত্যাদি মিলিয়ে একজন বিখ্যাত বৃটিশ চিকিৎসক

বলেছেন যে, দীর্ঘকালের ক্ষত পরিপাকযন্ত্রের কোন এক স্থান ছিদ্র করে দেওয়ায় রক্তপাতের ফলে নেপোলিয়নের মৃত্যু হয়েছে।

কবি বায়রণ গ্রীসের পক্ষ হয়ে লড়াই করতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডাক্তাররা ভাবল, রক্ত দূষিত হয়ে তাঁর জ্বর হয়েছে। সুতরাং তাঁরা দূষিত রক্ত বের করে নিতে লাগলেন। রোগী দুর্বল হয়ে পড়া সত্ত্বেও চিকিৎসকদের শিরা কেটে রক্ত বার করবার আগ্রহে কমতি নেই। এর উপর কপালে বড় বড় জোঁক লাগাবার ব্যবস্থাও ছিল। স্যার রোনাল্ড রস্-এর অভিমত এই যে, বায়রণ কোনো এক মারাত্মক জাতের ম্যালেরিয়া জ্বরে প্রাণ হারিয়েছেন।

গিবন, কীটস্, এডগার অ্যালেন পো, হুইটম্যান, রবার্ট লুই ষ্টিভেন্সন, নিউটন, ডারুইন, মোপাসাঁ প্রভৃতি আরো কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যুকালীন রোগের বর্ণনা আলোচ্য গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। যে সময়কার কথা এখানে পাওয়া যাবে সে সময় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা ছিল না। আর ছিল না বেদনা নিবারক ওষুধ। শুধু মৃত্যুকে অনেকেই ভয় করে না। কিন্তু মৃত্যুকালীন যাতনার আতঙ্কটা মৃত্যুকে ভয়াবহ করে তোলে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে বেদনার আশঙ্কা দূর হয়ে গেলে মৃত্যুর মুহূর্ত অনেক সহজ হবে।

আলোচ্য বই থেকে দেখা যাবে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর, প্রতিভাধর বিশ্ববিখ্যাত লেখক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক প্রভৃতি সকলেই আমাদের মতো রোগ যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। তবু অসুস্থতার অজুহাতে তাঁদের সাধনা বন্ধ রাখেননি। রবার্ট লুই ষ্টিভেন্সন মা'র কাছ থেকে যক্ষ্মারোগ নিয়ে জন্মেছিলেন। তবু তাঁর সাহিত্যকীর্তি পরিমাণে কম নয়। ষ্টিভেন্সন তাঁর সাহিত্য সাধনা সম্বন্ধে বলেছেন :

I have wakened sick and gone to bed weary and I have done my work unflinchingly. I have written in bed and written out of it, written in haemorrhages, written in sickness, written torn by coughing, written when my head swam for weakness ··

এই নিষ্ঠা অনেক ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তিকে প্রেরণা দেবে, সন্দেহ নেই।

Publishers : The Oklahama University Press ; Oklahama 4 oo

মেয়েরা

সম্পর্ক যেখানে গভীর, বিরোধ সেইখানেই তীব্র হয়। মেয়ে-পুরুষের দ্বন্দের কথাটাই ধরা যাক। বাইবেলে বলা হয় যে, আদমের বাঁ দিকের বুকের হাড় থেকেই জন্ম হয়েছিল ইভের। সুতরাং পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের রক্তের সম্পর্ক। তাছাড়া পুরুষ ও মেয়েদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সংসার চলছে। অথচ, মেয়ে-পুরুষে বিরোধের শেষ নেই। মেয়েদের প্রতি পুরুষের বিদ্বেষটা অত্যন্ত স্পষ্ট। পৃথিবীর সাহিত্যে এর অজস্র প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। সংসারের অধিকাংশ দুঃখ-কষ্টের জন্য মেয়েরাই দায়ী। পুরুষরা একথা প্রচার করে করে প্রায় বিশ্বাসে পরিণত করেছে এই ধারণা। ডঃ জনসন বলতেন, লেখার কৌশলটা বিশেষ করে পুরুষের বিদ্যা, তাই মেয়েদের বিরুদ্ধে এত প্রচার হতে পেরেছে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। মেয়েরাও স্বজাতির নিন্দা কম করেনি। কথায় বলে, মেয়েরাই মেয়েদের শত্রু; যেমন বাঙালী বাঙালীর শত্রু, হিন্দুর শত্রু হিন্দু।

নারীবিদ্বেষীরা মেয়েদের বিরুদ্ধে যা যা বলেছেন তা জানলে দু'পক্ষেরই পরস্পরকে জানবার সুবিধা। Justin Kaplan একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করে এ বিষয়ের উপর বইয়ের অভাব দুর করেছেন। বইটির নাম: With Malice Toward Women: a Handbook for Women Haters. জেমস হারবারের আঁকা অনেকগুলি ব্যঙ্গরসাত্মক ছবি বইয়ের মধ্যে দেওয়া হয়েছে।

সকল দেশেই নারীবিদ্বেষের সবচেয়ে বড় কারণ পাওয়া যাবে ধর্ম প্রতিষ্ঠান ও সাধু-সন্ন্যাসীদের নারাবিমুখতার মধ্যে। নিষ্ক্রিয় বিমুখতা নয়। মেয়েদের প্রতি অবিশ্বাস ও সন্দেহ জোর করে প্রচার করা হয়েছে। ধর্মাচরণের পথে মেয়েরা অন্তরায়, তারা নরকের দ্বার, ভগবানের আরাধনা করতে হলে তাদের এড়িয়ে চলতে হবে—এমনি সব ধারণা প্রাচীন হিন্দু, খৃস্টান প্রভৃতি সমাজে প্রচলিত ছিল। নারীর পূজা আর দেবতার পূজা সমার্থক, এরূপ দু'একটি প্রক্ষিপ্ত উক্তি থাকলেও বিদ্বেষটা যে প্রাধান্য লাভ করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সাধারণ লোকে দেখত যাদের ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বলে তারা শ্রদ্ধা করে,

সেই সাধু-সন্ন্যাসীরা নারীসঙ্গ পরিত্যাগ করে চলেন। ধর্ম যার পক্ষে নয়, সমাজ তাকে স্বভাবতঃই ভালো চোখে দেখতে পারে না।

বুদ্ধদেবের সর্বজীবে অসীম করুণা ছিল। তিনিও মেয়েদের একটু সন্দেহের চোখে না দেখে পারেননি। তাই আনন্দ যখন মেয়েদের বৌদ্ধ সঙ্ঘে গ্রহণের প্রস্তাব করলেন তখন তিনি সহজে সম্মতি দেননি। তিনি বলেছিলেন, মেয়েরা বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশ না করলে সহস্র বৎসর যাবৎ বৌদ্ধ ধর্মের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ থাকবে ; তাদের সঙ্ঘে গ্রহণ করলে শীঘ্রই এ ধর্মের পবিত্রতা নষ্ট হবে।

শেষ পর্যন্ত অন্তরঙ্গ অনুচরদের নিরতিশয় আগ্রহে বুদ্ধদেব স্ত্রীলোকদের সঙ্ঘে গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিলেন।

শোপেনহাউয়ারের নারীবিদ্বেষ সুবিদিত। ছেলেবেলায় মা'র কাছ থেকে তাঁকে অমানুষিক অত্যাচার সইতে হয়েছিল বলেই হয়তো পরবর্তী জীবনে তিনি মেয়েদের দু'চোখে দেখতে পারতেন না। শোপেনহাউয়ারের একটি মত ছিল এই যে, মেয়েরা চির-শিশু। তারা হলো big children all their life long. এ জন্যই মেয়েরা শিশুদের ধাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীর কাজ করতে পারে ভালো। মেয়েদের 'ফেয়ার সেক্স' বলবার কারণও তিনি বুঝতে পারেন না। কারণ এরা হলো undersized, narrow-shouldered, broad-hipped, and short-legged race-এর অন্তর্গত। কোনো আর্টের প্রতি এদের সত্যিকার আকর্ষণ নেই। কোনো বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞান নেই। সুতরাং মেয়েদের সুন্দরের জাত বলে চিহ্নিত করবার কারণ কি ?

আর্ল অব চেস্টারফিল্ডও বলেছেন, মেয়েরা হলো বৃহদাকারের শিশু। বার্ক বলেছেন, মেয়েরা এক জাতীয় প্রাণী, তবে উচ্চতম শ্রেণীর নয়। অ্যামব্রোজ বীয়ার্স "দি ডেভিলস ডিকসিনারিতে" স্ত্রীলোকের সংজ্ঞা দিয়েছেন এই : স্ত্রীলোক হচ্ছে এক জাতীয় প্রাণী যারা পুরুষের কাছাকাছি বাস করতে ভালোবাসে এবং সহজে পোষ মানবার বৈশিষ্ট্য তাদের জন্মগত। প্রাচীন প্রাণি-বিজ্ঞানীরা বলেন স্ত্রীলোকেরা নিরীহ জীব ; কিন্তু অধুনিকরা তা স্বীকার করেন না। বর্তমানে এদের গর্জন পূর্ব ধরণা পরিবর্তিত করেছে। এই শিকারী পশুরা গ্রীণল্যাণ্ড থেকে ভারত পর্যন্ত সর্বত্র বিচরণ করে। 'উলফ ম্যান' হতে 'উম্যান' কথা এসেছে বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁদের ধারণা ঠিক নয়। কারণ প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীজাতি বিড়ালের সগোত্র ; কারণ তারা বিড়ালের মতোই সর্বভুক এবং চেষ্টা করলে কথা না বলে কি করে থাকতে হয় তা-ও এদের শেখানো যেতে পারে।

সুইফট মেয়েদের সম্বন্ধে বলেছেন যে, তারা বানর অপেক্ষা এক ধাপ উঁচু স্তরের জীব কিনা সে সম্বন্ধেও তাঁর সন্দেহ আছে। নীটশে আর একজন নারীবিদ্বেষী—তাঁর মতে মেয়েদের চিন্তা শক্তির অভাব আছে। মেয়েরা হাজার হাজার বছর যাবৎ রান্না করছে, অথচ শারীরবিদ্যা (অন্ততঃ শরীরের উপর খাদ্যের প্রভাব) সম্বন্ধে একটি নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারেনি। বাঁধাধরা নিয়মে তারা কাজ করে যায়; সেই কাজ নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা করবার আগ্রহ নেই।

টলস্টয় বিয়ের পরে তাঁর দিনলিপিতে লিখেছিলেন: "এমন অপূর্ব আনন্দ কেউ পায়নি, পাবেও না।" ত্রিশ বৎসর পরে তিনিই বলেছেন: "বিয়ের পরিণাম যে কি ভয়ংকর হতে পারে তা আমার অবস্থা দেখলেই বোঝা যাবে।" স্ত্রীর হাত থেকে পালাবার চেষ্টায় এক রেলওয়ে স্টেশনে শোচনীয় ভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। ক্রুয়েৎজার সোনাটায় মেয়েদের সম্বন্ধে টলস্টয়ের অনেক তীব্র মন্তব্য পাওয়া যাবে।

নারীবিদ্বেষীরা বিয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে না এটাই স্বাভাবিক। ভলটেয়ার বলেছেন, "Marriage is the only adventure open to the cowardly." অ্যারিস্টটলের বন্ধু ও শিষ্য থিওফ্র্যাস্টাস্ বলতেন, বিজ্ঞ ব্যক্তির কখনো বিয়ে করা উচিত নয়, কারণ একই সঙ্গে স্ত্রী ও বইয়ের সেবা করা সম্ভব হতে পারে না। একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য যেমন সুচারুভাবে সংসারের কাজকর্মের ব্যবস্থা করতে পারে মেয়েরা তা পারে না। সুতরাং বিয়ের দরকার কি?

পুরুষরা যতদিন পারে বিয়ে এড়িয়ে চলে, মেয়েরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্বামী সংগ্রহ করতে চায়,—বলেছেন বার্ণার্ড শ'। আর স্বামী সংগ্রহের জন্য রূপসজ্জায় কী প্রাণান্তকর প্রয়াস! রূপসজ্জার সাহায্যে পুরুষদের প্রতারিত করে বিয়ে করবার এমন ব্যাপক ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়েছিল যে, বৃটিশ গভর্ণমেন্টকে তাঁদের নিরীহ, সরলবিশ্বাসী পুরুষ প্রজাদের রক্ষা করবার জন্য এগিয়ে আসতে হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে ১৭৭০ সালে বৃটিশ পার্লামেন্টে একটি আইন পাশ করা হয়। আইনের সারমর্ম এই: কোন স্ত্রীলোক যদি সুগন্ধি দ্রব্য, রঙ, নকল দাঁত, পরচুলা, হাই-হীল জুতা এবং দেহের সৌন্দর্যবর্ধক অন্যান্য সজ্জা ব্যবহার করে সম্রাটের প্রজাকে ভুলিয়ে বিয়ে করে, তাহলে এই অপরাধ ডাইনী-নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে বিচার করা হবে এবং বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে।

কাপ্লান বহু বিখ্যাত লেখক, দার্শনিক প্রভৃতির নারীবিদ্বেষমূলক মন্তব্য,

উদ্ধৃতি, প্রবন্ধ, গল্প প্রভৃতি সংকলন করেছেন। এই সংকলনের উদ্ধৃতি বিচার করলে দেখা যাবে যে, নারীবিদ্বেষের তীব্রতা ধীরে ধীরে কমে আসছে। বর্তমানকালের লেখকদের মধ্যে হেমিংওয়েকে কেউ কেউ নারীবিদ্বেষী বলেন ; কারণ, হেমিংওয়ের নায়িকা হয় নায়ককে ধ্বংস করে, না হয় নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে। কিন্তু পূর্বের মতো তীব্র ও সুস্পষ্ট বিদ্বেষ নেই।

মেয়েদের প্রতি বিদ্বেষের তীব্রতা থেকেই তাদের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। অগ্রাহ্য করবার হলে, পুরুষদের এমন নারীবিদ্বেষ থাকত না। বিদ্বেষটা বিরুদ্ধপক্ষের শক্তির প্রমাণ। নীট্‌শে বলতেন, মেয়েদের কাছে যাবার সময় চাবুক হাতে করে যেও। সে চাবুক যে পুরুষের হাত থেকে খসে গেছে তাতে সন্দেহ নেই।

মেয়েরা ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারে পুরুষের সমকক্ষ হয়ে উঠছে। অন্য দেশে এজন্য মেয়েদের প্রচণ্ড সংগ্রাম করতে হয়েছে। কিন্তু এদেশের মেয়েদের ভাগ্য ভালো ; না চাইতেই তারা এমন অনেক অধিকার পেয়ে গেছে যা পশ্চিমের প্রগতিশীলারাও পায়নি। ইতিহাসে পুনরুক্তি ঘটে। একসময়ে মাতৃতন্ত্র ছিল। ইতিহাসের ধারা অনুসারে হয়তো নারীবিদ্বেষী পুরুষদের পরিহাস করে সেই মাতৃতন্ত্র আবার ফিরে আসবার ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে।

Publishers : W. H. Allen ; London. 12/6.

হে বিষাদ, স্বাগতম্

য়ুরোপ-আমেরিকার সাহিত্যের আসরে গত বছরের সবচেয়ে আলোচিত নাম ছিল Francoise Sagan. মাত্র আঠারো বছর বয়সে প্রথম উপন্যাস Bonjour Tristesse লিখে সে অভূতপূর্ব খ্যাতি লাভ করেছে। মূল ফরাসী সংস্করণ প্রথম বছর বিক্রি হয়েছে দু'লক্ষ কপিরও বেশি। ইংরেজীতে অনুবাদ হয়ে এই উপন্যাসটি পৃথিবীর সর্বত্র সমাদর লাভ করেছে। কাহিনীর সিনেমা ও থিয়েটারের স্বত্ব বিক্রি করে সাগান সাত লক্ষ টাকারও অধিক পেয়েছে।

মাত্র ১৩২ পৃষ্ঠার কাহিনী। অল্প কয়েকটি চরিত্র; উপ-কাহিনীর সংঘাত নেই। যে মুন্সিয়ানার সঙ্গে গল্পটি বলা হয়েছে তা আঠারো বছরের মেয়ের কাছ থেকে আশা করা যায় না। কোথাও কাঁচা হাতের ছাপ পড়েনি। ভাষা ও ভাবের সংযমে এবং চরিত্রচিত্রণের দক্ষতায় লেখিকা বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে।

তিন বছর আগে সেসিল স্কুলের হোস্টেল ছেড়ে বাড়ি এসেছে। বাড়িতে আছেন শুধু বাবা। মা মারা গেছেন অনেক দিন। বিপত্নীক রেমণ্ড অবসর সময় প্যারিসের স্ফূর্তিতে ডুবে থাকে। হোটেল-রেস্তরাঁয় রাত কাটিয়ে তৃপ্তি নেই। বাড়িতেও চাই নারীসঙ্গ। রেমণ্ড তার প্রণয়িনীদের বাড়িতে এনে রাখে। প্রথম সেসিল বাবার এই জীবন যাত্রায় ক্ষুব্ধ হয়েছিল। কিন্তু রেমণ্ডের চরিত্রে এসব ত্রুটি সত্ত্বেও এমন মাধুর্য ছিল যে, তার উপর রাগ করে থাকা অসম্ভব। উদার, আমুদে স্বভাবের জন্য রেমণ্ড সকলকেই আকৃষ্ট করতে পারত। সে নিজের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে যে স্বাধীনতা ভালোবাসত মেয়েকেও সেই স্বাধীনতা দিয়েছে। বাবা ও মেয়ের মধ্যে যে বিষয় নিয়ে ইঙ্গিত করাও রীতিবিরুদ্ধ, তা নিয়ে ওরা খোলাখুলি আলোচনা করত। বাবার নিত্য নতুন প্রণয় সম্বন্ধে ঠাট্টা-তামাসা করতেও সেসিলের বাধত না। প্রথম জীবনে একনিষ্ঠ প্রেমের যে আদর্শ রঙীন স্বপ্নজাল সৃষ্টি করে, বাবার সান্নিধ্যের প্রভাব সেসিলের মনে সে স্বপ্নকে স্থান দেয়নি।

সেবার গ্রীষ্মকালে সেসিল বাবার সঙ্গে সমুদ্রতীরে বেড়াতে এসেছে।

এলসা তাদের সঙ্গিনী। এলসা রেমণ্ডের অধুনাতম প্রণয়িনী। পূর্বেই বলেছি, বাবার স্বভাব এমন আশ্চর্য যে রাগ করে থাকা যায় না। এলসাকে সঙ্গে আনায় সেসিল প্রতিবাদ করবার কথা ভাবতে পর্যন্ত পারেনি। এলসাকে ঘৃণা করবার পরিবর্তে সে তাকে সহজ ভাবে বন্ধুর মতো গ্রহণ করেছে।

সমুদ্রে স্নান করে, পাইন বনে বেড়িয়ে, দিনগুলি আনন্দে কেটে যাচ্ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সিরিলের সঙ্গে সমুদ্রতীরে আলাপ হয়েছে। দু'জনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমুদ্রে সাঁতার কাটে; নৌকা করে বেড়ায়; কখনো বেলাভূমিতে, কখনো বা পাইন বনে পাশাপাশি শুয়ে থাকে। সেসিল এর আগে কখনো প্রেমে পড়েনি; সিরিল তার কুমারী হৃদয়ের ঘুম ভাঙাতে আরম্ভ করেছে। সিরিলের একটু স্পর্শ তার হৃদয় মধুর অস্বস্তিতে পূর্ণ করে রাখে। রাত্রিতে অনেকক্ষণ ঘুম আসে না।

কিন্তু স্বচ্ছন্দগতি জীবনে হঠাৎ যতি পড়ল। রেমণ্ডের আমন্ত্রণে কিছুদিনের জন্য বেড়াতে এলো অ্যান্ লারসেন। অ্যান্ ছিল সেসিলের মার বন্ধু। বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে অনেক দিন আগে। নিজেকে নিয়েই আছে। আর কোন বন্ধন নেই।

বয়স হলেও অ্যানের দেহে ভাঙন ধরেনি। এই প্রৌঢ় বয়সেও তার শক্ত-সমর্থ দেহে এমন এক ধরণের সৌন্দর্য ছিল যা প্রত্যেককেই আকৃষ্ট করত। অ্যানকে সেসিল আগেই দেখেছে। তার চরিত্রে দৃঢ়তার মাত্রা এত বেশি যে তাকে কঠোরতাও বলা যায়। অ্যানের আত্মপ্রত্যয় ও সংযম সেসিলের নিকট বিস্ময়ের বস্তু ছিল। পিতা-পুত্রীর উচ্ছল সংযমহীনতার মূর্তিমতী প্রতিবাদ এই অ্যান্। তাই অ্যানের সামনে সেসিল অস্বস্তি বোধ করে।

অ্যান্ এসে যখন জানতে পারলে এলসা ও বাড়িতেই আছে তখন হঠাৎ তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। অ্যানের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করে সেসিল বিস্মিত হলো। কারণ অ্যানের প্রশান্তি ক্ষুব্ধ হতে এর আগে সে কখনো দেখেনি। সুখ-দুঃখের ছায়া পড়ে না তার মুখে; দৈনন্দিন জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা স্পর্শ করতে পারে না তাকে। তবে আজ সে বিচলিত হলো কেন? এলসাকে ঈর্ষা করে? অ্যান্ কি রেমণ্ডকে ভালোবাসে? সেসিল এই সম্ভাবনায় বিরক্তি বোধ করল।

কিছুদিনের মধ্যেই অ্যান্ বাড়ির কর্তৃত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করল।

সকল দিকে তার দৃষ্টি। সেসিলের খাওয়া, বেড়ানো, পড়া সবকিছুর উপরে অ্যান্ লক্ষ্য রেখেছে। তার মতামত সেসিলের উপর চাপিয়ে দিতে চায়। একদিন পাইন বনে সিরিলের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতাটা অ্যান্ দেখে ফেলল। বাড়ি ফিরে আদেশ করল সিরিলের সঙ্গে আর মেলামেশা করতে পারবে না। সেসিল বলল, আমি ওকে ভালোবাসি।

অ্যান্ অবজ্ঞার হাসি হেসে বলল, ভালোবাসা কাকে বলে তা এখনো তুমি জানো না। এ শুধু যৌবনের মোহ।

নিশ্চিন্ত আলস্যে দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল। অ্যান্ বলল, পড়াশুনা আরম্ভ করে দাও, আগামী পরীক্ষাটা দিতে হবে।

পড়ার ভান করে সেসিল ঘরে বসে থাকে। মাঝে মাঝে পালিয়ে যায় সিরিলের বাড়ি। তীক্ষ্ণবুদ্ধি অ্যানের কাছে এই ফাঁকি ধরা পড়তে দেরি হলো না। একদিন সে সেসিলকে তালা দিয়ে ঘরে বন্দী করে রাখল।

এত বড় নিষ্ঠুরতার অভিজ্ঞতা সেসিল জীবনে পায়নি। সে বাবার আদুরে মেয়ে, যখন যা খুশি করেছে, কোনো বন্ধন ছিল না। অ্যান্ তার মঙ্গলের জন্যই কঠোর হাতে জীবন নিয়ন্ত্রিত করতে চায়। রেমণ্ডের নীরবতা অ্যান্‌কেই সমর্থন করেছে।

বাবাও ধীরে ধীরে অ্যানের সকল ইচ্ছাকে নির্বিচারে মেনে নিচ্ছে। অ্যানের হাতে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে সে যেন সুখেই আছে। সেসিল প্রথম দিনই যে অনুমান করেছিল তা সত্য বলে প্রমাণিত হলো। এখান থেকে প্যারিস ফিরে রেমণ্ড অ্যানকে বিয়ে করবে। বাবাই একদিন তাকে জানালো কথাটা। সেসিল আতঙ্কিত হয়ে উঠল। তা'হলে তো অ্যানের কঠোর শাসনের মধ্যে বন্দী হতে হবে! জীবনের সকল আনন্দ কালো হয়ে গেল এক মুহূর্তে।

এলসা এবার চলে যাবে এ বাড়ি থেকে। অ্যান্ কর্তৃত্ব পেয়েছে; এখন এলসার মতো মেয়েদের আর স্থান হবে না। সেসিল এলসার সঙ্গে পরামর্শ করে একটা প্ল্যান ঠিক করল। এলসা সিরিলদের বাড়ি গিয়ে কিছুদিন থাকবে। সিরিলের সঙ্গে বেড়াবে, প্রেমের অভিনয় করবে। যে পথ দিয়ে রেমণ্ড সাধারণতঃ যাতায়াত করে, তারা দু'জন জোড় বেঁধে সে পথেই ঘোরাঘুরি করবে। সেসিল তার বাবাকে ভালো করেই জানে। ভূতপূর্ব যুবতী প্রণয়িনীকে অন্যের করতলগত দেখে ঈর্ষা জাগবে। রেমণ্ডের মধুকরবৃত্তি প্রৌঢ়া অ্যান্ তৃপ্ত করতে পারবে না। অ্যানের ব্যক্তিত্বের সামনে রেমণ্ড শান্ত হয়ে আছে।

তার সেই প্রকৃত চঞ্চল স্বভাবটা জাগিয়ে দিতে পারলেই অ্যানের প্রভাব দূর হয়ে যাবে। তার মধ্যেই সেসিলের মুক্তি।

এলসা এবং সিরিল সেসিলের প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করতে সম্মত হলো। ওরা দু'জনে রেমণ্ডের পথের উপর এসে পড়ে। সেসিল সঙ্গে থাকলে নতুন প্রেমিকযুগল সম্বন্ধে নানা টিপ্পনি করে বাবাকে শোনায়। বলে, এলসা এবার একজন তরুণ প্রেমিক পেয়েছে, তাই অতো হাসিখুশি। খোঁচাটা রেমণ্ডের আসন্ন বার্ধক্যের প্রতি। সেসিল তার বাবার মেজাজ ভালো করেই জানত; তাই সুযোগ পেলেই মনে করিয়ে দিত যে সিরিল যৌবনের শক্তি দিয়ে এলসাকে কেড়ে নিয়েছে তার কাছ থেকে। কয়েক দিন এমনি ভাবে ক্রমাগত খোঁচা খেয়ে, এবং এলসা ও সিরিলের জ্বালাদায়ক অন্তরঙ্গতা সর্বদা চোখের সামনে দেখে, রেমণ্ড চঞ্চল হয়ে উঠল। এলসার সঙ্গে নিজনে দেখা করবার ব্যবস্থা করে ফেলল রেমণ্ড।

সেদিন বিকেল বেলা সেসিল খবরের কাগজ হাতে বসে বসে ছিল। হঠাৎ দেখল, অ্যান্ নিকটের পাইন বন থেকে ছুটে আসছে। সেসিল চমকে উঠল। অ্যান্ অকস্মাৎ বুড়ো হয়ে গেছে। অনেক কষ্টে সে তার দেহটাকে টেনে আনছে। অ্যান্ বাড়িতে প্রবেশ করল না। গ্যারেজ খুলে গাড়ীতে উঠে বসল। সেসিল ছুটে এলো। দেখল, অ্যানের দু'গাল বেয়ে চোখের জল পড়ছে। অ্যান্ হৃদয়হীনা নয়; সে যে একটি অনুভূতিপ্রবণ নারীহৃদয়কে আঘাত দিয়েছে তা এই প্রথম উপলব্ধি করল। সেসিলের বুঝতে বাকি রইলো না কি ঘটেছে। ওই পাইন বনে অ্যান্ হয়তো দেখে ফেলেছে রেমণ্ড ও সেসিলের অশোভন ঘনিষ্ঠতা: আর এই নিষ্ঠুর দৃশ্যের পটভূমিকা রচনা করে দিয়েছে সেসিল নিজে। আজ এক মুহূর্তে সে অ্যানের যে পরিচয় পেল তা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। সেসিলের মনে হলো অ্যানও একদিন বালিকা ছিল, তারপরে যৌবনে পা দিয়েছে, নারীত্ব লাভ করেছে পরিণত বয়সে। চল্লিশ বৎসর বয়সে হয়তো নিঃসঙ্গতার আতঙ্ক তাকে পেয়ে বসেছিল। তাই রেমণ্ডকে বিয়ে করে জীবনের বাকী দশ-বিশ বছর সুখ ও শান্তিতে কাটাবার আকাঙ্ক্ষা করেছিল। সেসিল নির্বোধ ছেলেমানুষী করে চূর্ণ করে দিল সেই আশা।

ইঞ্জিন সচল হয়েছে। সেসিল ব্যাকুল হয়ে বলল, তোমাকে আমরা চাই, তুমি যেও না।

অ্যান্ বলল, আমাকে কেউ চায় না। তুমিও না, তোমার বাবাও না।

আমাকে ক্ষমা করো।

ক্ষমা? কেন?

গাড়ী রাস্তার বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সেসিল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। এ কী হয়ে গেল হঠাৎ। পেছনে পায়ের শব্দ; ফিরে দেখল, রেমণ্ড। সেসিল তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চীৎকার করে উঠল, পণ্ড।

ওরা যখন কি করে অ্যানকে ফিরিয়ে আনবে তার আলোচনা করছে, তখন পুলিশের কর্তৃপক্ষ সংবাদ দিল অ্যান্ মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছে। রাস্তার যে জায়গায় দুর্ঘটনা ঘটেছে সেখানে মোটর গাড়ী মাঝে মাঝে বিপদে পড়ে। রাস্তার ঐ অংশটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। সেসিল বুঝল, এটা মোটর দুর্ঘটনা নয়, আত্মহত্যা। অন্য কেউ হলে আত্মহত্যা করবার পূর্বে চিঠি লিখে যেত, নাটকীয় ভাষায় কারণ বর্ণনা করত, কিন্তু অ্যান্ অন্য জাতের মেয়ে। সে এমন জায়গায় এমন ভাবে মৃত্যু বরণ করল যে কেউ সন্দেহ করতে পারবে না। আকস্মিক দুর্ঘটনা ছাড়া আর কোন কারণ থাকতে পারে সে কথা অনুমান করবারও সূত্র নেই।

সেসিল ও রেমণ্ড প্যারিস ফিরে এসেছে। অ্যানের অপঘাত মৃত্যু ওদের জীবনের চাকাটা কিছুদিনের জন্য অচল করে দিয়েছিল। আবার তারা ফিরে পেয়েছে পূর্বের স্বেচ্ছাচারী জীবন। সেসিল ঘোরে তার পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে; রেমণ্ড জলের মতো টাকা ঢালে তার নতুন প্রণয়িনীর পায়ে। এই পরিবেশে অ্যানের স্মৃতি বেমানান।

তবু খুব সকালে যখন ঘুম ভেঙ্গে যায়, প্যারিসের রাজপথ থেকে যখন মোটর গাড়ীর শব্দ উপরে ভেসে আসে, তখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে সেসিলের মনে পড়ে যায় অ্যানের কথা। আবো অন্ধকারে বারে বারে ডাকে: অ্যান্, অ্যান্। এই নাম সেসিলের সমস্ত অন্তর বিষাদে পূর্ণ করে দেয়। ভোরের সূর্যকে আহ্বান না করে সে স্বাগত সম্ভাষণ জানায় বিষাদকে। চোখ বন্ধ করে আবিষ্ট কণ্ঠে বলে: Bonjour Tristesse। হে বিষাদ, এসো, এসো।

Publishers John Murray, London. 7/6

বিড়াল

জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিস কি সে সম্বন্ধে মতভেদ হওয়া স্বাভাবিক। ভিন্ন ভিন্ন লোক হয়তো সম্পূর্ণ পৃথক জিনিসের তালিকা পেশ করবেন। শেলির তালিকাটা দেখা যাক। শেলি তাঁর বন্ধু পীককে এক চিঠিতে এই তালিকা দিয়েছেন। প্রথমেই তিনি উল্লেখ করেছেন বিড়ালের কথা। কয়েকটি বিড়াল ছানা গা ঘেঁষে পরম আরামে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ করবে—জীবনে এটা মস্ত বড় উপভোগের বস্তু। শেলির মতো এমন জোর দিয়ে না বললেও আরো অনেক বড় বড় সাহিত্যিক বিড়াল পছন্দ করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বিড়াল আমাদের বাড়ির সবত্র যেমন নিঃশঙ্কভাবে চলাফেরা করে অন্য কোন প্রাণীর তেমন অধিকার নেই। বিড়াল এই অধিকার এমনিতেই পায়নি। মানুষ তার নিজের প্রয়োজনেই বিড়ালকে সমাজে স্থান দিয়েছে। মানুষ যখন ভবঘুরে জীবন ছেড়ে চাষ শুরু করল তখন ইঁদুরের হাত থেকে শস্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। বিড়াল ইঁদুরের সবচেয়ে বড় শত্রু। সুতরাং নিজের স্বার্থের জন্যই মানুষ বিড়ালকে ঘরে স্থান দিয়েছে। বিড়ালের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বহু দিনের।

বিড়াল কি করে পৃথিবীতে এলো সে সম্বন্ধে যে গল্প আছে, তাতেও দেখা যাবে, ইঁদুরের উৎপাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যই বিড়াল সৃষ্টি করা হয়েছে। বাইবেলে যে জলপ্লাবনের কথা আছে, তার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য নোয়া বিরাট এক জাহাজে আশ্রয় নিয়েছে। সেই জাহাজে নানা ধরণের পশুপাখীও এসেছে আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে। কয়েক দিন পরে নোয়া ইঁদুরের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠল। পশুরাজ সিংহের নিকট নোয়া ইঁদুরের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য অনুরোধ করল। ইঁদুর মারতে যাওয়াটা সিংহের নিকট অপমানজনক মনে হলো। পশুরাজ এক হাঁচি দিয়ে দুই নাসারন্ধ্র থেকে সিংহাকৃতি দুটি ছোট জীব বের করে দিল। এরাই বিড়াল। নোয়ার জাহাজ থেকে ইঁদুরের জ্বালাতন দুর হতে দেরি হলো না।

যতদূর জানা যায় তা থেকে মনে হয় যে, বন্য বিড়াল সর্বপ্রথম মানব সমাজে স্থান পায় উত্তর আফ্রিকায়। সে প্রায় সাত হাজার বছর পূর্বের কথা। প্রাচীন

মিশরীয় সভ্যতার বিবরণে বিড়ালের উল্লেখ দেখা যায় প্রথম থেকেই। মিশরে বিড়ালের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন যে ছবি পাওয়া গেছে তার বয়স প্রায় চার হাজার বছর। মিশরের বা দেবীর মুখ ছিল বিড়ালের মতো। তিনি মিশরের সবচেয়ে প্রভাবশালী দেবী ; সমাজে বিড়ালের কত বড় সম্মান ও প্রতিষ্ঠা থাকলে দেবীর মুখ বিড়ালের মতো হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। মিশরে ইঁদুরের অত্যন্ত উৎপাত থাকায় বিড়ালের এত সমাদর হয়েছিল। কেউ বিড়াল হত্যা করলে প্রাচীন মিশরে তার প্রাণদণ্ড হতো। একজন রোমান সৈন্য অনিচ্ছাকৃত-ভাবে বিড়াল মারবার অপরাধ করায় তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। রাজা ক্যাম্বিসেস্ মিশরীয়দের বিড়াল প্রীতির কথা ভালো করেই জানতেন ; তাই মিশরের বিরুদ্ধে অভিযান করবার সময় তিনি তাঁর সৈন্যদের বিড়াল সামনে রেখে অগ্রসর হতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। মিশরের সৈন্যরা বিড়াল মারবার ভয়ে অস্ত্র ত্যাগ করে পরাজয় বরণ করেছিল।

কোনো বাড়িতে বিড়াল মারা গেলে বাড়ির লোকেরা ভ্রূ ও চুল কামিয়ে শোক প্রকাশ করত। যে বহুমূল্য মলম মেখে সম্রাটের দেহ সংরক্ষণ করা হতো, সেই মলম দিয়ে মৃত বিড়ালের দেহ সংরক্ষণ করবার রীতি প্রাচীন মিশরে ছিল। তাই পিরামিডের অভ্যন্তরে শত শত বিড়ালের মৃতদেহ পাওয়া গেছে।

প্রাচীন গ্রীসেও বিড়ালের কম আদর ছিল না। বিড়াল উপহার দিতে না পারায় গ্রীক কুমারী প্রণয়ীকে প্রত্যাখ্যান করেছে, এমন দৃষ্টান্তও দেখা যায়। রোমের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর মিশর থেকে য়ুরোপে বিড়াল রপ্তানি হতে থাকে। মিশর থেকে বিড়াল বাইরে পাঠানো এর পূর্ব পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল।

ইঁদুর, আরশোলা প্রভৃতির উৎপাত বন্ধ করবার জন্য দশম শতাব্দীর ইংলণ্ডে বিড়াল পালনের প্রশ্নটা জাতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হতো। বিড়াল হত্যা করলে শাস্তির ব্যবস্থা ছিল এবং অন্যান্য জীবজন্তুর তুলনায় বিড়ালের দাম বেশ চড়া ছিল দেখা যায়।

এশিয়ার প্রাচীন দেশগুলিতেও বিড়ালের আদর কম নয়। সে সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে Katherine L. Simms লিখিত They Walked Beside Me নামক গ্রন্থে। বিড়ালের ইতিহাস, স্বভাব এবং অন্যান্য বহু কৌতুহলোদ্দীপক বিষয় এখানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ভারতের বিড়াল সম্বন্ধে একটি অধ্যায় পাওয়া যাবে।

Publishers : Hutchinson ; London. 15/-

ফেলিক্সের স্বীকারোক্তি

ফেলিক্স ক্রুলের আত্মচরিত টমাস মানের শেষ এবং অসম্পূর্ণ উপন্যাস। এটি ক্রুলের স্মৃতিকথার প্রথম খণ্ড মাত্র। সম্পূর্ণ হলে মানের সাহিত্য সাধনায় এর মূল্য কি হতো তা বলা যায় না। তবে এক বৃহৎ পরিকল্পনা নিয়ে যে তিনি ক্রুলের কাহিনী লিখতে বসেছিলেন তা বোঝা যায়; কারণ নায়কের বিশ বছরের কাহিনী বলতেই চারশ' পৃষ্ঠার বেশি লেগেছে। ফেলিক্স ক্রুলের জীবনের কয়েকটি ঘটনা মানের কাছ থেকে আমরা অনেক দিন আগে পেয়েছি একটি ছোট গল্পের আকারে। তারপর প্রায় চল্লিশ বছর ধরে মান একে উপন্যাসের বীজরূপে লালন করে এসেছেন। সুতরাং ফেলিক্স ক্রুলের আবির্ভাব আকস্মিক নয়। মানের দীর্ঘকালের চিন্তা ভাবনা এবং সাহিত্য সাধনার পরিণত ফল এই উপন্যাস।

কাহিনী আরম্ভ হয়েছে মানের প্রিয় পরিবেশে। বনেদি ব্যবসায়ী পরিবার। মদ তৈরির ব্যবসা। ফেলিক্সের বাবা এই ব্যবসার শেষ কর্ণধার। কারবার বন্ধ হবার মুখে। কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়। চরিত্রে ভাঙন ধরেছে। মা, বাবা, দিদি—সকলের। বাড়িতে পার্টি এবং হৈ-হল্লা লেগেই আছে। পাড়ায় দুর্নাম। অন্য বাড়ির সমবয়স্ক ছেলেরা ফেলিক্সের সঙ্গে মিশতে চায় না। একা একা তার দিন কাটে। এই নিঃসঙ্গতার ফলে ফেলিক্সের মানসিক গঠন বিকৃত হয়ে উঠলো। মাঝে মাঝে সে স্কুল থেকে পালায়; বাবার দস্তখত হুবহু জাল করে অনুপস্থিতির জন্য মিথ্যা জবাবদিহি দেয়। স্কুলে পড়বার সময় একদিন ফেলিক্স দোকান থেকে চুরি করে। ছেলেবেলার এই জাল ও চুরি করবার প্রবৃত্তিটা বয়স বাড়বার পরও তাকে ত্যাগ করেনি। এ দু'টি প্রবৃত্তি পরবর্তী কালে ফেলিক্সের জীবনে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে।

দেনার জ্বালায় অস্থির হয়ে ফেলিক্সের বাবা আত্মহত্যা করলেন। ব্যবসা আগেই ডুবেছে। এখন ফেলিক্সের আর কোন অবলম্বন রইলো না। স্থির করলো, প্যারিস যাবে ভাগ্যান্বেষণের উদ্দেশ্যে। কিন্তু সেখানে যাবার আগে বাধ্যতামূলক সামরিকবৃত্তি সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে বিদেশে যাবার অনুমতি মিলবে না। ফেলিক্স সেনা বিভাগের নির্বাচন কমিটির সামনে

এমন চতুর অভিনয় করলো যে কমিটি তাকে অসুস্থ ও বিকৃতমস্তিষ্ক সিদ্ধান্ত করে সামরিক কর্তব্যের দায় থেকে রেহাই দিলো। টমাস মানের সমগ্র রচনার মধ্যে ফেলিক্সের সাক্ষাৎকারের মতো কৌতুককর দৃশ্য আর একটিও নেই।

ফেলিক্স মুক্তি পেয়ে কিছুদিন এক বারবনিতার ব্যবসায়ে অংশীদার হয়ে কাজ করলো। তারপর এলো প্যারিস। ফ্রান্সে প্রবেশের শুল্ক ঘাঁটিতে এক বিখ্যাত লেখিকার গহনার বাক্স চুরি করলো। ফেলিক্স চতুর ছেলে। গহনা বিক্রির টাকার উপর নির্ভর করে পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলো না। প্যারিসের এক বড় হোটেলে চাকরি শুরু করলো লিফ্‌টবয় হিসাবে। অল্পদিন পরেই ফেলিক্স ওয়েটারের পদ পেলো।

প্যারিসের হোটেল এক বিচিত্র জগৎ। অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবনের মিছিল। ফেলিক্স ওয়েটার, সুতরাং এদের জীবন ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখবার সুযোগ পেয়েছে সে। যে-সব ধনী পরিবারের মেয়েদের খাদ্য পরিবেশন করা আর হুকুম তামিল করা তার কাজ, তারাই তাকে প্রেম নিবেদন করে; এক বৃটিশ লর্ড তাকে বন্ধু ও পার্শ্বচর হিসাবে স্বদেশে নিয়ে যাবার জন্য ব্যগ্র। ওয়েটার বলে যারা ফেলিক্সকে অবজ্ঞা করে তাদের অন্তঃসারশূন্য জীবনও তার কাছে গোপন থাকে না।

মার্কুইস দ্য ভেনস্তা বড়লোকের ছেলে। প্যারিস এসেছে ছবি আঁকা শিখতে। কিন্তু ছবি আঁকবে কি, মডেল জাজার প্রেমে সে উন্মত্ত। বাড়ীতেও এ খবর পৌঁছেছে। মা-বাবার ভয় হলো ছেলের বুঝি উচ্ছন্নে যাবার দেরি নেই। তাঁরা ছেলের হাতে প্রচুর টাকা তুলে দিয়ে বললেন, যাও, পৃথিবী ঘুরে এসো। তাঁদের আশা, দেশের বাইরে গেলে জাজাও মনের বাইরে চলে যাবে। মার্কুইস পড়লো উভয় সঙ্কটে। বাবার কথা না শুনলে টাকা পাঠানো হয়তো বন্ধ হবে। অথচ জাজাকে ছেড়ে প্যারিসের বাইরে থাকবে কি করে?

ফেলিক্সের শরণাপন্ন হলো মার্কুইস। হোটেলে তাদের আলাপ হয়; দু'জনে পরামর্শ করে স্থির করলো মার্কুইস জাজাকে নিয়ে প্যারিসেই থাকবে; ফেলিক্স তার হয়ে পৃথিবী ভ্রমণ করে আসবে। মার্কুইসের হাতের লেখা নকল করে ফেলিক্স বাবাকে চিঠি লিখবে বিভিন্ন জায়গা থেকে। ছেলে তাঁর আদেশ পালন করছে দেখে বাবা সন্তুষ্ট হবেন।

পৃথিবী ভ্রমণের পথে ফেলিক্স প্যারিস থেকে লিসবনে এলো। আলাপ হলো সেখানকার প্যালিওজুলজিকাল ইন্‌স্টিট্যুটের পাগলাটে অধ্যাপক কুক্কুকের

সঙ্গে। নানা বিচিত্র বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, পাখীর ডানা ও মেয়েদের সুকুমার বাহুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছেন তিনি। ফেলিক্স হঠাৎ বিবর্তনবাদ আলোচনায় উৎসাহী হয়ে পড়ে। কিন্তু আসলে সে মুগ্ধ হয়েছে অধ্যাপকের অষ্টাদশী কন্যা সুসানাকে দেখে। বড় ঘরের ছেলে-এই পরিচয় দিয়ে সকলের কাছ থেকেই ফেলিক্স সমাদর লাভ করেছে। সুসানা প্রথম এমন ভাব দেখাল যেন ফেলিক্স সম্বন্ধে তার কোনো আগ্রহ নেই। প্রেমের প্রসঙ্গ উঠলেই সে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। একদিন সুসানার সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করবার সুযোগ পাওয়া গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সুসানা যখন আত্মনিবেদনের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে, ঠিক সেই নাটকীয় মুহূর্তে আবির্ভাব হলো অধ্যাপক পত্নীর। মেয়েকে সরিয়ে দিয়ে তিনি ফেলিক্সকে নিয়ে এলেন নিজের ঘরে। ধরা পড়ে যাবার সঙ্কোচে ফেলিক্স একটু অপ্রতিভ। যে প্রেম মেয়েকে নিবেদন করতে যাচ্ছিল তা খরদৃষ্টি বাজ পাখীর মতো মা ছিনিয়ে নিয়ে গেল। প্রৌঢা রমণীর ব্যাকুল বাহুবন্ধনে বন্দী হলো ফেলিক্স। প্রথম খণ্ডের গল্প এখানেই শেষ হয়েছে।

ফেলিক্স ক্রুল মানের এক নতুন ধরনের চরিত্র। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের নায়কদের মতো ফেলিক্সের ওপর কোনো দার্শনিক তত্ত্বের বোঝা চাপানো হয়নি। জীবনকে সে কৌতুক বলে গ্রহণ করেছে। নীতির বন্ধন কিংবা বিবেকের দংশন জীবনের পথে তার অবাধ গতিকে বাধা দিতে পারেনি। কাহিনীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এমন এক স্বচ্ছন্দ হালকা সুর পাওয়া যায় যা মানের রচনায় দুর্লভ। তবু গল্পের উপর থেকে কৌতুকের পর্দা সরিয়ে দিলে ফেলিক্সের যে জীবনদর্শন উপলব্ধি করা যায় তার মধ্যে লঘুতা নেই। চুরি করে হোক, প্রতারণা করে হোক, জীবনে সাফল্যলাভ করতে হবে—এই হলো ফেলিক্সের মূলমন্ত্র। শুধু তার নয়। যে-কোনো মূল্যে এগিয়ে যাবার মন্ত্র তো বর্তমান সমাজেরও।

ওয়েটার ফেলিক্সের চোখ দিয়ে অভিজাত সমাজের বাহ্যিক জাঁকজমকের পশ্চাতে যে বেদনা রয়েছে তা-ও আমরা দেখতে পাই। ডিয়ানে ফিলিবার্টের মতো নামকরা লেখিকা হোটেলের এক নগণ্য লিফ্‌টবয়কে ডেকে এনে দেহ দান করল। ফেলিক্সের স্থান যে সমাজের নিম্নতম স্তরে একথা ডিয়ানে তাকে বুকের মধ্যে টেনে এনেও ভুলতে পারে না। অধঃপতন হলো বলে ডিয়ানের অনুশোচনার শেষ নেই। কিন্তু কি করবে? The intellect longs for

the delight of the non-intellect. স্বামীর কাছ থেকে সে এ আনন্দ পায়নি। তাই সমাজের নর্দমা থেকে কুড়িয়ে এনে তা আস্বাদন করতে হলো।

যদিও ফেলিক্স মানের একটি নতুন ধরনের চরিত্র, তবু পূর্বের রচনার সঙ্গে খানিকটা সাদৃশ্য খুঁজে বের করা যেতে পারে। মান যে-সব শিল্পী ও সাহিত্যিকের চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তারা কেউ সুস্থ ও স্বাভাবিক নয়। তাদের চরিত্রে কোনো-না-কোনো প্রকার বিকৃতি দেখা যাবে। ছেলেবেলায় ফেলিক্স সঙ্গীত শুনে তন্ময় হয়ে যেত। মাত্র আট বছর বয়সে সে তার সঙ্গীত প্রতিভার পরিচয় দিয়ে এক বিরাট জনতাকে বিস্ময়ে অভিভূত করেছিল। সুতরাং ফেলিক্সের জীবন শুরু হয়েছে শিল্পী হিসাবে। তারপর মানের শিল্পপ্রবণ চরিত্রের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই ফেলিক্স বিকৃত পথ গ্রহণ করেছে। ফেলিক্স-চরিত্রে যৌবনবিলাস, জালিয়াতি ও চুরির প্রবৃত্তি যতটা প্রাধান্য লাভ করেছে মানের অন্য কোনো শিল্পী চরিত্রে তা দেখা যায় না। আট বছর বয়সের পরে ফেলিক্সের সঙ্গীত প্রতিভার কোনো পরিচয় কাহিনীর মধ্যে নেই। হয়তো তার শিল্প-প্রতিভার পুনরুজ্জীবনের মধ্যেই কাহিনী শেষ হতো।

মান মৃত্যুর পূর্বে আভাস দিয়েছিলেন ফেলিক্স ক্রুলের স্মৃতিকথায় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার অনেক কথা থাকবে। ফেলিক্সের অকপট স্বীকারোক্তির সঙ্গে রুশোর আত্মকথার তুলনা সহজেই মনে পড়ে। স্মৃতি-কথার আঙ্গিকে রচিত বলেই উপন্যাসের জমাট বাঁধুনি কাহিনীর মধ্যে আশা করা যায় না। অনেক চরিত্র একবার দেখা দিয়ে হারিয়ে গেছে। ডিয়ানের উপ-কাহিনীটি একটি ছোট গল্পের মর্যাদা নিয়ে পৃথকভাবে দাঁড়াতে পারে।

"ব্ল্যাক সোয়ানে" মানের রচনা-রীতি পরিবর্তনের যে সূচনা দেখা গিয়েছিল, আলোচ্য গ্রন্থে তার আশ্চর্য সুন্দর পরিণতি ঘটেছে। অনুবাদের মধ্য দিয়েও মূলের উজ্জ্বল ও স্বচ্ছন্দ গদ্য রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। কাহিনীর প্রকৃতি অনুযায়ী ভাষা রূপান্তরিত হয়েছে। ইতিহাস, দর্শন ও বাইবেলের পূর্বসূত্র দিয়ে মান তাঁর রচনাকে কণ্টকিত করেননি। "ফেলিক্স ক্রুল" না পড়লে মানের সাহিত্য সাধনার পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

Publishers: Secker & Warburg; London. 18/-

প্রাণবন্যা

কলকাতার জীবন নিয়ে লেখা একটি নতুন উপন্যাস পাওয়া গেল। বইটির নাম The City and the Wave ; লেখিকা Jon Godden. বইটি আমেরিকা এবং বৃটেন এই দু'জায়গা থেকেই প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই উপন্যাসটির দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রয়োজন হয়েছে বৃটেনে ; সুতরাং কাহিনীটি যে পাঠকচিত্ত আকর্ষণ করতে পেরেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কলকাতার একটা পুরনো ছ'তলা বাড়ি। এ বাড়িতে বাঙালী, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, পাঞ্জাবী প্রভৃতি নানা জাতি ও ধর্মের লোক বাস করে। অনেকটা যেন কলকাতার সমাজের প্রতীক এই বাড়ি। লেন চেজ এ বাড়ির সর্বোচ্চ তলায় একটি ঘর নিয়ে একা থাকে। তার বয়স উনচল্লিশ, মাথায় টাকের আভাস দেখা দিয়েছে, চলে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে। চাকরি করে একটা বৃটিশ কোম্পানীর আপিসে ; ভাতাশুদ্ধ মাইনে পায় তিনশ' টাকা। লেন চেজ বিয়ে করেনি, তবু এ টাকায় তার চলে না। অথচ সে জানে কত বাঙালী কেরাণী মাত্র ষাট টাকায় স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসার চালিয়ে আছে।

জুলাই মাসের একটি গুমোট বিকেল। ক্লান্ত হয়ে লেন বাড়ি ফিরেছে। ঘরে ঢুকেই সে কিসের অভাব বোধ করল,—যেন কি নেই এখন, অথচ আগে ছিল। ভালো করে চেয়ে দেখল টেবিল, চেয়ার, ঠাকুর্দার কাছ থেকে পাওয়া পুরনো দুরবীক্ষণ যন্ত্রটা—সবই ঠিক আছে। নেই শুধু তার পোষা বিড়ালটা। দরজা খুললেই যে রোজ তাকে মিউ মিউ করে অভ্যর্থনা জানায়, যাকে সে রোজ দুধ খাওয়ায়, যে তার নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সঙ্গী, সেই বিড়ালটাকে কোথাও দেখা গেল না। নিচের তলায় পাঞ্জাবী ভাড়াটের ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকে জানতে পারল তার ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে বিড়ালটা রাস্তায় পড়ে গিয়ে তখনি মারা গেছে। ছ'তলা থেকে পড়লে বাঁচবার কথা নয়! কলকাতার জীবনসমুদ্রে একবিন্দু জীবন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। বিড়ালের মৃত্যুর ঘটনাটি প্রথম কয়েকটি পৃষ্ঠার মধ্যে বর্ণনা করে লেখিকা লেনের চরিত্র সম্বন্ধে সার্থক ইঙ্গিত দিয়েছেন ; সমগ্র কাহিনীর সূচনা লেখিকা যে খুব দক্ষতার সঙ্গে করেছেন সে কথা স্বীকার করতে হবে।

লেন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। তার ঠাকুর্দা ছিল খাঁটি ইংরেজ; সে জাহাজের কাপ্তান ছিল বলেই একটা দুরবীক্ষণ যন্ত্র সংগ্রহ করেছিল। উত্তরাধিকারী সূত্রে লেন সেটা পেয়েছে। লেনের বয়স যখন খুব অল্প তখন তার বাবার মৃত্যু হয়; মা আবার বিয়ে করল। নতুন সংসারে লেন অনাদৃত হওয়ায় তার মা ওকে রেখে এল অনাথ আশ্রমে। সেখানে পাদ্রিদের যত্নে সে লেখা-পড়া শিখেছে এবং তাদেরই সুপারিশে চাকরি পেয়েছে। লেনের স্বভাব চট্‌পটে নয় বলে উপরওয়ালারা তার কাজে সন্তুষ্ট হতে পারে না। লেনের আত্মীয়হীন নিঃসঙ্গ জীবনে সময় কাটাবার সবচেয়ে বড় উপায় দুরবীক্ষণ যন্ত্রটা। রাত্রিতে ঐ যন্ত্রটার সাহায্যে সে কলকাতার লোকারণ্য থেকে চলে যায় গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। ঐ বাড়িরই নিচের তলায় থাকে বাঙালী জ্যোতিষী দেবেন্দ্রনাথ দে। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব। মাঝে-মাঝে দেবেন্দ্রনাথের স্ত্রীর রান্না মাছের ঝোল ও ভাত এবং দই মিষ্টি খেয়ে আসে। খুব ভালো লাগে।

বৃষ্টির দিন। লেন বাড়ির সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করবার পর দরজার আড়াল থেকে ষোল বছরের একটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবতী চুপি চুপি তার পিছনে সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে লাগল। লেন তালা খুলে ঘরে ঢোকবার পর মেয়েটিও ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল; লেন এই প্রথম দেখতে পেল তাকে। ক্ষীণকায় বলে বয়স ষোল হলেও মেয়েটিকে দেখায় নেহাৎ ছোট বালিকার মতো। বৃষ্টিতে ভিজে তার পোষাক গায়ের সঙ্গে লেপ্‌টে গেছে। সারাদিন অনাহারে পথে পথে ঘুরেছে, পুরনো জুতা কোথায় যে পা থেকে খুলে পড়েছে টের পায়নি। ওর নাম মারি; দুর সম্পর্কের পিসিমার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাড়ি ছেড়ে এসেছে। মা বাবা নেই, আর কোনো আশ্রয় নেই। সারাদিন অনাহারে পথে পথে ঘুরেছে। এখন লেনের কাছে আশ্রয় চায়, অন্ততঃ সে রাতটার জন্য। অনেক অনুরোধের পর লেন সম্মত হলো। রাতটা থেকে সকালেই চলে যাবে মারি। কিন্তু সেই এক রাত্রিতে লেন এবং মারির মধ্যে এমন সম্পর্ক স্থাপিত হলো, যার ফলে মারির আর যাওয়া হলো না। লেন বিয়ে করল মারিকে।

কয়েক মাস পরে লেন যখন জানল মারি সন্তান-সম্ভবা তখন তার মনে আতঙ্ক জেগে উঠল। লেন তার ছ'তলার ঘরের জানালা দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখত উঁচু-নিচু ছাদগুলি ঢেউয়ের মতো ওঠা-নামা করে দিগন্তে মিলিয়ে গেছে। এই সব ছাদের নিচে জীবাণুর মতো মানুষগুলি দুঃখের সমুদ্রে কিলবিল করছে।

দু'শ বছর ধরে এই শহর যেভাবে খুশি প্রসার লাভ করে চলেছে। বিমান থেকে সবুজ প্রকৃতির বুকে কলকাতা শহরকে দেখা যায় একটা কলঙ্ক চিহ্নের মতো। একটা অসুস্থ, অসুখী পরিবেশ সমস্ত শহরটাকে গাঢ় কুয়াশার মতো ঢেকে রেখেছে। এর মধ্যে আর একটি নতুন জীবনকে ডেকে আনা পাপ ছাড়া আর কী? লেন স্থির করল তার সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখতে দেওয়া হবে না। কিন্তু মারি সন্তান চায়। দেবেন দে তার যুক্তি বোঝে না; যে পাদ্রি লেনকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছে সে-ও লেনের যুক্তি বুঝতে অক্ষম। এই দুঃখের সংসারে আর একটি প্রাণীকে ডেকে আনবার পাপবোধ তার বুকের উপর গুরুভার পাথরের মতো চেপে বসেছে; এবং তারই ফলে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল।

দেবেন দে-র একটি ভবিষ্যদ্বাণী লেনকে স্বস্তি দিল। শিগ্‌গীর একদিন নব্বই মাইল দূরের সমুদ্র থেকে বিধ্বংসী প্লাবন এসে কলকাতাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। সে, মারি, তাদের অনাগত সন্তান এবং কলকাতার এই ইঁটের অরণ্য কুটার মতো ভেসে যাবে। তাহলে আর ভেবে কি হবে? এই প্লাবনের মধ্যে রয়েছে তার মুক্তি। সে কলকাতা থেকে পালিয়ে জীবন রক্ষা করবার চেষ্টা করবে না। বরং সে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে কবে আসবে সেই প্লাবন। কিন্তু যারা বাঁচতে চায় তাদের সে সাবধান করে দেবে। আপিসে উপরওয়ালা সাহেবকে একথা বলতেই দু'মাসের মাইনে দিয়ে লেনকে চাকরি থেকে বিদায় দেওয়া হলো। লেন চাকরি যাওয়ায় একটুও চিন্তিত হলো না। কারণ, দু'মাসের আগেই প্লাবনের জলে সে ভেসে যাবে।

সেদিন আকাশে মেঘ করেছে। পাগলা হাওয়া বইছে চারদিক থেকে। দেবেন দে বাসা ছেড়ে যাচ্ছে, ঘোড়ার গাড়ীতে উঠেছে তার মালপত্র। দেবেন দে-র গণনা হিসাবে আজকেই প্লাবন আসবে। প্রকৃতির রোষ কেবল কলকাতার উপরে; কলকাতার সীমানার বাইরে যেতে পারলে রক্ষা পাওয়া যাবে। জ্যোতিষীর ভয়, প্লাবন আসবার আগে সে পালাতে পারবে কি না?

লেন ছ'তলার জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে। সে যেন প্রলয়ের পদ-ধ্বনি শুনতে পেয়েছে, আর দেরী নেই, এলো বলে! সে এবং মারি ভেসে যাবে। নিচে পথ বেয়ে এখনো চলছে জনস্রোত। হঠাৎ মারির আর্তনাদে লেনের স্বপ্ন ভেঙে গেল। প্লাবন আসবার আগেই কলকাতার আকাশে চোখ খুলতে চায় তাদের সন্তান। লেনকে ছুটতে হলো দাই-এর খোঁজে।

এই কলকাতার জনারণ্যে আসছে একটি নতুন অতিথি। কিন্তু কতক্ষণের জন্যই বা ? মা ও সন্তান ঘুমিয়ে আছে। লেন জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। মেঘ দূর হয়ে গেছে, প্রলয়ের চিহ্ন কোথাও নেই। প্রাণের সমুদ্র এই কলকাতা ঠিক আগের মতোই ক্ষুব্ধ হয়ে আছে। ছেলেকে আর একবার দেখল লেন। প্রলয় নয়, প্রাণের দুর্নিবার বন্যা। ঐটুকু প্রাণের দাবী ঠেকানো গেল না। হঠাৎ লেন উপলব্ধি করল ধ্বংসের চেয়ে প্রাণ কত বড়। লেন-এর মনে যে বিষাদের মেঘ ছিল তা দূর হয়ে গেল। একটি কচি প্রাণের স্পর্শ তার নিঃসঙ্গ ঘুণধরা জীবনকে সঞ্জীবিত করে তুলল।

এই কাহিনীর দু'টি প্রধান পুরুষ চরিত্রই অস্বাভাবিক বাতিকগ্রস্ত। একজন দেবেন দে, আর একজন লেন। শুধু মারি ব্যতিক্রম। সে সুস্থ ও স্বাভাবিক। লেন-এর অস্বাভাবিকতার মধ্যেই কাহিনীর বীজ নিহিত। লেখিকা সহজ কিন্তু জোবালো ভাষায় একটি ঋজু কাহিনী বলেছেন। অনাবশ্যক চরিত্র বা অনাবশ্যক ঘটনা একটিও নেই। লেখিকার রচনা পড়ে ক্লাসিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের কথা মনে পড়ে। দুর্গা ও কালীর বর্ণনা করতে গিয়ে লেখিকা গোলমালে পড়েছেন। একটু নতুন ধরণের এই গল্পটি লেখিকা সাফল্যের সঙ্গে বলতে পেরেছেন।

Publishers : Michael Joseph ; London. 10/6.

কাব্য রচনা

Stephen Spender-এর নতুন বই The Making of a Poem সাহিত্য সম্পর্কিত কয়েকটি আলোচনার সংগ্রহ। আলোচনাগুলি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। আধুনিক কবি ও কাব্য, রোমাণ্টিসিজম, শিল্পীর কবি প্রতিভা, জর্জিয়ান কবিতা ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়েব আলোচনা বর্তমান গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে। স্পেণ্ডারের রচনার একটি বড় বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা। সেই বৈশিষ্ট্য দ্বারা বর্তমান আলোচনাগুলিও চিহ্নিত। The Making of a Poem এই সংগ্রহের শ্রেষ্ঠ নিবন্ধ এবং পাঠকদের দৃষ্টি সর্বাগ্রে এটির উপরেই পড়বে। স্পেণ্ডারের মতো খ্যাতিমান কবি কিভাবে কবিতা লেখেন, কবির নিজেব মুখে সে কথা শোনবার একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। কবিতার জন্মকাহিনী সম্বন্ধে স্পেণ্ডার যে-কথা বলেছেন, তার মূল-সূত্রগুলি সকল কবির পক্ষেই মোটামুটিরূপে সত্য।

কাব্য রচনার জন্য যে ক'টি প্রধান গুণ প্রয়োজন তাদের মধ্যে মনঃসংযোগ বা তন্ময়তা, প্রেরণা, প্রখর স্মৃতি, আত্মবিশ্বাস এবং সংগীত অন্যতম।

শীলার কবিতা লেখার সময় ডেস্কের ডালাব নিচে পচা আপেল রেখে দিতেন; ওয়ালটার ডি লা মেয়ার সিগারেট টানতে টানতে লেখেন; অডেনের হাতের কাছে চা-ভর্তি কাপ না থাকলে লেখা হয় না; স্পেণ্ডার কফি ও ধূমপান করেন; অথচ লেখাব সময় ছাড়া ধূমপান করা তাঁর অভ্যাস নয়। পচা আপেলের গন্ধ, চা, কফি বা ধূমপান কবির মনঃসংযোগ বা তন্ময়তা এনে দিতে পারে না। এরা শুধু সৃষ্টির তন্ময়তাকে কিছুক্ষণ স্থায়ী করতে সাহায্য করে। মানুষের দুটো সত্ত্বা,—একটা তার দেহ, একটা মন। সৃষ্টির কারখানা মনেব জগতে অবস্থিত; কিন্তু মন থেকে দেহকে তো পৃথক করা সহজ নয়! মন আর দেহ বিনা নোটিশে যখন তখন পরস্পরের সীমানা অতিক্রম করে। সৃষ্টির কাজ যখন শুরু হয়, তখন ঘড়ির টিক্-টিক্, দুষ্টু ছেলের চীৎকার দেহকে অধিক মাত্রায় সচেতন করে মনের সমতা ক্ষুণ্ণ করে সৃষ্টির আয়োজন ব্যর্থ করে দিতে পারে। বাচ্চা ছেলের মুখে চুষিকাঠি দিয়ে মা যেমন ঘর-সংসারের কাজ করেন, তেমনি শিল্পীরা দেহকে চা-সিগারেট দিয়ে বলেন, তুই এই নিয়ে একটু স্থির হয়ে থাক, আমার সৃষ্টির কাজটা আমি সেরে নিই।

স্পেণ্ডারের মতে কবির তন্ময়তা দু'রকমের। কোনো কোনো কবি একবার বসেই সম্পূর্ণ কবিতাটি লিখে ফেলেন; আবার অনেকে একটু একটু করে অনেক দিনের চেষ্টায় একটি কবিতা সম্পূর্ণ করেন। একটি ভাব নিয়ে বারবার তন্ময় হতে হয়। স্পেণ্ডার শেষোক্ত দলের। তিনি নোট-বুকে যখন যে ভাব মনে আসে লিখে রাখেন; হয়তো একটি দু'টি লাইন মাত্র। তারপর এই ভাবের বীজকে একটু একটু করে ফুটিয়ে তোলেন একটি সম্পূর্ণ কবিতায়। অনেক ভাবনা, অনেক পরিশ্রম, অনেক সংশোধন ও পরিবর্তনের পর একটি সার্থক কবিতা পাওয়া যায়। ১৯৪৪ সালে স্পেণ্ডার একটি নোট-বইয়ে যখন যে ভাব মনে আসত তা লিখে রাখতে আরম্ভ করেন; এমনি করে একশ' পৃষ্ঠা পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু এই একশ' পৃষ্ঠার নোট থেকে লেখা হয়েছে মাত্র ছ'টি কবিতা। আজ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে কবির মনে যে অনুভূতি জাগল, তা হয়তো আজকেই কবিতায় রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। কখনো কখনো অনেক বৎসর পরে কবিতাটি লেখা হয়। দান্তের যখন ন' বছর বয়স, তখন বিয়াত্রিচের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর অমর কাব্য লিখেছিলেন বহু বৎসর পরে। অনুভূতিকে বহুদিন যাবৎ ধরে রাখবার মতো মানসিক শক্তি কবির পক্ষে তাই একান্ত প্রয়োজন। আর কবির নিজের রচনার উপর চাই দৃঢ় আস্থা। আত্মবিশ্বাস না থাকলে, নিজের সৃষ্টি সম্বন্ধে গৌরববোধ না থাকলে, সার্থক সৃষ্টি সম্ভব নয়।

প্রেরণা ও সঙ্গীত কাব্যের প্রাণ। কিন্তু পাঠকরা সাধারণতঃ প্রেরণার উপর যতটা জোর দেন, কাব্য-রচনায় প্রকৃতপক্ষে প্রেরণার স্থান তত বড় নয়। প্রেরণা কবিকে লিখতে বসায়, সৃষ্টির জন্য উন্মুখ করে তোলে। কিন্তু একবার কাজ শুরু হলে পরিশ্রম আরম্ভ হয়। চিন্তা-ভাবনা, সংশোধন, শব্দ-নির্বাচন ইত্যাদি প্রেরণা দ্বারা সিদ্ধ হয় না। কঠোর পরিশ্রম, অবিরাম সাধনা চাই।

স্পেণ্ডারের ভূমিকা থেকে একটি উল্লেখযোগ্য খবর জানা গেল। আলোচ্য সংগ্রহের দুটি প্রবন্ধ টাইম্‌স্ লিটারেরি সাপ্লিমেণ্টে প্রকাশিত হয়েছিল। স্পেণ্ডারের মতো লেখকের রচনাও টাইমস্ পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগ নতুন ভাবে বিন্যাস করে ছাপিয়েছিলেন। স্পেণ্ডার এজন্য ক্ষুব্ধ হননি; বরং সম্পাদকীয় পরিবর্তনের ফলে রচনার মান যে উন্নত হয়েছে তা স্বীকার করেছেন। সম্পাদক ও লেখকের মধ্যে এরূপ সহযোগিতা আমাদের দেশে আজকাল দুর্লভ।

Publishers : Hamish Hamilton ; London, 15/-

সম্রাজ্ঞী ইয়েহোনালা

চীন দেশের কৃষক ও নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজ নিয়ে শ্রীমতী পার্ল বাক এতদিন উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর নতুন বই Imperial Woman এর ব্যতিক্রম। চীনের শেষ সম্রাজ্ঞী ৎজু সি'র জীবনী নিয়ে এই উপন্যাসটি লিখেছেন পার্ল বাক। সম্রাজ্ঞীর চরিত্রটি নাটকীয় সংঘাতে পূর্ণ। রাজ-প্রাসাদের লোভ, দ্বন্দ্ব, বিলাসিতা ও ষড়যন্ত্রের চিত্র নিপুণভাবে এঁকেছেন লেখিকা। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায়ও পার্ল বাক সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

ইয়েহোনালা সতেরো বছরের তরুণী। অল্প বয়সে বাবার মৃত্যু হয়েছে; থাকে কাকার বাড়ি। খুড়তুতো বোন সাকোটা তার বন্ধু। ইয়েহোনালার বিয়ে প্রায় ঠিক হয়ে আছে জুং লুর সঙ্গে। ছেলেবেলা থেকেই দুজনের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক। জুং লু এখন রাজকীয় রক্ষীবাহিনীর দলপতি।

সম্রাট তাঁর মহিষী ও উপপত্নী নির্বাচন করবেন। রূপবতী মেয়েদের আহ্বান এসেছে রাজধানীতে যাবার জন্য। সম্রাটের সামনে দিয়ে মেয়েরা পর পর হেঁটে যাবে; সম্রাট ও রাজমাতা তাদের দেখে নির্বাচন করবেন। ইয়েহোনালার রূপের কথা অবিদিত নেই। তাকেও যেতে হবে রূপের পরীক্ষায়। আহ্বান এসেছে। আর সেই পরোয়ানা নিয়ে এসেছে জুং লু। কাকার মেয়ে সাকোটাও বাদ পড়েনি।

সম্রাটের আহ্বান তো অগ্রাহ্য করবার উপায় নেই! যেতেই হবে। যদি সম্রাট তাকে পছন্দ করেন তা হলে আর ফিরে আসা হবে না। জুং লুকে বিয়ে করবার এতদিনের স্বপ্ন যাবে ব্যর্থ হয়ে। জুং লুকে সে গভীরভাবে ভালবাসে। তাকে হারাবার আশঙ্কা সত্ত্বেও সম্রাজ্ঞী হবার লোভ ইয়েহোনালার তরুণ চিত্তে দোলা দেয়।

রাজপ্রাসাদে কুমারী মেয়েদের মিছিলের মধ্য থেকে সম্রাটের ইয়েহোনালাকে নির্বাচন করতে অসুবিধা হলো না। সুন্দরীদের মেলার মধ্যেও সৌন্দর্যে ও ব্যক্তিত্বে ইয়েহোনালা অনন্যা। তবু সম্রাজ্ঞীর মর্যাদা লাভ করবার সৌভাগ্য তার হলো না। মহিষী পদে বৃত হলো সাকোটা। সাকোটার পরলোকগত

দিদির সঙ্গে ছিল রাজপরিবারের যোগাযোগ ; সেই জন্যই সৌন্দর্যে খাটো হয়েও সে প্রধান স্থান পেল।

ইয়েহোনালার আর বাড়ি ফেরা হলো না। রাজপ্রাসাদের উপপত্নী মহলে স্থান হলো তার। সে মহলে খোজাদের প্রভুত্ব। বিকৃত কামনা সেখানকার জীবনকে করেছে কলুষিত। দিনের পর দিন কেটে যায়, সম্রাটের বিলাস কক্ষে যাবার আহ্বান আসে না। ইয়েহোনালা অন্যান্য উপপত্নীদের মতো অলসভাবে দিন কাটায় না ; সে নিয়ম করে পড়াশুনা আরম্ভ করেছে। বিশেষ আগ্রহ নিয়ে চর্চা করে রাজনীতির। যুবরাজ কুং পড়ায় চীনের ইতিহাস, আলোচনা করে চীনের সমস্যা। সবচেয়ে বড় সমস্যা বিদেশী জাতির প্রভুত্বলিপ্সা। ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ একে একে চীনের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চায় বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচারের ছল করে। তাদের ঠেকাতে হবে।

উপপত্নীদের প্রত্যেকের জন্য একজন করে প্রধান খোজা আছে। সম্রাটের প্রিয়পাত্রী হবে যে উপপত্নী, তার খোজার উপার্জন ও প্রতিপত্তি দুই-ই বাড়বে। তাই খোজারা ক্রমাগত সম্রাটের কাছে সুযোগ পেলেই ইয়েহোনালার রূপগুণের কথা উল্লেখ করত। এক রাত্রিতে ইয়েহোনালার সত্যি আমন্ত্রণ এলো সম্রাটের বিলাস কক্ষে। এ মহলে যেন উৎসব শুরু হয়ে গেল। প্রসাধন ও সাজপোষাকে পরিপাটির অন্ত নেই।

নির্দিষ্ট সময়ে সম্রাটের সামনে উপস্থিত হলো ইয়েহোনালা। সম্রাটের কাছে এসে মেয়েরা ভয়ে ও সম্ভ্রমে পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে। কিন্তু ইয়েহোনালার দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, তার সপ্রতিভ ব্যবহার এবং তেজোদীপ্ত রূপ সম্রাটকে মুগ্ধ করল। ইয়েহোনালা যখন নিজের ঘরে ফিরে এলো তখন তার সকল মোহ দূর হয়ে গেছে। কিসের বিনিময়ে সে তার প্রেম ত্যাগ করেছে, ফেলে এসেছে মুক্ত জীবন ? আশা ছিল সম্রাটকে তুষ্ট করে চীনের উপর কর্তৃত্ব লাভ করবে। সম্রাট বয়সে তরুণ, শক্তিতে বৃদ্ধ। ছেলেবেলা থেকে খোজাদের কলুষিত সংসর্গে মানুষ হয়েছে, ছদ্মবেশে নগরীর কুখ্যাত অঞ্চলে রাত কাটিয়েছে, ক্ষয় করে দিয়েছে নিজেকে। জুং লুকে হারিয়ে, মুক্ত আকাশে অবাধ বিচরণের অধিকার ত্যাগ করে, শুধু শূন্য হাতে সে রাজধানীতে বন্দিনী হয়ে থাকতে পারবে না। বেরুতে হবে এখান থেকে।

এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারে একমাত্র জুং লু। রাজধানীর সিংহদ্বার রক্ষা করবার দায়িত্ব তার। সম্রাটের উপপত্নীর সঙ্গে তার দেখা হতে পারে না।

ইয়েহোনালা নিজের ঘরে ডেকে পাঠাল জুং লুকে। নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ করতে তার একটুও ভয় হলো না। খোজাদের বোঝাল, লু আমাদের আত্মীয়। জুং লু এলো। রাজধানী থেকে বেরিয়ে যাওয়া যে অসম্ভব সে কথা বুঝিয়ে বলল। ইয়েহোনালা বলল : তুমি আমাকে এমন কিছু দিয়ে যাও যার স্মৃতি এখানকার জীবন সহ্য করতে সাহায্য করবে।

অনেকক্ষণ পরে জুং লু যখন বেরিয়ে এলো তখন খোজার দল পরস্পরের প্রতি মুখ টিপে হাসল।

ইয়েহোনালার মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। দূর করেছে অবসাদ। সম্রাটকে বশ করে ক্ষমতার অধিকারী হওয়া চাই; তা হলে জুং লুকে উচ্চপদ দিতে পারবে; লু-র সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করবার অন্তরায়ও যাবে দূর হয়ে। সম্রাটকে নিজের মুঠোর মধ্যে আনতে তার দেরী হলো না। এখন রাজকার্য সম্পর্কে পরামর্শ দেয় ইয়েহোনালা।

কয়েক মাস পরে ইয়েহোনালা সম্রাটকে একটি পুত্র সন্তান উপহার দিল। সাকোটার মেয়ে হয়েছে। সুতরাং এই ছেলেই হবে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। সেই অধিকারে ইয়েহোনালার প্রতিষ্ঠা বাড়ল। সম্রাট তাকে নতুন মর্যাদা দিলেন। তার নতুন নাম হলো ৎজু সি, অর্থাৎ পশ্চিম প্রাসাদের সম্রাজ্ঞী; সাকোটা হলো ৎজু আন, অর্থাৎ পূব প্রাসাদের সম্রাজ্ঞী। দুজনেরই সমান মর্যাদা। কিন্তু রাজ্য শাসন করে প্রকৃতপক্ষে ইয়েহোনালা। একদল তার বিরুদ্ধবাদী; রাজকুমারের জন্মের ইতিহাস নিয়ে তারা কাণাঘুষা করে। তার ছেলেকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্রও হয়েছিল। আশ্চর্য সাহস ও কৌশলের সঙ্গে ইয়েহোনালা সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করল।

চিররুগ্ন সম্রাট পরলোকগমন করলেন। শুরু হলো ক্ষমতালোভীদের দ্বন্দ্ব। ইয়েহোনালা এবারও দক্ষতার সঙ্গে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করে নাবালক পুত্রের নামে রাজ্য শাসন করতে লাগল। সাকোটাও সমান অংশীদার; কিন্তু নামে মাত্র। ক্ষমতা হাতে পেয়ে জুং লুকে রাজকীয় পরামর্শ সভার সভ্য করা হলো। চারদিক থেকে এর প্রতিবাদ উঠল। কিন্তু কে তা গ্রাহ্য করে?

ছেলের বিয়ে দিল ইয়েহোনালা। বিয়ের পর থকেই দেখা গেল ছেলে স্ত্রীর কথায় ওঠে বসে, মা-কে আর সমীহ করে চলে না। পুত্রবধূ সন্তানবতী; ছেলে হলে সম্রাটের পরেই হবে তার স্থান। রাজমাতার হাত থেকে চলে যাবে সকল ক্ষমতা। ক্ষমতার মদ যদি না থাকে, ভালোবাসা যদি সার্থক না হয়, তা হলে

কি নিয়ে থাকবে? ইয়েহোনালা পুত্রবধূর আকর্ষণ থেকে মুক্ত করবার জন্য পুত্রকে বিপথে নিয়ে যেতেও দ্বিধা করল না। তার ফলে সম্রাট আক্রান্ত হলেন দুরারোগ্য ব্যাধিতে। মা হয়ে ছেলেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে দ্বিধা করল না। ছেলের মৃত্যুর পর পুত্রবধূকে নির্দেশ দিল আত্মহত্যা করতে। সে নির্দেশ অমান্য করা চলে না। পুত্র, পুত্রবধূ এবং তাদের ভাবী সন্তান নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এবার ইয়েহোনালা সিংহাসনে বসাল তার বোনের নাবালক ছেলেকে। নাবালক হলেই তার সুবিধা। সম্রাটের নাম করে নিজে শাসন করতে পারে। সম্রাট সাবালক হতে চাইলেই ইয়েহোনালার উদ্যত রোষ নেমে আসবে তার মাথায়। চীনের জনসাধারণ সিংহাসনের উপর নারী দেখতে চায় না। তাই ইয়েহোনালাকে নাবলকের অভিভাবক হিসাবে রাজ্য শাসন করতে হয়।

বিদেশীরা দক্ষিণাঞ্চল ত্যাগ করে চীনের অভ্যন্তরে আসবার উদ্যোগ করছে। বক্সার বিদ্রোহীরা প্রবেশ করেছে রাজধানীতে। রাজসভায় নানা দল। কেউ তার পক্ষে, আবার অনেকে গোপনে ইয়েহোনালার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। কঠোর হস্তে বিরোধী পক্ষের লোকদের সে শাস্তি দেয়; নির্মম চিত্তে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে একটু দ্বিধাবোধও করে না। একবার বিপদ এমন ঘনিয়ে এলো যে, ইয়েহোনালাকে দলবল নিয়ে রাজধানী ত্যাগ করে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। ইংরেজদের সঙ্গে অপমানজনক সন্ধি করা ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা। চীনকে বিদেশী প্রভাব থেকে মুক্ত করবার জন্য ইয়েহোনালার চেষ্টা ছিল অবিরাম। দেশকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখত সে সারাক্ষণ। কিন্তু চীনা সৈন্যের হাতে ঢাল-তলোয়ার; বন্দুকের বিরুদ্ধে তা কতক্ষণ! নতুন সংস্কারের বিরুদ্ধে জনমত প্রবল। এমন কি ইয়েহোনালাও পাশ্চাত্ত্যের নতুন আবিষ্কার-গুলির সহায়তা গ্রহণ করতে নারাজ।

ইয়েহোনালা সর্বদা শুভানুধ্যায়ীরূপে পেয়েছে জুং লুকে। অনেক সময় জুং লু তার কাজের বিরোধিতা করেছে, কিন্তু পাশ থেকে সরে দাঁড়ায়নি। গুপ্ত ঘাতকের হাত থেকে জুং লু একবার তার প্রাণ রক্ষা করেছে। রাজকার্যের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যেও ইয়েহোনালার প্রথম প্রেম, তার একমাত্র প্রেম, হারিয়ে যায় নি। জুং লুকে দেখলে এখনো তার রক্ত অশান্ত হয়ে ওঠে, সম্রাজ্ঞী হয়েও জীবনের ব্যর্থতা সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হয়। কিন্তু জুং লু রাজপ্রাসাদেরই কোথাও থাকলেও তার সঙ্গে দুটো সুখ-দুঃখের কথা বলবার সুযোগ নেই।

জুং লু শুধুই একজন কর্মচারী। সম্রাজ্ঞীর সামনে এসে নতজানু হয়ে কুর্নিশ করে। এখানে দেয়ালের চোখ কান আছে। জুং লুকে পাশে বসিয়ে দুটো কথা বললে সে খবর ছড়িয়ে পড়বে চীনের সর্বত্র, সম্রাজ্ঞীর কলঙ্কের কাহিনী রাজনৈতিক রূপ লাভ করবে। তার ফল কত দুরপ্রসারী হবে কে বলতে পারে? তাদের দু'জনকে নিয়ে মুখরোচক আলোচনা বন্ধ করবার জন্য ইয়েহোনালা জুং লুর বিয়ে দিয়েছে। জুং লু বিয়ে করতে চায়নি। সম্রাজ্ঞীর আদেশে তাকে বিয়ে করতে হয়েছে।

জুং লু-র মৃত্যু হলো। জুং লু যখন মৃত্যুশয্যায় তখনো সে কাছে যেতে পারেনি, সেবা করতে পারেনি। কারণ সে যে সম্রাজ্ঞী। লু-র মৃত্যুর পরে ইয়েহোনালা একান্ত অসহায় বোধ করতে লাগল নিজেকে। রাত্রিতে স্বপ্ন দেখল জুং লু বলছে: তুমি যদি সকলের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করো, বিজ্ঞের মতো বুঝেসুঝে রাজকার্য পরিচালনা করো, তা হলে সর্বদাই তোমার পাশে থাকব।

এর পর থেকে আশ্চর্য পরিবর্তন হলো ইয়েহোনালার। সকলের সঙ্গে সহৃদয় ব্যবহার করে। মুখে গভীর প্রশান্তি। বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে নিয়মিত উপাসনা করে। কুসংস্কার ও গোঁড়ামি থেকে মুক্ত হয়েছে তার মন। দেশের তরুণদের ইংলণ্ড-আমেরিকা যাবার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে লাগল। পশ্চিমের শক্তির উৎসকে জানতে হবে। ওদের অস্ত্র দিয়েই ওদের আঘাত করতে হবে।

ইংলণ্ডের সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার কথা শুনেছে ইয়েহোনালা। প্রাচ্যে ভিক্টোরিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাজ্ঞী ইয়েহোনালা। চীনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল সম্রাজ্ঞী ৎজু সি-র নাম। প্রজারা তাকে ভয় করত, শ্রদ্ধা করত; সচেতন ছিল তার ব্যক্তিত্ব ও ক্ষমতা সম্বন্ধে।

ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর ছ' বৎসর পরে ইয়েহোনালার মৃত্যু হয়।

Publishers : Methuen, London. 16/-

ফ্রয়েড

ফ্রয়েড মানুষকে নতুন করে আবিষ্কার করেছেন। আমাদের মনের গভীরে তিনি পেয়েছেন নতুন মহাদেশের সন্ধান! এ আবিষ্কারের মূল্য ভৌগোলিক ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের চেয়ে অনেক বেশী। এই কারণে ফ্রয়েডের জীবনী প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট আগ্রহের বস্তু। ফ্রয়েড যদিও বলেছেন যে ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে তাঁর সাধনার যোগ নেই, তবু একথা সত্য বলে স্বীকার করা যায় না। কারণ মনঃসমীক্ষণের সূত্রগুলি সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে পৌঁছবার পূর্বে তিনি নিজের জীবনের ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করে দেখতেন। তাঁর 'ইন্টারপ্রিটেশান অব ড্রিমস' এবং 'থিওরি অব সেক্সুয়ালিটি' সম্বন্ধে তিনটি রচনা প্রধানতঃ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। মনঃসমীক্ষার পাঠকের উপযোগী একটি নির্ভরযোগ্য জীবনীর এতদিন অভাব ছিল। আর্নেস্ট জোন্স সেই অভাব পূরণ করেছেন। তিনি লিখেছেন Sigmund Freud : Life and Work. এই জীবনীর প্রথম খণ্ড The Young Freud (1856-1900) প্রকাশিত হয়েছে। জোন্স মনঃসমীক্ষণের বিশেষজ্ঞ; দীর্ঘকাল ফ্রয়েড ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। মূল চিঠিপত্র থেকে জীবনী রচনায় তিনি সাহায্য পেয়েছেন। এটি শুধুই জীবনী-গ্রন্থ নয়, মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসের একটি বিশেষ মূল্যবান অধ্যায়। ফ্রয়েড ও মনঃসমীক্ষণ সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য এই প্রথম জানা গেল। লেখক ফ্রয়েডের অন্ধ স্তাবকতা করেননি; তাঁর চরিত্রের ত্রুটি ও বৈশিষ্ট্যগুলি অসঙ্কোচে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। খুঁটি-নাটির অবতারণা করায় পুস্তকের কোন কোন অংশ অবশ্য একটু নীরস হয়ে পড়েছে।

১৮৫৬ সালের ৬ই মে মোরাভিয়ায় এক ইহুদি পরিবারে ফ্রয়েড জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর মৃত্যু হয় লণ্ডনে, ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। ফ্রয়েডের পিতা জেকব ছিলেন পশম ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ে অনিশ্চয়তার জন্য ফ্রয়েড পরিবারে আর্থিক অনিশ্চয়তা লেগেই ছিল। পিতার কাছ থেকে ফ্রয়েড পেয়েছেন স্বাধীন চিন্তা এবং মা'র কাছ থেকে পেয়েছেন গভীর অনুভূতির ক্ষমতা। তাঁর জন্মের পরে দেখা গেল খুব সূক্ষ্ম চামড়ার আবরণ দিয়ে

মাথাটি ঢাকা। ইহুদিদের মধ্যে এটা শুভ লক্ষণ বলে সংস্কার ছিল। ভবিষ্যতে এ রকম শিশুরা নাকি খ্যাতি লাভ করে। অনেকেই তাঁর মাকে এসে বলত, তোমার ছেলে পরিবারের নাম উজ্জ্বল করবে। যখন ফ্রয়েডের বয়স বছর এগারো তখন একদিন চায়ের দোকানে একজন অপরিচিত ব্যক্তি তাঁর সামনে এসে ভবিষ্যদ্‌বাণী করল তিনি মন্ত্রী হবেন। এই ভবিষ্যদ্‌বাণী বালকের চিত্ত স্পর্শ করেছিল। তাই পরবর্তী জীবনে মন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখেছেন তিনি। নানা লোকের মুখে ভবিষ্যদ্‌বাণী শুনে মা'র মন গর্বে ভরে উঠত, তাঁর অন্য সন্তান-দের বঞ্চিত করে ফ্রয়েডকে বেশী ভালোবাসতেন। ফ্রয়েড বলেছেন, যে শিশু মা'র হৃদয়ে অবিসংবাদী প্রাধান্য লাভ করতে পারে সারা জীবন তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও বিজয়ী মনোভাব জাগ্রত থাকে এবং এর ফলে শিশু বড় হয়ে সংসারে জয়ী হতে পারে।

ফ্রয়েডের মতে তিন বছর বয়সেই মানুষের চরিত্রের মূল ভিত্তিটা স্থির হয়ে যায়। তিনি নিজের জীবন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখেছেন যে, ঐ সময়কার দু' একটি অস্পষ্ট ঘটনা ছাড়া আর কিছুই মনে নেই। একবার কৌতূহলের (যৌন ?) বশবর্তী হয়ে দু'বছর বয়সে পিতার শয়নকক্ষে প্রবেশ করে বকুনি খেয়েছিলেন; ঐ বয়সে রাত্রিতে প্রায়ই তিনি বিছানা ভিজিয়ে দিতেন বলে বাবার কাছে বকুনি খেতে হতো। দু' বছর বয়সেই একবার তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, তুমি ভেবো না, বাবা; আমি তোমাকে একটা নতুন লাল বিছানা কিনে দেব। মা'র কাছ থেকে কখনো বকুনি খান্‌নি। তাই পরবর্তী জীবনে ফ্রয়েড সিদ্ধান্ত করেছেন যে, পিতা সংসারের কঠোরতা ও শাসনের প্রতীক এবং মা জীবনের সকল মাধুর্যের প্রতীক।

বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ফ্রয়েড শীঘ্রই মেধাবী ছাত্র বলে পরিচিত হলেন। বাড়িতে বাবা পড়াতেন, তার ফলে পড়ায় এগিয়ে যাওয়া সহজ হয়েছিল। তিনি আবার বোনদের পড়ায় সাহায্য করতেন। পনেরো বৎসর বয়স্ক বোন অ্যানাকে উপদেশ দিতেন, বালজাক ও ডুমা পড়বার বয়স এখনো তোমার হয়নি! ফ্রয়েড পাঠ্য-পুস্তকের বহির্ভূত অসংখ্য বই পড়তেন এবং তাঁর পড়ার বিষয় নির্দিষ্ট ছিল না। ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য সব কিছুই ছিল তাঁর প্রিয়। ইংরেজী সাহিত্য, বিশেষ করে সেক্সপীয়র, তাঁর খুব ভালো লাগত। বিদ্যালয় ত্যাগ করে তিনি দশ বৎসর শুধু ইংরেজী বই পড়েছিলেন।

সাধারণ শিক্ষা সমাপ্ত করে ফ্রয়েড ডাক্তারী পড়তে আরম্ভ করলেন। ডাক্তারী পাশ করবার পর চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা করবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর। কিন্তু আর্থিক অনটনের জন্য তা সম্ভব হলো না। গবেষণা ছেড়ে চাকরি নিতে হলো হাসপাতাল ও ক্লিনিকে। এ পথেও উন্নতির সম্ভাবনা চোখে পড়ে না। ফ্রয়েড সর্বদাই হতাশাক্লিষ্ট হয়ে থাকতেন। মার্থা নামক একটি তরুণীর প্রেমে পড়ায় অর্থাভাবের বেদনাটা আরো তীব্র হয়ে দেখা দিল। উপযুক্ত অর্থোপার্জন না করা পর্যন্ত মার্থাকে বিয়ে করতে পারবেন না। দীর্ঘকাল তাঁরা অপেক্ষা করলেন। এই সময়টা ফ্রয়েডের জীবন প্রেম ও দারিদ্র্যের দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। মার্থাকে যে সব চিঠি লিখেছেন ফ্রয়েড, তাদের মধ্যে তিনি কি করে একটি বেশী পয়সা উপার্জনের চেষ্টা করছেন, কত কষ্টে একটি পয়সা সঞ্চয় করছেন, তার বিবরণ পাওয়া যায়। মার্থার প্রতি আকর্ষণের ফলে তাঁর জীবনের পথও পরিবর্তিত হয়েছে। হাসপাতালে কাজ করবার সময় ফ্রয়েডের আকাঙ্ক্ষা ছিল চিকিৎসা জগতে নতুন কিছু আবিষ্কার করবার। সে উদ্দেশ্যে তিনি কোকেন নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। অস্ত্রোপচারের জন্য এবং বিশেষ করে চক্ষুর চিকিৎসায়, পেটের পীড়ায় ও দুর্বলতায় কোকেন যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সে সম্বন্ধে ফ্রয়েড নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন। তিনি কোকেনের এত ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, প্রতিদিন কোকেন খেতে আরম্ভ করেন। কোকেনের উপর গবেষণার ফলাফল যখন অর্ধেক লেখা হয়েছে তখন একদিন তাঁর হঠাৎ মনে পড়ল মার্থার সঙ্গে দু'বছর দেখা হয়নি। অর্ধসমাপ্ত লেখা ফেলে তিনি চললেন মার্থার কাছে। যাবার আগে কোকেনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে দু'জন বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। ফিরে এসে দেখলেন, বন্ধুরা তাঁর সূত্র ধরে কোকেন সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ করে খ্যাতি লাভ করেছে। এ গৌরব যদি ফ্রয়েড পেতেন তা হলে তিনি কখনো মনঃসমীক্ষার পথে আসতেন কিনা সন্দেহ।

দীর্ঘকাল অপেক্ষা করবার পর ফ্রয়েড মার্থাকে বিয়ে করেন। তাঁর আর্থিক অবস্থা তখনো বিশেষ ভালো হয়নি। কিন্তু আর অপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না বলে দারিদ্র্যের জীবন বরণ করবার জন্য তাঁরা প্রস্তুত হলেন। বিয়ের পূর্বে এক চিঠিতে মার্থার রূপ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ফ্রয়েড যে কথা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন:

Don't forget that 'beauty' stays only a few years, and

that we have to spend a long life together. Once the smoothness and freshness of youth is gone then the only beauty lies where goodness and understanding transfigure the features, and that is where you excel.

হয়তো মার্থার প্রতি গভীর প্রেমই ফ্রয়েডকে প্রথম মনঃসমীক্ষণের পথে নিয়ে গিয়েছিল। কারণ মার্থার চিঠি পেলেই ফ্রয়েড প্রত্যেকটি শব্দ গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়তেন, শব্দের পশ্চাদ্‌বর্তী মার্থার মন বুঝতে চাইতেন। চিঠি পড়লেই ফ্রয়েড বুঝতে পারতেন মার্থা কিছু গোপন করেছে অথবা সব-কিছু খোলাখুলি লিখেছে। ফ্রয়েডের অনুমান প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সত্য হতো। মার্থা ধরা পড়ে কতবার আশ্চর্য হয়ে গেছে।

চাকরি ছেড়ে ফ্রয়েড স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করলেন। কিন্তু রোগীর চিকিৎসা আরম্ভ করবেন কি, নিজের উপরে তাঁর আস্থা ছিল না। তাঁর কেবলই মনে হতো এ পথে সাফল্য অর্জন করবার প্রতিভা তাঁর নেই। চিকিৎসায় রোগীর কোন উপকার না হলে তিনি প্রায়ই ফীসের টাকা ফিরিয়ে দিতেন। পশার জমছে না, তবু মার্থাকে বিয়ে করে ঘরে আনলেন। নিদারুণ আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে তাঁদের বহু বৎসর কাটাতে হয়েছে। স্ত্রীকে সাপমুখো সোনার বালা দেবার আকাঙ্ক্ষা ফ্রয়েড মনে মনে পোষণ করেছেন দীর্ঘকাল, কিন্তু তা পূরণ করতে পারেননি কোনোদিন। এই দুঃখের সংসারে ফ্রয়েডের প্রধান আনন্দ ছিল তাঁর ছেলে-মেয়ের সাহচর্য। তিনি তাঁর সন্তানদের শুধু ভালোবাসতেন না, মাত্রাহীন আদরও দিতেন অনেক সময়। এই আদরের জন্যই তাঁর জ্যেষ্ঠ মেয়ের জীবন রক্ষা পেয়েছিল। মেয়ের বয়স তখন পাঁচ ছ' বছর, ডিপথেরিয়ায় শয্যাশায়ী, বাঁচবার আশা নেই। ফ্রয়েড প্রায় পাগল হয়ে গেছেন দুশ্চিন্তায়, জিজ্ঞাসা করলেন কি খেতে ইচ্ছা করে। মেয়ে কষ্টে জানালো, একটা স্ট্রবেরি খেতে ইচ্ছা করে। স্ট্রবেরির সময় নয় তখন, তবু সমস্ত শহর তন্ন তন্ন করে ফ্রয়েড স্ট্রবেরি সংগ্রহ করে আনলেন। রোগীর গলা প্রায় বুঁজে এসেছে। লোভের বশে তাড়াতাড়ি স্ট্রবেরি খেতে যাওয়ায় প্রবল কাশি উঠে গলার শ্লেষ্মা বেরিয়ে গেল। অনেক ওষুধ খেয়েও যে ফল হয়নি, একটি স্ট্রবেরি তা করল। ধীরে ধীরে বালিকা ভালো হয়ে উঠল।

ফ্রয়েড ক্রমশঃ প্রাইভেট প্র্যাক্‌টিস ছেড়ে মানসিক রোগগ্রস্তদের জন্য

হাসপাতাল ইত্যাদিতে কাজ আরম্ভ করলেন। এই কাজই তাঁর ভালো লাগল এবং শিগ্‌গীরই তিনি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠলেন।

গ্যেটে বলেছেন, যিনি প্রতিভাবান তিনি নিশ্চয়ই সত্যের পূজারী হবেন। প্রতিভা ও সততা পার্থক্য করা যায় না। এই মাপকাঠিতে ফ্রয়েড প্রথম শ্রেণীর প্রতিভার অধিকারী। তিনি সত্যকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য নিজের জীবনের একান্ত গোপনীয় কত কাহিনী, কত নিষিদ্ধ চিন্তা অসঙ্কোচে প্রকাশ করেছেন। নিজের মা, বাবা, স্ত্রী, বোন ও কন্যা সম্বন্ধে যেসব নিষিদ্ধ চিন্তা নিদ্রায় অথবা জাগরণে দেখা দিয়েছে তাদের সকলের সামনে প্রকাশ করবার মধ্যে দুর্জয় সাহস ও সত্যপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। মনের অন্ধকার গহ্বরে কালো চিন্তাগুলি যতদিন লুকিয়ে থাকে ততদিন আমরা নিশ্চিন্ত, সম্মানহানির ভয় নেই। ফ্রয়েড যখন নিজের ভাবনাগুলি বিশ্লেষণ করে প্রথম প্রকাশ করলেন তখন এর জন্য যে কত বড় সাহসের প্রয়োজন ছিল আজ তাঁরই সাধনার ফলে সেকথা আমরা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারি না।

Publishers : Hogarth Press ; London. 27/6.

চিরশিশু

প্রায় এক বছর আগে বিখ্যাত লেখক জন গান্থারের Death be not Proud পড়েছি। লেখকের একমাত্র পুত্র মস্তিষ্কে টিউমার হয়ে মারা গেল, তারই মর্মান্তিক বিবরণ নিয়ে বইখানি লেখা। লেখার গুণে একটি ব্যক্তিগত বেদনার কাহিনীও পাঠকের মন স্পর্শ করে। সম্প্রতি হাতে এসেছে প্রসিদ্ধ লেখিকা শ্রীমতী পার্ল বাকের আত্মজীবনীমূলক বই The child who never grew. শ্রীমতী বাকেরও একটিমাত্র সন্তান; জন্মের আগে থেকে একে ঘিরে মায়ের মনে কত রোমাঞ্চ, কত স্বপ্ন! তাঁর মেয়ের জীবন যদি স্বাভাবিক হতো তা হলে আজ বৃদ্ধ বয়সে কত নাতি নাত্‌নীর মধ্যে তিনি আনন্দোচ্ছল দিন কাটাতে পারতেন। কিন্তু জন্মের কয়েক বছর পরেই সকল আশা নির্মূল করে দিয়ে তাঁর মেয়ে প্রমাণ করল সে জড়বুদ্ধি, হাবা। প্রাকৃতিক নিয়মে তার দেহ বিকশিত হয়ে উঠেছে, কিন্তু মনের বিকাশ হয়নি একটুও। গান্থারের ছেলে মরে বাপ-মাকে দুঃখ দিয়ে গেছে, আর মেয়ে বেঁচে থেকে শ্রীমতী বাককে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অসহনীয় বেদনা দেবে।

শ্রীমতী বাকের কোলে যখন মেয়ে এলো তখন তাঁর পরিপূর্ণ যৌবন; থাকেন চীন দেশে। যৌবনের সুদৃঢ় আশাবাদ কোন আশংকার ছায়া তাঁর মনে ফেলতে দেয়নি। স্বামীর পরিবারে কিংবা পিতৃকুলে কোনো বংশানুক্রমিক রোগের ইতিহাস ছিল না। মেয়ের নধর স্বাস্থ্য; কোঁকড়ানো চুলের গুচ্ছ; গভীর নীল চোখ। যে দেখত তারই চোখ প্রশংসায় উজ্জ্বল হয়ে উঠত। আর গর্ব-স্ফীত মা তাকে চুমায় চুমায় আচ্ছন্ন করে দিতেন। আশংকার অবকাশ ছিল না।

তিন বছর বয়স হলো, তবু মেয়ের মুখে কথা ফুটল না। ভয় হলো। কিন্তু প্রতিবেশিনীরা বলল, সব ছেলেমেয়ে এক সময় কথা বলতে আরম্ভ করে না। সুতরাং চিন্তা করবার কী আছে? কিছুদিন পরে দু'একটা কথা বলতে আরম্ভ করল বটে, কিন্তু শ্রীমতী বাক লক্ষ্য করতে লাগলেন অন্য শিশুদের মতো তাঁর মেয়ে নয়; কোথায় যেন একটু অস্বাভাবিক কিছু আছে। অথচ বোঝা যায় না কোথায়। অনিশ্চিত আশংকার পীড়ন থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে

কয়েকজন ডাক্তার ডাকা হলো পরামর্শের জন্য। নানা প্রশ্ন করা হলো : জন্মের পর আঘাত পেয়েছে মাথায় ? বংশানুক্রমিক কোন রোগের ইতিহাস আছে ? এসব যখন নেই তখন কারণ বলা কঠিন। কিন্তু বুদ্ধির বৈকল্য যে ঘটেছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। দেহ স্বাভাবিক, কিন্তু মনের বৃদ্ধি নেই। ডাক্তাররা পরামর্শ দিলেন আমেরিকা যেতে।

শ্রীমতী বাক আমেরিকার বড় বড় ক্লিনিকে একের পর এক ঘুরে বেড়ালেন। কেউ উপকার করতে পারে না, অথচ সবাই আশা দেয়। এই অস্পষ্ট আশাটুকুই তাঁর জীবনের একমাত্র সম্বল। একে অবিশ্বাস করবার সাহস নেই। এক দিন এক ডাক্তারের ক্লিনিক থেকে যথারীতি আশ্বাস নিয়ে বেরিয়ে আসছেন, ডাক্তারের সহকারী, বোধ হয় জাতিতে জার্মান, তাঁর পেছনে বারান্দায় বেরিয়ে এলো। জার্মান বলেই নিষ্ঠুর সত্য বলতে বাধল না। বলল, আপনার মেয়ের দেহে যৌবন আসবে ; যৌবন গড়িয়ে যাবে বার্ধক্যে ; কিন্তু মন বাড়বে না। জন্মের মুহূর্তে মনের অবস্থা যেমন ছিল মৃত্যুর দিনেও থাকবে ঠিক তেমনি। আপনি মিথ্যা আশায় ঘুরবেন না। আজ পর্যন্ত এ রোগের ওষুধ বেরোয়নি।

হঠাৎ শ্রীমতী বাকের সম্মুখের জগৎটা মিথ্যা হয়ে গেল। উদ্গত অশ্রু গোপন করবার আপ্রাণ চেষ্টায় মুখ বিকৃত হয়ে উঠল। মেয়েটা অকারণেই হাসল মায়ের মুখের দিকে চেয়ে। শিশু যেমন ঘুমের মধ্যে নির্বোধ হাসি হাসে,—ঠিক তেমনি! সমস্ত শরীরে জ্বালা ধরে গেল ; অদম্য ইচ্ছা জাগল ঐ হাসি চিরদিনের জন্য ঘুচিয়ে দেবার।

তারপর কতদিন শ্রীমতী বাক নিজের মেয়ের মৃত্যু কামনা করেছেন। মা হয়ে সন্তানের মৃত্যু কামনা যে কত দুঃখে করতে হয় তা বুঝিয়ে বলবার নয়। তিনি যদি আগে মারা যান তা হ'লে কে দেখবে এই নির্বোধ চিরশিশু মেয়েটাকে ? অনেক দ্বন্দ্বের পর স্থির করলেন, জড়বুদ্ধি বালক-বালিকাদের জন্য একটা বোর্ডিং হাউসে রেখে দেবেন ওকে। যেদিন ওকে রাখতে গেলেন সেদিন হাবা মেয়েটার বাহুবেষ্টনী মুক্ত করে পালিয়ে আসতে কম বেগ পেতে হয়নি। মাকে চিনতে হয়তো জাগ্রত বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন হয় না। সেটা সহজাত।

শ্রীমতী বাক লিখে যা উপার্জন করেছেন তা সবই মেয়ের জন্য সঞ্চিত করে রেখেছেন। মেয়ে যতদিন বাঁচবে যত্নের ত্রুটি হবে না। মেয়ের কাছ থেকে শ্রীমতী বাক শুধু দুঃখই পাননি, শিক্ষাও পেয়েছেন। প্রথম জীবনে তাঁর মধ্যে

যে অহেতুক গর্ব ছিল সেটা আর নেই। মেয়ে তাঁর মনে জাগিয়েছে অবহেলিত নরনারীর প্রতি আন্তরিক মমতা। উপেক্ষিত যে-সব চীনা নর-নারী তাঁর উপন্যাসে নায়ক-নায়িকার মর্যাদা লাভ করেছে তাদের চিনতে সাহায্য করেছে ঐ জড়বুদ্ধি চিরশিশু মেয়েটা।

•

Publishers : Methuen ; London. 2/6.

রাত্রির পথে

১৯৪০ খৃস্টাব্দে Eugene O'Neill লিখেছিলেন, "Long Day's Journey into Night. তাঁর মৃত্যুর পরে নাটকটি প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর নিষেধ ছিল বলে এতদিন নাটকটি ছাপানো হয়নি। এই নাটকে ও'নীল তাঁর পরিবারের বেদনাময় ইতিহাস বলেছেন। মা, বাবা, বড় ভাই ও তাঁর নিজের কথা নিয়ে এই কাহিনী। পাত্র-পাত্রীর নাম ও পরিবেশ সামান্য পৃথক। অতি সহজেই ও'নীল পরিবারকে চেনা যায়। মিথ্যা গৌরববোধ দ্বারা চালিত হয়ে ও'নীল পরিবারের মহৎ ছবি আঁকেননি। যা সত্য তা অসঙ্কোচে প্রকাশ করেছেন। ও'নীলের নিজের ভাষায় বলা যায় এই নাটকটি "written in tears and blood". তাই মৃত্যুর পূর্বে এই নাটক জনসাধারণের হাতে তুলে দিতে তাঁর আপত্তি ছিল। ও'নীলের পাঠকের নিকট নাটকটির মূল্য খুব বেশি। অন্যের জীবনকে পাদপ্রদীপের সামনে এনে দাঁড় করানো সহজ। কিন্তু আত্ম-জীবনীমূলক কাহিনীর মাত্রা রক্ষা করা কঠিন কাজ। অপ্রিয় সত্য বলা আরো কঠিন। এই নাটকে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে যে সব তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে তা থেকে ও'নীলের ট্রাজেডিগুলির ইঙ্গিতার্থ স্পষ্টতর হবে।

এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়েছে সুইডেনে। সুইডেনই যোগ্য স্থান। সুইডেনের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার স্ট্রীণ্ডবার্গ নিজের জীবনের ঘটনাগুলিকে নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত নাটক 'দি ফাদার' দাম্পত্য জীবনের বিরোধের উপর রচিত। ব্যক্তিগত জীবনের কোনো গোপন কথাই নাটকে প্রকাশ করতে তিনি দ্বিধা করেননি, এবং 'দি ফাদার' ও অন্যান্য আত্মজীবনীমূলক নাটক রচিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই অভিনীত হয়েছে, স্ট্রীণ্ডবার্গের মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করবার প্রয়োজন ছিল না।

টাইরোন পরিবারের একটি সংকটময় দিনের কাহিনী ও'নীল তাঁর নাটকে বলেছেন। নাটকের চরিত্র চারজন। পরিবারের কর্তা জেম্স্ টাইরোন, তাঁর পত্নী মেরি এবং দুই পুত্র জেম্স্ ও এড্মাণ্ড। কর্তা টাইরোন একদা খ্যাতনামা অভিনেতা ছিলেন; এখন বয়স হয়েছে, পূর্বের মতো অভিনয় করতে পারেন-

না। প্রচুর সুরা পান করেন, এতে তাঁর অরুচি নেই। কিন্তু অন্য সকল ব্যাপারে অত্যন্ত কৃপণ। পত্নী মেরি স্বামীর জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনকে খাপ খাওয়াতে পারেননি। মদে তাঁর আসক্তি নেই, তিনি ধরেছেন অন্য নেশা। মরফিয়া ও ঐ জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করে চেতনাকে স্তিমিত করে রাখবার নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছে। হাতের আঙুলের গাঁটে গাঁটে আর্থ্রাইটিসের বেদনা বাসা বেঁধেছে ; সেই বেদনা উপশমের জন্য প্রথম মরফিয়া ব্যবহার করলেও এখন ওটা নেশায় পরিণত হয়েছে। সংসারে থেকেও তাঁকে সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না, সর্বদা মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকেন। বড় ছেলের বয়স তেত্রিশ, মাতাল ও চরিত্রহীন। জীবনের অধিকাংশ সময় কোনো কাজ না করে কাটিয়েছে। এখন বাবা তাকে রঙ্গমঞ্চে ঢুকিয়েছেন, ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয়। উজ্জ্বল না হবার কারণটা তার নিজের চরিত্রের মধ্যেই পাওয়া যাবে। রসেটির লাইন দু'টি এর সম্বন্ধে প্রযোজ্য :

> "Look in my face. My name is
> Might-Have-Been ;
> I am also called No More, Too
> Late, Farewell."

ছোট ছেলে এডমাণ্ড মায়ের প্রিয় সন্তান। বই পড়তে ভালবাসে। বিশেষ করে যাঁদের লেখায় অবক্ষয়ের সুর প্রাধান্য লাভ করেছে তাঁদের রচনার উপর এডমাণ্ডের ঝোঁক। নাবিকের চাকরি নিয়ে অনেক দেশ ঘুরে সে সম্প্রতি ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে দেশে ফিরে এসেছে। ক্ষয়রোগ হয়েছে, ডাক্তারের এই আশংকা। এডমাণ্ডের মধ্যে ও'নীলকে চেনা যায়। আর টাইরোনের মধ্যে তাঁর বাবাকে।

১৯১২ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মকালের একটি দিনে সকাল বেলায় নাটকের শুরু এবং সেদিনই দুপুর রাত্রিতে ঘটনার পরিসমাপ্তি। এই এক দিনের ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে পরিবারের সকল সমস্যা উপস্থিত করা হয়েছে। পরিবারের কর্তা ভ্রাম্যমাণ থিয়েটার দলের নায়ক হিসেবে জীবনের অধিকাংশ সময় বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছেন। বয়স হয়েছে, স্বাস্থ্য এখনো ভালো ; মদ খেতে ভালোবাসেন। সেক্সপীয়র তাঁর প্রিয় নাট্যকার। কথা বলতে গিয়ে প্রায়ই সেক্সপীয়রের নাটক থেকে উদ্ধৃতি বলে যান। ছেলেরা মানুষ হলো না, এই তাঁর দুঃখ। এডমাণ্ডের ক্ষয়রোগ হতে পারে এই আশংকা পরিবারের সকলের উপরে একটা গভীর বিষাদের ছায়া ফেলেছে। ক্ষয়রোগের কথা মা-কে এখনো জানানো হয়নি, তাঁকে বলা হয়েছে সর্দির কথা। কিন্তু এডমাণ্ড যে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছে

সে বিষয়ে একটা অনির্দেশ্য আংশকা মেরির মনকে চঞ্চল করে তুলেছে। পরিবারের ডাক্তার হার্ডি বিকাল বেলা তাঁর চরম মতামত জানাবেন, এই কথা বলে মা'কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। স্নায়ুরোগী মা অকস্মাৎ আঘাত পেলে কি হয় ঠিক নেই।

ডাক্তার হার্ডিকে নিয়ে জেম্‌স্ টাইরোন ও মা এবং ছেলেদের মধ্যে তর্কের সৃষ্টি হয়েছে। হার্ডি হাতুড়ে ডাক্তার, তার ফীস কম—এই জন্যই টাইরোন তাকে দিয়ে চিকিৎসা করান; এই হলো মা ও ছেলেদের অভিযোগ। শুধু এই ব্যাপারে নয়, সকল ক্ষেত্রেই বাবার কার্পণ্য পীড়াদায়ক। ছেলেরা সর্বদা বাবাকে কৃপণ স্বভাবের জন্য আক্রমণ করে। মেরি অভিযোগ করে, টাকা খরচ করতে টাইরোন নারাজ বলে এই আস্তানাকে বাড়ি করে তোলা যায় না। টাকার অভাবের জন্য এমনটি হয়নি; তাঁর কৃপণ স্বভাবই এর জন্য দায়ী। টাইরোন কষ্ট করে থেকে উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে সম্পত্তি কেনেন। এটা তাঁর নেশা দাঁড়িয়ে গেছে।

ও'নীল টাইরোনের চরিত্র কৃপণ করে দেখিয়েই ক্ষান্ত হননি। টাইরোনের প্রথম জীবনে ফিরে গিয়ে তিনি কৃপণ স্বভাবের ব্যাখ্যাটা দেখিয়ে পাঠকের মনে সহানুভূতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। টাইরোনের পিতার যখন মৃত্যু হয় তখন তাঁর বয়স মাত্র দশ বৎসর। পড়াশুনা বন্ধ হলো। ওয়ার্কশপের চাকরিতে গিয়ে ঢুকলেন। সামান্য বেতন, পশুর মতো খাটুনি। খাটুনির শেষে বাড়ি ফিরেও দেখতে হতো কঠোর দারিদ্র্যের ছবি। থিয়েটারের প্রথম যুগেও তাঁকে খুব কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। সুতরাং অর্থের মূল্য তাঁর কাছে অত্যন্ত বেশি। মৃত্যুর পূর্বে পাছে আবার অর্থাভাবে অনাহারে থাকতে হয়, এই ভয়ে কষ্ট সহ্য করেও ভবিষ্যতের জন্য সম্পত্তি সঞ্চয় করছেন।

মেরিও তাঁর বর্তমান জীবন নিয়ে সুখী নন। মরফিয়া ইন্‌জেকশান নিয়ে বাস্তব জীবনকে ভুলে থাকবার জন্য তিনি ব্যগ্র। এরও কারণ পাওয়া যাবে তাঁর অতীত জীবনের মধ্যে। মেরি কন্‌ভেণ্টে যখন পড়তেন তখন খৃস্টান সন্ন্যাসিনীদের জীবন তাঁর খুব ভালো লাগত। তিনি স্থির করেছিলেন লেখাপড়া শেষ করে সন্ন্যাসিনীর জীবন বরণ করবেন। কিন্তু হঠাৎ টাইরোনের সঙ্গে পরিচয় হবার পর তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গেল। রঙ্গমঞ্চে টাইরোনকে অভিনয় করতে দেখে তাঁর মন আকৃষ্ট হলো। মনে হলো টাইরোন তাঁকে রঙ্গমঞ্চের কল্পলোকের মতো কোন এক স্বপ্নলোকে নিয়ে যেতে পারবেন। কিন্তু বিয়ের পরে সে আশা ভেঙ্গে গেল। দেখলেন, নারীর স্বাভাবিক গৃহসুখের আশা

পর্যন্ত নেই। একান্ত দরিদ্র নারীও গৃহের উপর, তার নিজের সংসারের উপর কর্তৃত্ব লাভ করে; কিন্তু মেরি তা পেলেন না। ভ্রাম্যমাণ থিয়েটারের দলের সঙ্গে বেদের মতো তাঁকে ঘুরতে হয়েছে। হোটেলে, সরাইখানায়, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে তাঁর দিন কেটেছে। এমনি সব অস্থায়ী আস্তানায় জন্ম হয়েছে দুই ছেলের। স্বামী রাত্রিতে থিয়েটার করতেন, দিনের বেলা ঘুমাতেন। যেদিন থিয়েটার থাকত না সেদিন রেস্তোরাঁয় বসে মদের গ্লাস হাতে করে আড্ডা জমাতেন। মেরির সময় কাটত একা। নিঃসঙ্গ, নিরানন্দ জীবন এবং নারীর সহজাত কামনা গৃহসুখের অভাব তাঁর স্নায়ুবিকারের কারণ হয়েছে। ছেলেদেরও তিনি কাছে পাননি যে তাদের নিয়ে ভুলে থাকবেন। সুতরাং মেরির কেবল বিবাহপূর্ব জীবন মনে পড়ে; মনে হয়, ঐ সময়টাই ছিল সবচেয়ে সুখের।

নাটকের শেষ অঙ্কে বিষাদের পরিবেশটা গাঢ় হয়ে উঠেছে। ডাঃ হার্ডি এডমাণ্ডকে স্যানাটোরিয়ামে যাবার উপদেশ দিয়েছেন; টাইরোন সস্তা স্যানাটোরিয়ামে পাঠাবার প্রস্তাব করায় এডমাণ্ড বাবাকে কৃপণ বলে অভিযোগ করছে। বড় ছেলে জিমি রেস্তোরাঁ ও পতিতালয় ঘুরে দুপুর রাত্রিতে বাড়ি ফিরে এসেছে। মেরি অন্যদিন অপেক্ষা বেশি পরিমাণ মরফিয়া ইনজেকশান নিয়ে মোহাচ্ছন্নের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন। স্বপ্ন দেখছেন অতীতের সুখের জীবনের। ট্রাঙ্কের তলা থেকে বিয়ের পোষাকটা টেনে বের করে এনেছেন। এ জীবনে জেগে উঠতে চান না। তাহলেই তো এডমাণ্ডের যক্ষ্মা, বড় ছেলের লাম্পট্য, স্বামীর কৃপণ স্বভাব এবং গৃহপরিবেশের অভাবের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে!

ও'নীল তাঁর পিতামাতার জীবনের ব্যর্থতা সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন এই নাটকে। কৈফিয়ৎটি বলানো হয়েছে দ্বিতীয় অঙ্কে মেরির মুখ দিয়ে: "None of us can help the things life has done to us."

আলোচ্য নাটকটি ও'নীলের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির সমপর্যায়ের নয়। কারণ নাটকীয় ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের একান্ত অভাব। শুধু কথা দিয়ে যতটুকু সম্ভব ততটুকু নাটকীয় পরিবেশ তিনি সৃষ্টি করেছেন। মনে হয়, এই নাটক অভিনয় অপেক্ষা পড়বার পক্ষে বেশি উপযোগী। আত্মজীবনীমূলকতার মধ্যে এর প্রধান আকর্ষণ হলেও ভাগ্যের হাতে লাঞ্ছিত চারটি চরিত্রের বিষাদ-করুণ চিত্র ও'নীলের রচনার গুণে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

Publishers: Jonathan Cape; London. 12/6

প্রেমের কবিতা

পুরুষ সৃষ্টির পরই ব্রহ্মার মাল-মশলা সব ফুরিয়ে গেল। অথচ বেচারা পুরুষ একা একা এই বিরাট পৃথিবীতে কী করে থাকবে তা ভেবে ব্রহ্মা চিন্তিত হলেন। যা হোক একটা করতে হবে। ব্রহ্মা করলেন কি, এক ঝাঁক মৌমাছি, উজ্জ্বল সূর্যকিরণ, জলভরা মেঘ, বাতাসের চাঞ্চল্য, খরগোসের ত্রস্ততা, ময়ূরের গর্ব, মধুর মিষ্টত্ব, বাঘের নিষ্ঠুরতা, আগুনের উত্তাপ, তুষারের শীতলতা, কোকিলের কুহুধ্বনি, চক্রবাকের প্রেমনিষ্ঠা ইত্যাদি সংগ্রহ করে, বেশ ভালো করে মিশিয়ে একটি নতুন জীব সৃষ্টি করলেন। তাকে পুরুষের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, এই নাও, একে সঙ্গী করে জীবন যাপন করো। পুরুষ তো খুশি হয়ে নতুন জীবটি নিয়ে চলে গেল।

কিন্তু আটদিন পরেই ফিরে এলো। বললে, প্রভু, যে জীবটি আপনি আমাকে দিয়েছেন সে আমার জীবন বিষিয়ে তুলেছে। অনর্গল বকবক করে কথা বলছে, কান ঝালাপালা হয়ে গেল। নিজে কাজ করবার কোন সুযোগ পাচ্ছি না। একটা কিছু ছুতা ধরে কান্না শুরু হয়ে যায়। কোন একটা কাজের কথা বললেই শোনা যাবে শরীরটা ভালো নেই। আপনি ওকে ফিরিয়ে নিয়ে আমাকে মুক্তি দিন।

ব্রহ্মা বললেন, বেশ, রেখে যাও। পুরুষ কিন্তু আটদিন পরে আবার এসে হাজির। একটু দ্বিধার সঙ্গে বলল, বড় একা একা আছি; কাজকর্ম সব বন্ধ হয়েছে। কেবল ওর নাচ, গান, খেলার কথা মনে পড়ে। চোখ বুজলে শুধু ওরই মুখ দেখতে পাই। আবার ওকে নিয়ে যেতে অনুমতি করুন।

ব্রহ্মা হেসে সেই নতুন জীবটি আবার এনে দিলেন। মাত্র তিন দিন পরে পুরুষটি এসে উপস্থিত। বলল, প্রভু, এ বড় তাজ্জব ব্যাপার। আপনার কাছে বলে কয়ে ওকে নিয়ে গেলাম। এখন দেখছি ওর সাহচর্যে সুখের চেয়ে বিরক্তি বেশি। ওর সঙ্গে তো থাকতে পারব না, ওকে আপনার কাছেই রেখে যাচ্ছি।

ব্রহ্মা এবার তেড়ে মারতে এলেন : ওকে ছাড়া তো থাকতেও পারো না দেখছি! তোমরা দুজনে দূর হয়ে যাও, আর কখনো আমার সামনে আসবে না।

নারী সৃষ্টির এই কাহিনী পুরাণ থেকে ইংরেজীতে পরিবেশন করেছেন তাম্বুমত্তু। Tambumuttu সিংহলী কবি। তিনি লণ্ডন Poetry-র ভূতপূর্ব সম্পাদক। তাম্বুমত্তু সংকলন ও অনুবাদ করেছেন India Love Poems. ভূমিকায় সম্পাদক ভারতীয় নারীদের পরিচয় দিয়েছেন। পরিচয়টি বিদেশী পাঠকদের উদ্দেশ করে লেখা; সংক্ষিপ্ত হলেও সুলিখিত।

ভারতীয় সাহিত্যের কয়েকটি পুরানো প্রেমের কবিতা ও কাব্যাংশ অনুবাদ করে এই গ্রন্থে পরিবেশন করা হয়েছে। আধুনিক কবিতা গ্রহণ করা হয়নি। সংস্কৃত ও দক্ষিণ ভারতীয় সাহিত্যকে এই সংকলনে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আসামী এবং হিন্দীও স্থান পেয়েছে। বাঙলা কাব্যের প্রতি উপেক্ষাটা বিস্ময়-জনক, কারণ সম্পাদক বাঙলা সাহিত্যের সম্পদ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ নন।

অনুবাদ মোটামুটি ভাল বলা যেতে পারে। নগ্ন নারী মূর্তির কাঠ খোদাই-গুলি দিয়ে সুরুচি ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি কানাড়ী ভাষার কবিতার ইংরেজী অনুবাদ উদ্ধৃত করা হলো :

Answer me, smart youth,
The sugar-cane is crooked—
Is its juice not strength ?
The line of the eye is not straight—
Are the looks crooked ?
The shape of the banana is curved—
Is the taste dull ?
The lips are not straight—
Are kisses crooked ?
The moon is not straight—
Is the moonlight crooked ?
My fate is contorted—
Is my love crooked !

Publishers : Peter-Pauper Press ; New York. 13/2/-.

মোপাসাঁর উপন্যাস

মোপাসাঁর গুণমুগ্ধ পাঠক পৃথিবীর সকল দেশেই পাওয়া যাবে। এমন জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও মোপাসাঁর জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে বই পাওয়া কঠিন। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরাসী সাহিত্যের অধ্যাপক E.D. Sullivan মোপাসাঁর উপন্যাসের আলোচনা করে এই অভাব কিছুটা দূর করেছেন। বইটির নাম: Maupassant, the Novelist.

মোপাসাঁ ছয়টি উপন্যাস লিখেছেন। এ ছাড়া দুটি উপন্যাস আরম্ভ করে শেষ করতে পারেননি। সাহিত্য সম্বন্ধে, বিশেষ করে উপন্যাসের আঙ্গিক সম্বন্ধে, মোপাসাঁর মত কি ছিল তা জানতে পারলে তাঁর উপন্যাস বিচারে সুবিধা হবে। মোপাসাঁ কোথাও কোথাও বলেছেন যে, সাহিত্যের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় তাঁর আগ্রহ নেই; কারণ, সৃষ্টিশীল লেখক নিজস্ব পথ ধরে চলে, তত্ত্বের আলোচনা করে, তাকে নিজের পথ থেকে বিচ্যুত করা যায় না। তথাপি সাহিত্যের উপর মোপাসাঁর প্রবন্ধের সংখ্যা কম নয়। বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য তাঁর সর্বাপেক্ষা সার্থক উপন্যাস Pierre et Jean-এর ভূমিকাটি। এই ভূমিকায় মোপাসাঁ উপন্যাস সম্বন্ধে তাঁর মতামত ব্যাখ্যা করেছেন।

অধ্যাপক সালিভান গ্রন্থের প্রথমার্ধে আলোচনা করেছেন কথা-সাহিত্য সম্বন্ধে মোপাসাঁর অভিমত নিয়ে। এই আলোচনার ভিত্তি মোপাসাঁর সাহিত্য সম্পর্কিত প্রবন্ধ এবং চিঠিপত্র। মোপাসাঁ সামান্য বেতনে সরকারী দপ্তরে চাকরি করতেন, গল্পকার হিসাবে খ্যাতি লাভ না করা পর্যন্ত তাঁকে উপরি উপার্জনের উপায় স্বরূপ বিভিন্ন কাগজে প্রবন্ধ লিখতে হয়েছে। এরূপ ২২৭টি প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের অধিকাংশই গ্রন্থাকারে পুনর্মুদ্রিত হয়নি। আশ্চর্যের কথা এই যে, সাহিত্যের নানা বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করলেও ছোট গল্পের আলোচনা নেই। গল্প রচনার কৌশল তাঁর পক্ষে সহজাত প্রতিভা ছিল বলেই হয়তো মোপাসাঁ বিশেষরূপে এ বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেননি।

শিল্পী ও লেখক সর্ববিষয়ে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে না চললে সাফল্য

লাভ করা সম্ভব নয়, এই ছিল মোপাসাঁর দৃঢ় অভিমত। সরকারী নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে যেমন লড়াই করতে হবে, তেমনি প্রত্যাখ্যান করতে হবে সরকারী সাহায্যের প্রলোভন। লেখক ও শিল্পীর প্রতিভা বিচার করবার ভার থাকবে অনধিকারীদের হাতে,—এই অপমানকর ব্যবস্থা অসহনীয়। এই জন্যই সরকারী অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতা কখনো প্রতিভাকে আবিষ্কার করতে পারে না। প্রতিভা আবিষ্কার করে পাঠকরা ; যে রচনার মূল্য আছে, তা একদিন স্বীকৃতি লাভ করবেই। এই স্বীকৃতি লাভের পরে আসে সরকারী পুরস্কার। প্রতিভা বিকাশের জন্য তখন তার আর প্রয়োজন কি ?

মোপাসাঁর শ্রেণী বিভাগ হিসাবে উপন্যাস প্রধানতঃ দু'রকমের : সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট। মোপাসাঁর নিজের রচনা প্রথম শ্রেণীতে পড়ে ; স্তাঁদলের উপন্যাস দ্বিতীয় শ্রেণীর। সুস্পষ্ট কাহিনীর লেখক মোপাসাঁর মতো চরিত্রগুলি কাজ ও ঘটনার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলে। লেখক এখানে তার চরিত্র যে-সব কাজ করেছে তাদের ব্যাখ্যা দেবে না। বাইরে থেকে লেখক যা দেখতে পাচ্ছে তাই সে বলে যাবে। তার সাফল্য নির্ভর করবে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির উপর। নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণের ক্ষমতাই ঔপন্যাসিকের সবচেয়ে বড় গুণ। বড় ঔপন্যাসিকের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো জীবনের যথার্থ ছবি আঁকবার ক্ষমতা। মানুষের জীবনই লেখকের শিল্পসৃষ্টির একমাত্র উপাদান। ভাবাবেগ ও আদর্শের মোহে সেই জীবনকে বিকৃত করে দেখালে শিল্প ক্ষুন্ন হবে। আদর্শবাদের রঙীন চশমা দিয়ে জীবনকে দেখবার প্রলোভন কিন্তু কম নয়। কারণ, আমরা জীবনের নগ্ন সত্যকে গ্রহণ করতে ভয় পাই। যার নিজের জীবন পাপে পূর্ণ, উপন্যাসের মধ্যে সে পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয় দেখতে পেলে সুখী হয়।

জীবনকে হুবহু উপন্যাসের পাতায় প্রতিফলিত করলেই সফল সৃষ্টি হয় না। বাস্তব জীবনের শিল্পমণ্ডিত রূপটা তুলে ধরা চাই। এর জন্য লেখককে ঘটনা নির্বাচন করতে হবে। সত্য হলেও সব ঘটনা উপন্যাসে স্থান পেতে পারে না। আর করতে হয় সংযোজন। উপন্যাসের বিখ্যাত চরিত্রগুলি বাস্তব জীবনের কোনো একটি বিশেষ মানুষের ছায়া নয়। অনেক মানুষ দেখার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সংযোজন করে তিলোত্তমার মতো একটি চরিত্র সৃষ্টি করা হয়।

মোপাসাঁ মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসকে অস্পষ্ট বলেছেন। কারণ মানুষের মনের অন্ধকার জগতকে স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। কিছুটা

অস্পষ্টতা থেকেই যায়। মোপাসাঁ বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁর সৃষ্ট নর নারীর জীবন দেখেছেন। মুখ দেখে মনের গতিবিধি সম্বন্ধে যতটুকু অনুমান করা যায় মোপাসাঁ তার বেশি বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেননি। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক ঔপন্যাসিকরা তাঁদের পাত্র পাত্রীর একেবারে অন্তরে প্রবেশ করে সকল কাজের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন। মোপাসাঁর আপত্তি এই যে, এ জাতের লেখকরা কখনো নৈর্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষক হতে পারেন না। মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস যাঁরা লেখেন তাঁদের রচনা প্রধানতঃ আত্মজীবনীমূলক হতে বাধ্য। কেন না, বাহিরের জীবনের ঘটনাগুলি দেখতে পাওয়া যায়, এবং তা থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার সুযোগ আসে। কিন্তু মনের জীবন তো চোখে দেখা যায় না। বিশেষ কোনো এক পরিস্থিতিতে লেখকের মনে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সেই অভিজ্ঞতা দিয়ে পাত্র-পাত্রীদের মনের গতিবিধি বিশ্লেষণ করা ছাড়া উপায় কি! বলা বাহুল্য, এ পদ্ধতি মোপাসাঁর মনঃপূত ছিল না।

কিন্তু মোপাসাঁর নৈর্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণের তত্ত্ব বেশী দূর টেনে নেওয়া যায় না। তিনি নিজেই তা পারেননি। পাত্র-পাত্রীরা যদি চিন্তাশীল হয়, তারা যদি একমাত্র আহার-নিদ্রাকেই সম্বল না করে, তা হলে কাহিনীকারের পক্ষে মনোবিশ্লেষণ ছাড়া উপায় কি? মনন-প্রধান নর নারীকে উপন্যাসে উপস্থিত করলেই তাদের মনের ছবি দেখাতে হবে। মন না দেখালে তাদের দেখা তো সম্পূর্ণ হতে পারে না।

মোপসাঁর Une Vie, Bel-Ami ও Mont-Oriol উপন্যাস তিনটি "সুস্পষ্ট" শ্রেণীর অন্তর্গত। মনোবিশ্লেষণ এখানে প্রায় অনুপস্থিত। মোপাসাঁ তাঁর পাত্র-পাত্রীদের বাহির থেকে দেখেছেন, তাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করবার চেষ্টা করেননি। Une Vie (একটি জীবন)-এ একটি অসুখী নারীর কাহিনী বলা হয়েছে। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে দুর্ভাগ্য তাকে তাড়া করেছে; স্বামী ও পুত্রের কাছ থেকে যে সুখ পাবে আশা করেছিল তাও ব্যর্থ হয়ে গেল। একমাত্র আশা এখন নাতিকে ঘিরে। তবু সে-ও যে একদিন স্বামী-পুত্রের মতোই হতাশ করবে তার ইঙ্গিতটাও পাওয়া যায়।

এখানে যেমন একটি নারীর অতলস্পর্শ দুঃখের গহ্বরে ক্রমপতনের ইতিহাস, তেমনি Bel-Ami তে পাওয়া যাবে একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী পুরুষের জাগতিক সাফল্যের উচ্চতম চূড়ায় আরোহণের কাহিনী। সাফল্য লাভের জন্য সে নীতি ও ধর্মকে অগ্রাহ্য করে চলতে দ্বিধা বোধ করেনি। যে

কোনো মূল্যে সাফল্য লাভ করাই ছিল তার মূলমন্ত্র। Mont-Oriol একটি স্বাস্থ্যকর উষ্ণ প্রস্রবণের পটভূমিকায় রচিত প্রেমের কাহিনী।

এই তিনটি উপন্যাসেই মোপাসাঁ নৈর্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণের আদর্শ অনুধাবন করেছেন। Une Vie বহুলাংশে আত্মজীবনীমূলক হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে অনেকটা নিরপেক্ষ দর্শকের দৃষ্টিতে দেখতে পেরেছেন তা থেকে তাঁর আদর্শের প্রতি দৃঢ় আস্থার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আর একটি বৈশিষ্ট্যের জন্যও এই তিনটি উপন্যাস চিহ্নিত। এই উপন্যাসগুলির প্রত্যেকটি যেন কতকগুলি ছোট গল্পের সমষ্টি। একটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে সমধর্মী গল্পগুলিকে পর পর সাজানো হয়েছে। প্রত্যেকটি উপন্যাস ভেঙ্গে কয়েকটি সুন্দর ছোট গল্প পাওয়া যেতে পারে। দৃঢ়-সংবদ্ধ ঘটনা-শ্রেণীকে একটি কেন্দ্রের দিকে টেনে নিয়ে কাহিনী বলবার প্রচেষ্টা নেই।

মোপাসাঁ পরবর্তী উপন্যাস তিনটিতে নতুন রীতি অবলম্বন করেছেন। এরা শুধুই বিচ্ছিন্ন কাহিনার শিথিল সমাবেশ নয়, মূল কাহিনীর মধ্যে প্রত্যেকটি ঘটনা অবিচ্ছেদ্যরূপে সংযুক্তি লাভ করেছে। এ ছাড়া দেখা যাবে মানসিকতার প্রাধান্য। কঠোর অবজেক্টিভিটির পরিবর্তে এসেছে সাবজেক্টিভ বিশ্লেষণ প্রবণতা।

Pierre et Jean মোপাসাঁর সর্বাপেক্ষা সার্থক উপন্যাস, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। Pierre ও Jean দু'ভাই মিলেমিশে আছে। ওদের এক আত্মীয়ের মৃত্যুর পর দেখা গেল তিনি উইল করে ছোট ভাইকে সম্পত্তি দিয়ে গেছেন, পীয়ের কিছুই পায়নি। এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করে আত্মীয়স্বজন ও পীয়ের-এর মনে সংশয় জাগল। অনুসন্ধানে জানা গেল Jean তার আপন ভাই নয়; মৃত ভদ্রলোকের ঔরসজাত মায়ের অবৈধ সন্তান। ছোট ভাই মাকে ত্যাগ করল না। কিন্তু পীয়ের এই আকস্মিক রূঢ় আবিষ্কারে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। সে সমুদ্রগামী জাহাজে ডাক্তারের চাকরি গ্রহণ করে দেশ ত্যাগ করল।

পীয়ের-এর চোখ দিয়ে এই ঘটনাটি দেখা হয়েছে। সুতরাং কাহিনার এক-মুখিনতা ক্ষুণ্ণ হতে পারেনি। তাছাড়া, পীয়ের-এর মনের উপর যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা কাহিনার সঞ্চালকের কাজে করেছে বলে মনের জগতকে না এনে উপায় ছিল না।

পরবর্তী উপন্যাস দু'টির শিল্পকীর্তি হিসাবে যে মূল্যই থাক, মোপাসাঁর

জীবনের ছায়া পড়েছে বলে তারা বিশেষরূপে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের দাবী করতে পারে। Fort comme la mort (মৃত্যুর চেয়ে শক্তিশালী) স্পষ্টতঃই আত্মজীবনীমূলক। এই উপন্যাস রচনা করবার সময় মোপাসাঁর বয়স ছিল মাত্র আটত্রিশ। কিন্তু এর মধ্যেই মারাত্মক রোগ তাঁর জীবন বিপর্যস্ত করে তুলছে। কয়েক বছর পূর্বে যে অফুরন্ত সৃষ্টির উৎস বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল, এখন তা শুকিয়ে আসছে। মোপাসাঁ বুঝতে পেরেছেন। বার্ধক্য নয়; শিল্পীর মৃত্যু, সৃষ্টিধারা শুকিয়ে যাওয়া। এই উপন্যাসের কাহিনীতে পড়েছে সেই আতঙ্কের কালো ছায়া। শিল্পী উপলব্ধি করেছে তার প্রতিভা দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে, সে ফুরিয়ে যাচ্ছে। চিত্র-শিল্পী বারতঁ্য তার প্রণয়িনীর তরুণী কন্যাকে দেখে নিজের সঙ্গে তুলনা করে চমকে উঠল। যৌবনোচ্ছল প্রাণের ধারা থেকে, সৃষ্টির পথ থেকে, সে কত দূরে চলে এসেছে। এর পরে আর বেঁচে থেকে লাভ কি! ভুলে গেল তার এতদিনের প্রণয়িনীকে; ভালোবাসল যৌবন-ভাস্বর তার মেয়েকে। কিন্তু যৌবনপুষ্ট জীবনকে আঁকড়ে ধরবার শক্তি আর নেই। দেহের শক্তি ও শিল্পসৃষ্টির ক্ষমতা—দুই-ই সে হারিয়েছে। হারাবার বেদনার সঙ্গে যোগ হয়েছে অপচয়ের অনুশোচনা। যখন ক্ষমতা ছিল তখন হিসাব করেনি, ধূলোর মতো দু'হাতে নিজেকে উড়িয়ে দিয়েছে। এখন শান্তি আছে মৃত্যুর মধ্যে! বিভ্রান্ত চিত্তে পথ চলতে চলতে একদিন মোটরগাড়ী চাপা পড়ে সেই আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর দেখা পেল।

সর্বশেষ উপন্যাস Notre Coeur (আমাদের হৃদয়) অনেকটা তত্ত্বমূলক। সেকালের "আধুনিকাদের" চরিত্র দেখিয়েছেন মোপাসাঁ। এই শ্রেণীর মেয়েরা শিল্পীদের জীবনে বিপর্যয় আনে, এই তত্ত্বটাই মোপাসাঁ বলতে চেয়েছেন। তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার ছাপ পড়া সত্ত্বেও কাহিনীটি সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি।

মোপাসাঁর খ্যাতি তাঁর উপন্যাসের উপর নির্ভর করে না। তথাপি তাঁর উপন্যাসের মূল্য কম নয়, এবং সমগ্রভাবে তাঁর সাহিত্য কীর্তির বিচার করতে হলে এদের উপেক্ষা করা চলে না। অধ্যাপক সালিভানের আলোচনা সমালোচকদের নিকট অবহেলিত মোপাসাঁর সাহিত্য-সাধনার এই অংশটির উপর আলোকপাত করেছে।

Publishers : The University Press ; Princeton. 4.00.

রূপকথার যাতুকর

বড়দের জন্য বই লিখে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন এমন লেখক অনেক আছেন। কিন্তু পৃথিবীর সকল দেশের কিশোরদের মন জয় করবার মতো লেখক মাত্র একজন, তিনি হান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যাণ্ডারসেন। তাঁর গল্পগুলি সকল দেশের সাহিত্য এমন সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করেছে যে, লোকে লেখকের নাম ভুলে যায়, মনে করে গল্পগুলি বুঝি তাদের দেশেরই সম্পত্তি। অভিজ্ঞ সমালোচকেরা বলেন যে, অ্যাণ্ডারসেনের রূপকথার নির্ভরযোগ্য অনুবাদ কোনো ভাষাতেই হয়নি। এই ত্রুটি সত্ত্বেও এরূপ জনপ্রিয়তার কারণ কি? মোটামুটি তিনটি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। অ্যাণ্ডারসেন কিশোরদের ছোট বলে উপেক্ষা করতেন না; তাদের জন্য লেখবার সময় কোনো শৈথিল্য বা অযত্ন প্রশ্রয় দিতেন না; তাঁর রচনা-কৌশল এমন অভিনব যে, মনে হবে কেউ যেন সামনে বসে গল্প বলছে, বই থেকে পড়ছি না। কিশোরদের পক্ষে এই রচনারীতি সহজেই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। শুধু কিশোররাই তাঁর গল্পের পাঠক নয়। অ্যাণ্ডারসেন লেখবার সময় তাদের মা-বাবা, দাদা-দিদিদেরও মনে রেখেছেন। তাই তাঁর রূপকথাগুলি বড়দের কাছেও সমান প্রিয়। আর সবচেয়ে বড় কথা, অ্যাণ্ডারসেনের গল্পগুলি শুধুই উদ্ভট কল্পনা-কাহিনী নয়। প্রত্যেকটি রূপকথার সঙ্গে তাঁর জীবনের কোনো ঘটনা বা গভীর অনুভূতির যোগ রয়েছে। মারমেডের চোখ দিয়ে কখনো জল পড়ে না; তাই তাদের বেদনা দুর্বিষহ; এই মারমেড তো অ্যাণ্ডারসেনেরই হৃদয়! যে হৃদয়ের বেদনা প্রকাশ করা যায় না, সহানুভূতির সঙ্গে শুনবে এমন লোক নেই। এমনি করে রূপকথার প্রত্যেকটি পশু, পাখী, পরী, রাজপুত্র, রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর জীবনের যোগ আছে। তাই গল্পগুলিতে পাওয়া যায় দরদ ও প্রাণের স্পর্শ।

অ্যাণ্ডরসেন বলেছেন, আমাদের জীবনই হলো সবচেয়ে বিস্ময়কর রূপকথা। **অন্ততঃ অ্যাণ্ডারসেনের জীবন সত্যি একটি চমৎকার রূপকথা। শ্রীমতী Rumer Godden অ্যাণ্ডারসেনের জীবনের গল্পকে নতুন করে বলেছেন। লেখিকা ঔপন্যাসিক; তাঁর হাতে অ্যাণ্ডারসেনের জীবনী উপন্যাসের মতোই চিত্তাকর্ষক হয়েছে।**

১৮০৫ সালের ২রা এপ্রিল ডেনমার্কের ছোট্ট শহর ওডেন্সে অ্যাণ্ডারসেনের জন্ম হয়। তাঁর বাবার বয়স তখন মাত্র বাইশ; জুতা তৈরী করা ছিল জীবিকার্জনের একমাত্র পথ। এ কাজে বিশেষ দক্ষতা না থাকায় উপার্জন বেশি হতো না। অত্যন্ত অভাবের মধ্যে দিন চলত। অ্যাণ্ডারসেনের বাবা ভালো জুতা তৈরী করতে না পারলে কি হবে, অন্য গুণ ছিল তাঁর। তিনি চমৎকার গল্প বলতে পারতেন; তুচ্ছ জিনিস দিয়ে সুন্দর সুন্দর খেলনা তৈরী করতে তিনি ছিলেন ওস্তাদ। একটু বড় হবার পর থেকেই ছেলেকে কাছে বসিয়ে কাজ করতে করতে নানা গল্প করতেন। সব না বুঝলেও অ্যাণ্ডারসেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো নীরবে গল্প শুনত। মাত্র আট বছর বয়সে তার বাবার মৃত্যু হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে অ্যাণ্ডারসেনের নিশ্চিন্ত শিশু-জীবনের সমাপ্তি ঘটল। মৃত্যুর পূর্বে বাবা মা-কে বলে গেছেন, অ্যাণ্ডারসেন যা করতে চায় তাই করতে দিও; বাধা দিও না।

অ্যাণ্ডারসেন লম্বা, ছিপ্‌ছিপে, কুৎসিত চেহারার এবং অদ্ভুত স্বভাবের ছেলে। সে অনর্গল গল্প বলতে পারে, পুতুল দিয়ে থিয়েটার করে, অভিনয় এবং গান করে একা একা। একমাত্র সঙ্গী ছিলেন বাবা; এখন আর কেউ সঙ্গী নেই। দরিদ্র ছেলেদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয়ে তাকে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে। সহপাঠীরা অ্যাণ্ডারসেনকে সুযোগ পেলেই খেপায়; রাস্তায় ছেলেরা তার পিছনে লাগে: ঐ যে আমাদের নাট্যকার যাচ্ছে! কখনো কখনো তাকে লক্ষ্য করে ঢিল ছোঁড়ে। অ্যাণ্ডারসেনের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ভবিষ্যতের ভয়ে রাত্রিতে তার ঘুম হয় না। তার বৃদ্ধ ঠাকুর্দা এখনো বেঁচে আছেন; তিনি পাগল। পাড়ার ছেলেদের হাতে এই অহিংস বৃদ্ধ পাগলকে কিল-চড়-ঘুষি এবং আরো কত লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয় প্রতিদিন। নিরুপায় বালককে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হয় এসব দৃশ্য। ছেলেরা পিছনে লাগায় ভয় হয় সে যদি ঠাকুর্দার মতো পাগল হয়ে যায়? এ ভয় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাড়া করেছে অ্যাণ্ডারসেনকে।

অ্যাণ্ডারসেনের স্বভাব ছিল বড় সরল। এই সারল্যের সুযোগ নিয়ে সহপাঠীরা তার উপর অত্যাচার করত। অ্যাণ্ডারসেন একটুতেই খুশিতে উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠত, আবার একটুতেই চোখে অশ্রুধারা নেমে আসত। একদিন অ্যাণ্ডারসেন মাঠে গেছে পরিত্যক্ত শস্য কুড়াতে। এমন সময় জমির মালিক এসে উপস্থিত হলো উদ্যত চাবুক হাতে করে। অ্যাণ্ডারসেন সরল, নির্ভীক,

দুই চোখ তুলে প্রশ্ন করল : তুমি আমাকে মারবে? জানো না, ভগবান সব কাজের সাক্ষী। তাঁর সামনেই আমাকে মারবার সাহস হবে তোমার?

অ্যাণ্ডারসেনের মা মেরি আবার বিয়ে করেছেন। নতুন স্বামী কাজের লোক নয়, সুতরাং মেরিকে কাপড় কাচবার কাজ আরম্ভ করতে হলো। সারাদিন অ্যাণ্ডারসেন একা একা থাকে। মা-কে আশ্বাস দেয় : আমি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হবো একদিন; আমার জন্য তুমি ভেবো না।

মা বিশ্বাস করেন।

চৌদ্দ বছর বয়সে অ্যাণ্ডারসেন শ' দেড়েক টাকা সম্বল করে কোপেনহেগেন যাত্রা করল। সেই বিরাট শহরে পরিচিত কেউ নেই। তবু যেতে হবে। এখানে পড়ে থাকলে বড় হবে কি করে? মফঃস্বলের অনভিজ্ঞ বালক রাজধানীতে এসে প্রথম বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেও শিগ্‌গীরই নিজের উদ্দেশ্য খুঁজে পেল। সে অভিনেতা হবে। রয়েল থিয়েটারে ঢুকতে পারলে খ্যাতি ও অর্থ দুই-ই সহজে এক সঙ্গে পাওয়া যাবে। থিয়েটারের প্রধানা অভিনেত্রীর সন্ধান করে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করল। অভিনয় করে দেখাল। অভিনেত্রী হাসলেন। এ পথে তার কোনো আশা নেই। হতাশ হয়ে কেঁদে ফেলল অ্যাণ্ডারসেন। একে একে থিয়েটারের সব ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করল সে। সবাই হতাশ করল; কিন্তু সকলের মনেই তার জন্য মমতা জাগে। এই বিচিত্র কুৎসিতদর্শন কিশোরের মধ্যে কি একটা অদৃশ্য আকর্ষণী শক্তি আছে যার ফলে সকলের মনেই তার জন্য সহানুভূতি জাগে। অ্যাণ্ডারসেন সরল বিশ্বাসে যে-কোনো লোকের সামনে গিয়ে দ্বিধাহীন চিত্তে দাঁড়াতে পারে। সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট নিজের অদ্ভুত আবেদন পেশ করতে সঙ্কোচ হয় না। মূল প্রার্থনা মঞ্জুর না হলেও আর্থিক সাহায্য ও খাবার নিমন্ত্রণ পায় সম্ভ্রান্ত পরিবারে। এঁদের দয়ার উপর নির্ভর করে অ্যাণ্ডারসেনের দিন কাটে। রোজ দু'বেলা খেতে পায় না, তবু বেঁচে থাকাটা সম্ভব হয়েছে।

অভিজাত পরিবারে অ্যাণ্ডারসেন গান ও অভিনয় করে শোনায়। ছেলে মেয়েরা আনন্দ পায়; বড়রাও যোগ দেয়। ক্রমে তার নাম গিয়ে পৌঁছল রাজপ্রাসাদে। একদিন নিমন্ত্রণ এলো রাজপ্রাসাদ থেকে। রাজকুমারী ডেকে পাঠিয়েছেন। তাঁকে গান ও আবৃত্তি শুনিয়ে পুরস্কার পেল। মুচির ছেলের রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ। রূপকথা নয়তো কী!

নাট্যকার অথবা অভিনেতা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করবে, এটাই ছিল

অ্যাণ্ডারসেনের আকাঙ্ক্ষা। সে ডেনমার্কের সেক্সপীয়র হবে। একটা নাটক লিখে পাঠাল রয়েল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের কাছে। কয়েকদিন পরেই ফেরত এলো। অভিনয় করা তো দূরের কথা, পড়বারও অযোগ্য। ডিরেক্টরদের দয়া হলো অ্যাণ্ডারসেনের উপর। রাজার কাছে সুপারিশ করে তাঁরা ওর পড়বার জন্য একটা সরকারী বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিলেন। ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে প্রথম থেকে পড়া আরম্ভ করতে সঙ্কোচ বোধ হলেও বড় হবার অদম্য আকাঙ্ক্ষায় সে সবকিছু স্বীকার করে নিল। এতদিন আধপেটা খেয়ে শরীর শীর্ণ হয়েছে। কয়েক দিন পূর্বে একটা নাটকে তপঃক্লিষ্ট, শীর্ণদেহ ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয়েছিল। অ্যাণ্ডারসেন এই চরিত্রে অভিনয় করেছিল; তার অনাহারক্লিষ্ট দেহ ছিল যোগ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। সরকারী বৃত্তি পেয়ে অনাহারের ভয় থেকে মুক্তি পেল। কিন্তু স্কুলের হেডমাস্টারের ব্যবহারে তার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ছেলেরা তাকে ভালোবাসত। হেডমাস্টার ও তাঁর স্ত্রীর সকল অত্যাচার সহ্য করে অ্যাণ্ডারসেন পরীক্ষায় পাশ করল। দুটো পরীক্ষায় পাশ করবার পর সে আরম্ভ করল কবিতা লিখতে। তারপর নাটক। তার দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন সফল করে রয়েল থিয়েটারে নাটকের অভিনয় হলো। তার প্রথম কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে, কাগজে সমালোচনাও বেরিয়েছে। ভালো সমালোচনায় আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়, বিরূপ সমালোচনা বেরুলে কাগজের উপর মুখ রেখে ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে থাকে। অ্যাণ্ডারসেনের এখন নানা সভাসমিতি থেকে আমন্ত্রণ আসে। একটু প্রশংসায় সে ফুলে ওঠে। লোকে তার এই আত্মশ্লাঘার ছেলেমানুষী উপভোগ করে; অনেকের কাছ থেকে বিদ্রূপও শুনতে হয়। সাহিত্যাগ্রজ ও শুভানুধ্যায়ী ইনজ্‌ম্যান উপদেশ দিয়ে লিখলেন, সাহিত্যিক ও শিল্পীর পক্ষে এরূপ সামাজিক জীবন সবচেয়ে বড় শত্রু। কিন্তু অ্যাণ্ডারসেন সহজে জনপ্রিয়তার মাদকতা ত্যাগ করতে পারে না। মুচির ছেলের স্বপ্ন সফল হয়েছে, সে খ্যাতিলাভ করেছে।

রাজানুগ্রহ সে লাভ করেছে। প্রথম তাকে বিদেশ ভ্রমণের জন্য বৃত্তি দেওয়া হলো। ইতালীর পটভূমিকায় আত্মচরিতমূলক উপন্যাস The Improvisatore লিখে অ্যাণ্ডারসেন অবিসংবাদীরূপে ড্যানিশ সাহিত্যে আপনার স্থান করে নিল। এতদিন অন্যের পুরানো জামা-জুতা ব্যবহার করেছে; এবার বইয়ের লভ্যাংশ পেয়ে নতুন জামা কিনতে পারল, দু'বেলা পেট ভরে খাবার ব্যবস্থাও হবে এখন থেকে। দ্বিতীয় উপন্যাস ছেপে বেরুতে কিছু দেরী হবে, অথচ টাকা প্রয়োজন।

এই প্রয়োজনের তাগিদে ছেলেদের জন্য কয়েকটি রূপকথা তাড়াতাড়ি লিখে ফেলল। অ্যাণ্ডারসেন এদের মনে করেছে তার সাহিত্য সাধনার 'বাই-প্রডাক্ট'। কিন্তু ক্রমশঃ এই রূপকথাগুলিই হয়ে উঠল সবচেয়ে জনপ্রিয়। আজ লোকে তার কবিতা, নাটক ও উপন্যাসের কথা ভুলে গেছে; বেঁচে আছে অপূর্ব রূপকথাগুলি।

একই জীবনে এত দুঃখ, সংগ্রাম ও যশের সমাবেশ কদাচিৎ দেখা যায়—রাজকীয় বিবিধ সম্মান, সাহিত্য সাধনার জন্য সরকারী বৃত্তি এবং জনসাধারণের নিকট হতে প্রভূত সম্মান ও প্রীতিলাভ করেছে অ্যাণ্ডারসেন। য়ুরোপের সবত্র জীবিতকালে অ্যাণ্ডারসেন যে সম্মান পেয়ে গেছে এরূপ আর কোনো সাহিত্যিকের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিশোরমহল তাদের গল্পদাদুকে রাজার সম্মান দিয়েছে। শেষ বয়সে অ্যাণ্ডারসেন বলত, মৃত্যুর পরে দেশের সকল শিশু ও কিশোরের দল তার শবানুগমন করবে।

অর্থ, প্রতিপত্তি ও যশ পেয়েও অ্যাণ্ডারসেনের জীবনে সুখ ছিল না। তার জীবনে বহু লোকের কোলাহল ছিল, কিন্তু ছিল না কোনো একটি অন্তরঙ্গ হৃদয়ের স্নিগ্ধ স্পর্শ। মা মারা গেছেন অনেক দুঃখ পেয়ে পাগলা গারদের অন্তরালে। আপন বলবার মতো পৃথিবীতে আর কেউ ছিল না। অ্যাণ্ডারসেনের দিনলিপি থেকে দেখা যাবে বিয়ে করবার কত সাধ ছিল। পৃথিবীর শিশুদের জন্য এত গল্প লিখল: কোলের উপর বসিয়ে নিজের ছেলেকে গল্প শোনাবার সুযোগ দিলেন না ভগবান। মেয়েরা তাকে কৃপা করত, তার গল্প পছন্দ করত, কিন্তু কেউ ভালোবাসত না। দুষ্টু ছেলেরা রাস্তায় তাকে ওরাং-ওটাং বলে পিছু নিত; এমন বিকৃত যার চেহারা, তাকে কে ভালোবাসবে?

কিন্তু অ্যাণ্ডারসেন ভালোবেসেছিল। তার হৃদয় বিকৃত নয়। সহপাঠীর বোন রিবর্গকে একবার দেখেই ভালোবেসেছিল। তার প্রথম প্রেম। কিন্তু শিগগীরই জানতে পারল রিবর্গের বিয়ে আগে থাকতেই ঠিক হয়ে আছে। তবু অ্যাণ্ডারসেনের মনে হলো রিবর্গ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। সাহসে ভর করে চিঠি লিখল। যদি তাকে ভালোবাসে তা হ'লে পূর্বের সম্বন্ধ ভেঙ্গে দেবার সময় আছে। রিবর্গ তৎপরতার সঙ্গে জবাব দিল, তা সম্ভব নয়। রিবর্গের এই একটিমাত্র চিঠি অ্যাণ্ডারসেন ছোট্ট একটি চামড়ার ব্যাগে করে বুকের কাছে ঝুলিয়ে রেখেছে চব্বিশ ঘণ্টা দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে। মৃত্যুর পরে এই চিঠি তার বুকের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল। প্রেমপত্র নয়, প্রেমের প্রত্যাখ্যান পত্র।

হৃদয় কত শূন্য হলে প্রত্যাখ্যান পত্রকেও আঁকড়ে ধরতে চায় তা সহজেই অনুমেয়।

১৮৭৫ সালের ৪ঠা অগাস্ট অ্যাণ্ডারসেনের জীবনের রূপকথা সমাপ্ত হয়ে গেল।

Publishers : Hutchinson ; London. 8/6.

বিখ্যাত উপন্যাসে আমরা যে-সব অবিস্মরণীয় চরিত্র দেখতে পাই তারা কি লেখকদের কল্পনাপ্রসূত ? বাস্তব জীবনের সহিত কি তাদের কোনো সম্পর্ক নেই ? অনেক লেখক পাঠকদের প্রথমেই বলে দেন যে, তাঁর চরিত্রগুলি নিছক কাল্পনিক। কিন্তু যে চরিত্র শুধুই কল্পনা দিয়ে গঠিত তা কখনো জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে না। বিশ্ব-সাহিত্যের ভাণ্ডারে উপন্যাসের যে চরিত্রগুলি স্থায়ী আসন লাভ করেছে তাদের আমরা জীবন্ত নর-নারী বলে গ্রহণ করি। তাদের বেদনায় দুঃখিত হই, তাদের আনন্দে খুশি হই। বাস্তব জীবনের সহিত যোগাযোগ না থাকলে চরিত্রগুলি জীবন্ত হতে পারে না। একটি সার্থক চরিত্র সৃষ্টির জন্য দৈবানুগ্রহের উপর নির্ভর করতে হয়,—গেটের নিম্নোক্ত মন্তব্য থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে:

"No productiveness of the highest kind, no remarkable discovery, no great thought that bears fruit and has results, is in the power of anyone ; such things are above earthly control. Man must consider them as an unexpected gift from above." প্রতিভার স্ফুরণে দৈবের সহায়তা কতখানি, সে আলোচনা এখানে করবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু লেখকের নিজস্ব প্রস্তুতি ছাড়া দৈবানুগ্রহ লাভ যে সম্ভব নয় একথা নিশ্চিত।

লেখক বাস্তব জীবনে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন উপন্যাসে চরিত্র সৃষ্টি করতে গিয়ে সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগান। কিন্তু তাই বলে তাঁর চরিত্রের বাস্তব প্রতিরূপ কোথাও দেখা যাবে না। উপন্যাসের একটি চরিত্র হয়ত তিনি গড়েছেন বাস্তব জীবনে দেখা পাঁচটি মানুষের ছায়া থেকে। পুরনো অভিজ্ঞতাকে উপযুক্তভাবে সাজিয়ে কাজে লাগানোটাই লেখকের কৃতিত্ব। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাগুলি লেখকের কাঁচা মাল ; তাদের যথার্থ প্রয়োগের উপরে নির্ভর করে তাঁর চরিত্র সৃষ্টির সার্থকতা। বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপরে চরিত্রগুলি দাঁড়িয়ে আছে বলেই তাদের জীবন্ত মনে হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে লেখক কখনো আবদ্ধ থাকে না। চরিত্রকে সম্পূর্ণতা দান

করবার জন্য কল্পনার সাহায্যও গ্রহণ করতে হয়। সুতরাং উপন্যাসের চরিত্র বাস্তব জীবনের সহিত কতটা যুক্ত এবং লেখকের কল্পনাই বা কতটা সাহায্য করেছে তা বিশ্লেষণ করা কঠিন। সমারসেট মম এ সম্বন্ধে বলেছেন :

"More often I have taken persons I know, either slightly or intimately, and used them as the foundation of characters of my own invention. To tell you the truth, fact and fiction are so intermingled in my work that now, looking back, I can hardly distinguish one from the other."

বাস্তব জীবনের একটি ঘটনা কিংবা চরিত্রের উপর ভিত্তি করে অনেক প্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন চরিত্রে বা ঘটনার মিশ্রণের দ্বারা একটি কাহিনী গড়ে তোলবার চেষ্টা লেখক করেন না। অনেক অনুসন্ধানের ফলে উপন্যাসের পশ্চাদ্বর্তী ঘটনা বা চরিত্রের বাস্তবরূপ আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। থিওডোর ড্রেজারের "অ্যান অ্যামেরিকান ট্র্যাজেডি" এমনি একটি বাস্তব কাহিনী নিয়ে রচিত। ১৯০৬ সালের জুলাই মাসে নিউইয়র্ক রাজ্যের অন্তর্গত একটি হ্রদে একদিন দেখা গেল যে, একটি নৌকা উল্টে আছে, আর নৌকার পাশে ভাসছে দুটি টুপি, একটি মেয়েদের, অন্যটি ছেলেদের। প্রমোদ ভ্রমণে বেরিয়ে দু'টি তরুণ তরুণী হ্রদের জলে ডুবে মরেছে, এই হল সকলের সিদ্ধান্ত। জাল ফেলে যে তরুণীটির মৃতদেহ উদ্ধার করা হল তার নাম গ্রেস ব্রাউন। ডাক্তারী পরীক্ষায় জানা গেল মিস ব্রাউনের জলে ডুবে মৃত্যু হয়নি, মাথায় আঘাত দিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে। মিস ব্রাউন ছিল গর্ভবতী,—হত্যার উদ্দেশ্য এ থেকেই অনুমান করা যায়। বলা বাহুল্য যে, পুরুষ সঙ্গীর মৃতদেহ পাওয়া যায়নি।

পুলিশের অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল মিস ব্রাউন যে ফ্যাক্টরীতে কাজ করত সেই ফ্যাক্টরীর মালিকের ভাইপো চেস্টার গিলেটের সঙ্গে ছিল তার প্রণয়। গিলেট তাকে নিয়ে কয়েক দিন খেলা করবার উদ্দেশ্যে মেলামেশা করত। বিয়ে করবার কথা তার মনেও হয়নি। সেজন্য আছে অভিজাত ঘরের মেয়েরা। মিস ব্রাউনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবার প্রয়োজন যখন দেখা দিল তখন গিলেট আবিষ্কার করল তা আর সম্ভব নয়; কারণ, মিস ব্রাউন গর্ভবতী। দায়িত্ব এড়াবার জন্য গিলেট তাকে হত্যা করেছে। বিচারে গিলেটের প্রাণদণ্ড হল। কিন্তু সে অমর হয়ে আছে ড্রেজারের 'অ্যামেরিকান ট্র্যাজেডি'র নায়ক

ক্লাইড গ্রিফিথস্-এর মধ্যে। গিলেট তথা ক্লাইড গ্রিফিথস্-এর মতো অনেক ভদ্রবেশী শয়তান আমেরিকান তরুণীদের যে সর্বনাশ করছে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই ছিল ড্রেজারের উদ্দেশ্য।

আনাতোল ফ্রান্সের 'দি রেড লিলি' পল ভার্লেনের জীবনীর উপন্যাসরূপ। আলডুস হাক্সলি তাঁর 'পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট' উপন্যাসের মার্ক র্যামপিয়ন ও বিয়াট্রিস যথাক্রমে ডি, এচ্, লরেন্স ও ক্যাথারিন ম্যানসফিল্ড এর আদর্শে সৃষ্টি করেছেন। সমারসেট মম-এর 'দি মুন অ্যাণ্ড সিক্সপেন্স-এর নায়ক চার্লস স্ট্রীকল্যাণ্ড যে শিল্পী গগ্যাঁ, সে কথা আজ কারো অবিদিত নেই। তাঁর 'কেক্স অ্যাণ্ড এইল'-এ এডোয়ার্ড ড্রিফিল্ডের মধ্যে আমরা পাই টমাস হার্ডিকে। সমারসেট মম বলেছেন যে, বিশ্ব সাহিত্যের দশটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের মধ্যে স্তাঁদলের 'দি রেড অ্যাণ্ড দি ব্ল্যাক' একটি। পুরনো সংবাদপত্র দেখতে দেখতে একটি হত্যার কাহিনী স্তাঁদলকে আকৃষ্ট করে। এই ঘটনাটিকেই স্তাঁদল তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসে রূপান্তরিত করেছেন।

স্কটের 'আইভানহো' আমাদের দেশে অনেকেই পড়েছেন। কয়েক বছর পূর্বেও ছাত্রদের এ বই পড়তে হতো। এই উপন্যাসের অবিস্মরণীয় চরিত্র সুন্দরী ইহুদি তরুণী রেবেকা। স্কট লেখা শুরু করবার পূর্বে যখন কাহিনীর পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তখন তিনি সবচেয়ে সমস্যায় পড়েছিলেন এই ইহুদি তরুণীর চরিত্র নিয়ে। কারণ স্কটের সঙ্গে কোনো ইহুদি মেয়ের পরিচয় ছিল না। সুতরাং একটি জীবন্ত চরিত্র আঁকা কঠিন মনে হয়েছিল। ঐ সময় আমেরিকার সুবিখ্যাত লেখক ওয়াশিংটন আরভিং কয়েক দিনের জন্য স্কটের অতিথি হয়েছিলেন। তিনি আমেরিকার এক ইহুদি তরুণীর কাহিনী বলে স্কটকে সাহায্য করলেন। সেই ইহুদি তরুণীর নামও রেবেকা ; সে পরমা সুন্দরী, ধর্মপরায়ণা এবং ধনী পিতার কন্যা। সে এক যুবককে গভীরভাবে ভালোবাসল ; ভালোবাসবার পরে জানতে পারল তার ধর্ম আলাদা। ধর্ম ও প্রেমের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলল কয়েক বছর ধরে। তারপর শেষ পর্যন্ত ধর্মের জন্য সেই যুবককে ত্যাগ করল। কিন্তু রেবেকা জানত সে জীবনে আর কাউকে ভালোবাসতে পারবে না। তাই বিয়ে করবার কথা ভুলে সে সেবাব্রত গ্রহণ করল। এই রেবেকা ১৮৬৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। আইভানহোর রেবেকা যে তিনিই, একথা তাঁর অজানা ছিল না।

জর্জ মেরিডিথ তাঁর উপন্যাস 'ডায়না অব দি ক্রসওয়েস'-এর নায়িকা ডায়না

ওয়ার-উইককে এঁকেছেন অভিজাত বংশের সুন্দরী ক্যারোলাইন নর্টনের কাহিনী অবলম্বনে। ১৮৩৬ খৃস্টাব্দে মিঃ নর্টন আদালতে অভিযোগ করেন যে, ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী লর্ড মেলবর্ণের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর অবৈধ প্রণয় আছে। ক্যারোলাইন মন্ত্রিসভার গোপন কথা 'টাইমস' পত্রিকার নিকট বিক্রি করেছেন বলেও অভিযোগ উঠেছিল। মেরিডিথের কাহিনীর সঙ্গে ক্যারোলাইনের জীবনের ঘটনাগুলির সামঞ্জস্য এত সুস্পষ্ট যে বই ছাপা হবার পর মানহানির মামলার ভয়ে মেরিডিথ একটু কৈফিয়ৎ জুড়ে দিয়েছিলেন।

একজন সমালোচক বলেছেন যে, বিশ্ব-সাহিত্যে মাদাম বোভারির মতো পূর্ণাঙ্গ নারী চরিত্র আর একটিও নেই। এই চরিত্র বাস্তব জীবনের কোন্ নারীর আদর্শে রচিত একথা ফ্লবেয়ারকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বলতেন, আমিই মাদাম বোভারি। একথা খানিকটা সত্য। ফ্লবেয়ারের নিজের অনেক কথা তাঁর নায়িকার মারফৎ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আসলে মাদাম বোভারির পশ্চাতে আছে এক গ্রাম্য ডাক্তারের অসতী তরুণী স্ত্রী মাদাম ডি লা মেয়ার।

জোলা বলতেন, তাঁর উপন্যাসের প্লট আবিষ্কারের প্রতিভা নেই, সব সত্য কাহিনীর উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস 'নানা'। 'নানা' লেখকের নিছক কল্পনা নয়; সে সত্যি একদা ফ্রান্সের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী বারবনিতা ছিল। অবশ্য তার আসল নাম ছিল লা পেভা। পেভা প্রৌঢ় বয়সে প্যারিসের শহরতলীতে যখন বাস করত তখন জোলা তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে জীবনের সকল ঘটনা একটু একটু করে জেনে নিয়ে 'নানা' লিখেছেন।

ভিক্টর হুগোর 'লে মিজারেবল'-এর নায়ক জাঁ ভালজিন ফ্রান্সের একজন অতি সাধারণ কবি ও দার্শনিক ফ্রাঁসোয়া গেলার্ড-এর অনুসরণে অঙ্কিত। ১৮২৯ খৃস্টাব্দে চুরির অপরাধে গেলার্ডের যখন জেল হয় তখন জনসাধারণের সহানুভূতি ছিল তার উপর। কিন্তু কয়েক বছর পরে মাত্র পাঁচ শ' ফ্রাঁর জন্য বৃদ্ধা মাকে হত্যা করবার পর তার উপর সবাই বিরূপ হয়ে উঠেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নবীন ইংরেজ লেখকদের উপর লী হান্টের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তিনিই শেলি ও কীটসের প্রতিভাকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তাঁর উদারমতাবলম্বী কাগজ 'এগ্জামিনার' সর্বদাই নতুন লেখকদের উৎসাহ দিত। হান্টের চরিত্রে অনেক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এমন একটা মাধুর্য ছিল যার জন্য বহু লেখক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। ডিকেন্স

হাণ্টের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন ১৮৩৯ খৃস্টাব্দে; ১৮৫২ খৃস্টাব্দে ডিকেন্স হাণ্টের বিদ্রূপাত্মক প্রতিরূপ রচনা করে এক যুগের ঘনিষ্ঠ পরিচয় সমাপ্ত করেন। এ কয় বছর ডিকেন্স হাণ্টকে যথাসম্ভব সাহায্য করেছেন। তাঁর নিজের কাগজে হাণ্টের লেখা ছাপিয়ে সর্বাপেক্ষা উচ্চহারে পারিশ্রমিক দিয়েছেন। হাণ্টকে আর্থিক সাহায্য দেবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি নাটক অভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। ডিকেন্স যে এর শুধু উদ্যোক্তা ছিলেন তাই নয়, তিনি অভিনয় করতেও নেমেছিলেন। কিন্তু যখন সুযোগ এল তখন শিল্পী ডিকেন্স হাণ্টের চারিত্রিক ত্রুটিগুলি অবলম্বন করে একটি বিদ্রূপাত্মক চরিত্র সৃষ্টির লোভ সংবরণ করতে পারলেন না। তাঁর 'ব্লীক হাউস' উপন্যাসের হ্যারল্ড স্কিমপোল চরিত্রটি হাণ্টের ব্যঙ্গচিত্র। স্কিমপোলকে যদিও পার্শ্বচরিত্র হিসাবে আনা হয়েছে, তবু শেষ পর্যন্ত নায়ক অপেক্ষাও সে প্রাধান্য লাভ করেছে। জেনিংস নামে এক ভদ্রলোক পনেরো লক্ষ পাউণ্ডের সম্পত্তি রেখে মারা যান। উইল করে না যাওয়ায় এই সম্পত্তি নিয়ে ১৭৯৮ খৃস্টাব্দে মামলা শুরু হয়। ১৯১৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এই মামলা চলেছে, কিন্তু কোনো মীমাংসা হয়নি। এই মামলার কাহিনী 'ব্লীক হাউসের' উপজীব্য। বিচারে যে দীর্ঘসূত্রতা চলে, এবং তার ফলে কত লোক যে কিরূপ দুঃখ ভোগ করে, তা দেখানোই ছিল ডিকেন্সের উদ্দেশ্য। বিচার বিভাগের দৃষ্টি এ বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। লী হাণ্ট অবশ্য গভীর আঘাত পেয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পরে ডিকেন্সও এ জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।

শার্লক হোম্‌স-এর কাহিনী সকল স্তরের পাঠকের নিকট সুপরিচিত। কনান ডয়েল এই অমর চরিত্রটি ডাঃ জোসেফ বেলকে দেখে সৃষ্টি করেছেন। কনান ডয়েল যখন চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্র ছিলেন তখন ডাঃ বেলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ডাঃ বেল ছিলেন তাঁর শিক্ষক। চিকিৎসক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল প্রচুর। তিনি রোগীর দিকে একবার তাকিয়েই বলে দিতে পারতেন কি অসুখ; পেশা কি, জাতি কি, ইত্যাদি। শার্লকস হোমসের বিভিন্ন গল্পে এরকম দৃষ্টান্ত অনেক আছে। সবই ডাঃ বেলের কথা। কনান ডয়েল ছাত্র জীবনে অনেকগুলি নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন, আবার কতকগুলির কথা অপরের নিকট শুনেছেন। ডাঃ বেল যে শুধু রোগ নির্ণয়ের জন্য তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি প্রয়োগ করতেন তা নয়, অপরাধের কিনারা করতেও ছিল তাঁর সমান আগ্রহ। পুলিশ কর্তৃপক্ষ অনেক সময় তাঁর সাহায্য প্রার্থনা

করতেন। বিচার বিভাগের নথিপত্র থেকে প্রমাণিত হবে যে, ডাঃ বেল কয়েকটি জটিল হত্যার রহস্য ভেদ করেছিলেন।

ডাঃ বেলের কার্যকলাপ দেখে ছাত্ররা তাঁকে যাদুকর বলে মনে করত। কনান ডয়েলও তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। ডাক্তারীতে যখন তাঁর পশার জমল না, তখন তিনি লেখা শুরু করলেন। গোড়া থেকেই ডাঃ বেলের অদ্ভুত কীর্তিকলাপ তিনি লেখার বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছেন। শার্লক হোমস বেঁচে রইল, কিন্তু ডাঃ বেলের খোঁজ আর কেউ রাখে না।

ডিফোর নাম 'রবিনসন ক্রুসো' লিখে চিরস্মরণীয় হয়েছে। অথচ 'রবিনসন ক্রুসো'র পূর্বে তিনি যে ২৯১ খানা বই লিখেছেন তার ক'খানার নামই বা আমরা জানি? 'রবিনসন ক্রুসো'র কাহিনী সাহিত্যে স্থান লাভের কারণ হয়তো এই যে, একটি প্রকৃত ঘটনার উপন্যাসরূপ দেবার ফলে ডিফোকে নতুন কিছু উদ্ভাবন করতে হয়নি। কল্পনার আশ্রয় নিয়ে তিনি যা রচনা করেছেন সেগুলি উতরায়নি। প্রকৃত রবিনসন ক্রুসোর নাম আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক। ১৭০৪ খৃস্টাব্দে সেলকার্ক প্রশান্ত মহাসাগরের চার মাইল চওড়া ও তের মাইল লম্বা এক দ্বীপে আশ্রয় লাভ করে। সভ্য জগতের সম্পর্কশূন্য সেই দ্বীপে চার বৎসর যাবৎ তার দিন কিভাবে কেটেছে সেই বিবরণ পাওয়া যাবে 'রবিনসন ক্রুসো'র কাহিনীতে। চার বৎসর পরে যে জাহাজ সেলকার্ককে উদ্ধার করে তার কাপ্তেন উড্‌স রোজার্স প্রথম এই অজানা দ্বীপে বসবাসের কাহিনা বইয়ের মারফৎ প্রচার করেন।

১৮৮৫ খৃস্টাব্দের এক শীতের রাত্রি। রবার্ট লুই স্টিভেন্সন হঠাৎ ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে উঠলেন। তাঁর স্ত্রী দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটাবার জন্য ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলেন। তাতে স্টিভেন্সন স্ত্রীর উপরে চটে উঠলেন। একটি আস্ত কাহিনী স্বপ্নে প্রায় পেয়ে যাচ্ছিলেন, ঘুম ভেঙে সব মাটি হয়ে গেল। প্রকাশক তাঁকে একটি জনপ্রিয় রোমাঞ্চকর কাহিনী লিখতে বলেছে। ছোট বই, দাম হবে এক শিলিং। স্টিভেন্সন কদিন থেকে বইয়ের প্লট কি হবে তাই নিয়ে ভাবছেন। তিনি প্রায় চিররুগ্ন। ক্ষয়রোগের প্রধান উপসর্গ জ্বরে তিনি সর্বদাই ভুগতেন। উত্তপ্ত মস্তিষ্কে প্লটের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমের মধ্যে জেগে উঠল পূর্ব পরিচিত এক কাহিনী। এই কাহিনী এডিনবার্গ শহরের ডীকন উইলিয়াম ব্রডির। ব্রডি দিনের বেলা ধর্মভীরু ব্যবসায়ী এবং নগর সমিতির সম্মানিত কর্মী। সকলের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র; সর্বত্র তাঁর অবাধ গতি।

দিনের বেলা লোকে টাকাকড়ি কোথায় কিভাবে রাখে তা লক্ষ্য করে ; রাত্রিতে ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে চুরি করতে বের হয়। ক্রমশঃ সাহস বেড়ে গেল, দল গড়ে তুললি ; চুরি থেকে ডাকাতি, লুঠ, ইত্যাদি আরম্ভ হল। এডিনবার্গের নাগরিকরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল ; গভর্ণমেণ্টের সকল অনুসন্ধান কিছুকাল ফলপ্রসূ হল না। ব্রডির উপরে লোকের এমন অগাধ বিশ্বাস যে তাকে দু'একজন স্বচক্ষে চুরি করতে দেখেও বিশ্বাস করতে পারেনি, ভেবেছে নিশ্চয় ভুল দেখেছে। তার চুপ করে রয়েছে। শেষ পর্যন্ত অতি বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে ব্রডি ধরা পড়েছিল।

স্টিভেন্সন ছেলেবেলায় ব্রডির গল্প শুনেছেন। তার পর থেকে তাকে ভুলতে পারেননি! মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে স্টিভেন্সন ব্রডির জীবনীর নাট্যরূপ রচনা করেছিলেন। প্রকাশকের তাগিদ পেয়ে ব্রডির কাহিনী আর এক বার তাঁর মাথায় এল। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল বটে, কিন্তু তক্ষুণি তিনি লিখতে বসলেন। কয়েক দিনের মধ্যে গল্পটি শেষ করে স্ত্রীকে পড়ে শোনালেন। স্ত্রী শুনে বললেন, গল্পটি এমনিতে ভালোই হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে কোনো বৃহত্তর ইঙ্গিত নেই। এই মন্তব্যে ক্রুদ্ধ হয়ে স্টিভেন্সন পাণ্ডুলিপি জ্বলন্ত উনানে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। ক্রোধ শান্ত হবার পর একেবারে নতুন করে লিখতে বসলেন ব্রডির কাহিনী। অসুস্থ শরীরে তিন দিন, তিন রাত্রি অশ্রান্তভাবে লিখে ত্রিশ হাজার শব্দের গল্পটি শেষ করলেন। এই বইটিই 'দি স্ট্রেঞ্জ কেস অব ডাঃ জেকিল অ্যাণ্ড মিঃ হাইড।' প্রথম ছ'মাস এ বইয়ের চল্লিশ হাজার কপি বিক্রি হয়েছিল। যে 'বৃহত্তর ইঙ্গিতের' অভাব সম্বন্ধে স্ত্রী অভিযোগ করেছিলেন দ্বিতীয়বারের রচনায় স্টিভেন্সন তা দূর করেছেন এবং এই জন্যই বইটি বিশ্ব-সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। 'বৃহত্তর ইঙ্গিতটি' হলো এই যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ভালো ও মন্দের মিশ্রণ আছে, এবং সে দ্বৈত-জীবন যাপন করে।

Irving Wallace বিশ্ব-সাহিত্যের কতকগুলি প্রসিদ্ধ উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের পশ্চাতে যে-সব ঐতিহাসিক নরনারী রয়েছে তাদের পরিচয় দিয়েছেন The Fabulous Originals of Extraordinary People who Inspired Memorable Characters in Fiction নামক গ্রন্থে। উপন্যাস লেখক এবং পাঠক উভয়ের নিকটই বইটি সমাদর লাভ করবে।

Publishers : A. Knopf, N.Y. ; 3.95.

নিষিদ্ধ বই

কিছুদিন পূর্বে হাউস অব কমন্সের এক প্রশ্নোত্তর থেকে জানা গেছে যে, গ্রেট বৃটেনের ইতিহাসে অশ্লীলতার অভিযোগে কর্তৃপক্ষ সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পুথিপত্র ধ্বংস করেছেন ১৯৫৪ সালে। ১৯৩৫ সালে ৯০০, ১৯৩৮ সালে ২৪,৭২৭, ১৯৩৯ সালে ৩,০০৬, ১৯৫১ সালে ৬৫,২৭৭ পুথিপত্র ধ্বংস করা হয়েছিল। গত বছর এই সংখ্যা পৌঁছেছে ১,৬৭,২৯৩-এ। ১৯৫৪ সালে অশ্লীল পুথিপত্রের জন্য প্রকাশকদের মোট জরিমানা দিতে হয়েছে ১,৬৮,৭৬০ টাকা। ১৯৩৫ সালে এই জরিমানার পরিমাণ ছিল ১৩,৬২৪ৎ টাকা। এরূপ হবার কারণ কি? মানুষের রুচি কি ক্রমশঃ বিকৃত হয়ে পড়ছে? ওদেশের ওয়াকিবহাল লোকদের মত কিন্তু তা নয়। ১৯৩৫ সালে যে ধরনের পুথিপত্র প্রকাশিত হতো এখনও তাই হচ্ছে; নৈতিক মান যে বিশেষ নেমে গেছে এমন কোন প্রমাণ নেই। শুধু পুলিশী তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। যুদ্ধের সময় এবং তার পরবর্তী কয়েক বছর সেন্সর অশ্লীল প্রকাশনের প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি দিতে পারেনি। রাজনৈতিক মতবাদের উপর লক্ষ্য রাখা ছিল সেন্সরের প্রধান কাজ। তাছাড়া, যুদ্ধের সময় গভর্ণমেণ্ট সাহিত্যের অশ্লীলতা সম্বন্ধে ইচ্ছা করেই নীরব থাকে। এত দিনের নিষ্ক্রিয়তা ত্যাগ করে সেন্সর কর্তৃপক্ষ এখন বড় বেশি তৎপর হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়। এর পশ্চাতে আর একটা কারণ থাকাও সম্ভব। যুদ্ধ যে নবযুগ আনবে বলে আশা ছিল, সে আশা ব্যর্থ হয়েছে; বেড়েছে লোকের দুঃখ-দুর্দশা। সমাজের একাংশের মনে হয় যে নীতিভ্রষ্টতার জন্যই জীবনে দুঃখ এসেছে। পুথিপত্রের মধ্যে এই নৈতিক শুচিতার অভাবটা স্পষ্ট হয়ে স্থায়িত্ব লাভ করে; সুতরাং পুথিপত্রে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্য থেকে প্রবল প্রতিবাদ ওঠায় কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি অধিকতর সক্রিয় হয়ে উঠেছেন।

আমেরিকা (যুক্তরাষ্ট্র) ও গত বছর বহু পুঁথিপত্র লাঞ্ছিত করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তবে এদের অধিকাংশই লাঞ্ছিত হয়েছে রাজনৈতিক মতবাদের জন্য। বৃটেন ও আমেরিকার দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যাবে যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা থাকলেই মতবাদ প্রকাশের স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য মানুষ যুগে যুগে যে সংগ্রাম করে এসেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তা প্রাধান্য লাভ

করেছে। কিন্তু মতবাদ প্রকাশের স্বাধীনতার প্রসঙ্গ ইতিহাস কখনো বড় করে দেখেনি।

রাষ্ট্রবিরোধী মতামত নিয়ন্ত্রণ করবার উদ্দেশ্যেই সর্বপ্রথম সেন্সরের প্রবর্তন হয়েছিল। য়ুরোপের মধ্য যুগে ধর্ম জগতের নেতারা যখন রাষ্ট্রের নেতৃত্বও লাভ করলেন, তখন ধর্মমতকে নিয়ন্ত্রিত করবার সুযোগ তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। চমকপ্রদ নতুন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতবাদও মধ্যযুগের সঙ্কীর্ণচেতা কর্তৃপক্ষের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে। ভিক্টোরীয় যুগে সাহিত্যের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কঠোর ও ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। সাহিত্যে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান সেই প্রথম আরম্ভ হলো বলা যেতে পারে। সেন্সরের নিয়ন্ত্রণ কিছু পরিমাণে থাকা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষেও অত্যাবশ্যক। কিন্তু প্রায়ই নিয়ন্ত্রণটা অত্যাচার হয়ে ওঠে। সেন্সরের নির্বুদ্ধিতা যে বিশ্ব সাহিত্যের কত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ নিষিদ্ধ করেছে তার একটি সুন্দর তালিকা প্রণয়ন করেছেন শ্রীমতী A. L. Haight. বইটির নাম Banned Books তালিকাটি অবশ্য সম্পূর্ণ নয়। তথাপি এ থেকেই সেন্সরের কার্যকলাপের পরিচয় মিলবে। সৌভাগ্যের কথা এই যে, এক যুগে যা নিষিদ্ধ করা হয়, অন্য যুগের শুভ বুদ্ধি তাকেই সাদরে গ্রহণ করে; এক বিচারক যাকে আপত্তিকর মনে করেন, অন্য বিচারক তাকে মহৎ শিল্প সৃষ্টি বলে মনে করেন। এরই ফলে বিশ্বসাহিত্যের অনেক অমূল্য কীর্তি সেন্সরের রাহু থেকে মুক্তি লাভ করতে পেরেছে।

নিষিদ্ধ বইয়ের তালিকা থেকে দেখা যাবে যে বিশ্ব সাহিত্যের অনেক বিখ্যাত বই লাঞ্ছিত হয়েছিল। অ্যারিস্টোফেনিসের নাটক, ওভিদের রচনাবলী, বাইবেল, কোরান প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ একদা কর্তৃপক্ষের কোপদৃষ্টিতে পড়েছিল। দান্তের 'ডিভাইনা কমেডিয়া', বোকাশিওর 'ডিকামেরন', ভার্জিল, সার্ভেন্টিস-এর রচনাও লাঞ্ছনার হাত এড়াতে পারেনি। বেকনের 'অ্যাডভান্স-মেণ্ট অব লার্নিং' এবং গ্যালিলিওর 'ডায়ালগ' নতুন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা প্রকাশের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছিল। সেন্সর সেক্সপীয়রকেও রেহাই দেয়নি। 'দ্বিতীয় রিচার্ড' নাটকে রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করবার দৃশ্য থাকায় এলিজাবেথ ক্রুদ্ধ হয়ে নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ইহুদিদের আপত্তির ফলে আমেরিকার কোন কোন রাষ্ট্রে পাঠ্য তালিকা থেকে "মার্চেণ্ট অব ভেনিস" বাদ দেওয়া হয়েছিল। সম্রাট তৃতীয় জর্জের মস্তিষ্ক বিকৃতির কথা মনে করে ১৭৮৮ সাল থেকে ১৮২০ সাল পর্যন্ত "কিং লীয়রের" অভিনয় নিষিদ্ধ ছিল।

মিল্টন, মলিয়ের, রাসিন, ডিফো, সুইফট, ভলটেয়ার, রুশো, স্তাঁদল, শেলী, বালজাক, হুগো, ডারউইন, শিলার, কার্ল মার্কস, জর্জ ইলিয়ট, হুইটম্যান, বদলেয়ার, ফ্লবেয়ার, ইবসেন, টলস্টয়, রসেটি, মার্ক টোয়েইন, সুইনবার্ণ, হার্ডি, জোলা, আনাতোল ফ্রাঁস, মোপার্সাঁ, বার্ণার্ড শ', অস্কার ওয়াইল্ড, হ্যাভলক এলিস, মেটারলিঙ্ক, কিপলিং, আঁদ্রে জিদ, লরেন্স, ইউজিন ও'নীল, আলডুস হাক্সলি, ফকনার, হেমিংওয়ে, আপটন সিনক্লেয়ার প্রভৃতি বিখ্যাত লেখকদের বই য়ুরোপ আমেরিকায় সেন্সরের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে। গেটের 'ফাউস্ট'এর অভিনয় জার্মান কর্তৃপক্ষ ১৮০৮ সালে নিষিদ্ধ করেছিলেন; কারণ, স্বাধীনতা সম্বন্ধে 'ফাউস্টে' কতকগুলি 'বিপজ্জনক' উক্তি আছে। স্পেনের ফ্রাঙ্কো সরকারও ঐ কারণেই গেটের রচনাবলী নিষিদ্ধ করেছিলেন। নিষিদ্ধ পুস্তকের মধ্যে জেমস জয়েসের "ইউলিসিস" উল্লেখযোগ্য। এই পুস্তকের উপর নিষেধাজ্ঞা রহিত করে বিচারপতি উলসী যে রায় দিয়েছিলেন তা আধুনিক উপন্যাসকে বিধি-নিষেধের হাত থেকে মুক্তি দিতে অনেকটা সাহায্য করেছে।

বলা বাহুল্য, উপরোক্ত নিষিদ্ধ পুস্তকের তালিকায় ভারতীয় প্রকাশন স্থান পায়নি। যদিও ভারতে সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম (১৮৫৬) অশ্লীলতা বিরোধী আইন বিধিবদ্ধ হয়েছিল, তথাপি আমাদের দেশে সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন নিষিদ্ধ পুস্তকের সংখ্যা নগণ্য। তার কারণ এই যে, ভিক্টোরীয় যুগের নৈতিক পবিত্রতার আদর্শ সামনে রেখে আমাদের সাহিত্য রচনা আরম্ভ হয়েছে। বৃটিশ আমলে প্রায় সকল পুথিপত্রই নিষিদ্ধ হয়েছে রাজনৈতিক কারণে। ১৯২০ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে ভারতে মোট বাজেয়াপ্ত পুথিপত্রের সংখ্যা তিন হাজারের কিছু বেশি। বাঙলা বইপত্র ঐ সময়ের মধ্যে বাজেয়াপ্ত হয়েছে প্রায় সওয়া তিন শ'।

Publishers: R. R. Bowker; New York. 4.00.

সাকো ভ্যানজেত্তি

রোজেনবার্গ দম্পতির বিচার ও প্রাণদণ্ড ছাব্বিশ বছর পূর্বেকার আর একটি বিচার-কাহিনী স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। রোজেনবার্গ দম্পতির প্রাণদণ্ড যতটা চাঞ্চল্য এনেছে সাকো-ভ্যানজেত্তির প্রাণদণ্ড তার চেয়ে অনেক বেশি বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল এবং এ বিক্ষোভ শুধুই সংবাদপত্রের প্রবন্ধে এবং জনসভার বক্তৃতায় নিঃশেষ হয়ে যায় নি। আমেরিকান সাহিত্যে সাকো-ভ্যানজেত্তির কাহিনী একটি স্থান করে নিয়েছে। ম্যাক্সওয়েল অ্যাণ্ডার্সন, আপটন সিনক্লেয়ার এবং আরো অনেকে এ কাহিনী নিয়ে নাটক, উপন্যাস ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। সর্বশেষ উপন্যাস পাওয়া গেল হাওয়ার্ড ফাস্টের কাছ থেকে। মানুষ স্বাধীনতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য যে সংগ্রাম করেছে হাওয়ার্ড ফাস্ট তারই ইতিহাসকার। The Passion of Sacco and Vanzetti-তে ফাস্ট সেই কুখ্যাত বিচার কাহিনীকে উপন্যাসের রূপ দিয়েছেন। বিচারে যদিও সাকো ও ভ্যানজেত্তিকে হত্যাকারী বলে রায় দেওয়া হয়েছে, তবু অনেকের ধারণা তারা নিরপরাধ, তাদের প্রাণ দিতে হয়েছে একটি বিশেষ আদর্শের ভক্ত হবার অপরাধে। রোজেনবার্গ দম্পতির প্রাণদণ্ডের পটভূমিকায় সাকো ভ্যানজেত্তির বিচারের কথা আলোচনা করবার সুযোগ করে দিল ফাস্টের নতুন বই। আমেরিকা পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক দেশ বলে দাবি করে। অথচ ছাব্বিশ বছরের ব্যবধানে দু'টি রাজনৈতিক বিচার সেই গণতন্ত্রের রূপ সম্বন্ধে সকল দেশের স্বাধীনতাকামী লোকের মনে সন্দেহ দৃঢ় করেছে।

১৯২০ সালের ১৫ই এপ্রিল ম্যাসাচুসেটের অন্তর্গত একটি ছোট শহরে একটি জুতার কারখানার খাজাঞ্চি ও প্রহরীকে দু'জন আততায়ী পিস্তলের গুলি দ্বারা হত্যা করে পনেরো হাজার ডলারেরও অধিক অর্থ নিয়ে নিকটে অপেক্ষমান মোটরগাড়ীতে চড়ে পালিয়ে যায়। মোটরগাড়ীতে আরো তিনজন লোক বন্দুক হাতে করে অপেক্ষা করছিল। এই হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠনের সাক্ষীরা পুলিশকে জানাল যে, আততায়ীরা ছিল ইতালিয়ান। ঐ অঞ্চলে ইতালী থেকে এসে কিছুসংখ্যক লোক কল-কারখানায় কাজ করত। পুলিশ লাগল তাদের পেছনে। সাকো এবং ভ্যানজেত্তি দু'জনেই ইতালিয়ান। সাকো জুতা তৈরী

করত, ভ্যান্‌জেত্তি ঘুরত মাছ ফেরি করে। যে গাড়ীটা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে সন্দেহ করে পুলিশ দৃষ্টি রাখছিল, সেই গাড়ী নিতে এসে সাকো ও ভ্যান্‌জেত্তি একদিন পুলিশের হাতে ধরা পড়ল। তারপর অনুসন্ধানে জানা গেল যে, তারা দু'জনেই অ্যানার্কিস্ট এবং যে-কোনদিন আমেরিকা থেকে নির্বাসনের আদেশ পাবার আশঙ্কা করছিল। তাছাড়া তাদের কাছে পাওয়া গেল পিস্তল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তারা যুদ্ধে যোগ দেয়নি, বরং বিরোধিতা করেছে; এটাও একটা অপরাধ। কিন্তু থানায় অপরাধীদের তালিকার মধ্যে তাদের নাম নেই; আইন ভঙ্গ করে এ পর্যন্ত তারা কোনো অপরাধ করেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। লুণ্ঠিত অর্থ যে তারা গ্রহণ করেছে সে সম্বন্ধেও প্রমাণ নেই। বিচারের সময় সরকারপক্ষের সাক্ষীরা বলল, সাকো ও ভ্যান্‌জেত্তি আততায়ীদের সঙ্গে ছিল। আবার আসামীপক্ষের সাক্ষীরা প্রমাণ করল যে, ঘটনার সময় তারা ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে তাদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। সনাক্তকারী সাক্ষীদের বিবরণে সন্দেহের অবকাশ থাকা সত্ত্বেও বিচারে আসামীদের প্রাণদণ্ড হলো। জনসাধারণ এই দণ্ড সহজভাবে মেনে নিতে পারল না হত্যা ও লুণ্ঠনের সঙ্গে যোগাযোগের সুনির্দিস্ট প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও তাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হলো রাজনৈতিক মতবাদের জন্য! আসামীরা দু'জনেই র‍্যাডিকাল এবং অ্যানার্কিস্ট; আমেরিকার অভিজাত শ্রেণী এই মতবাদকে ঘৃণা করত। সুতরাং আসামীদের রাজনৈতিক মতবাদকেই বিচার করে দণ্ড দেওয়া হলো, অপরাধের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল কিনা সে প্রমাণের বিচার করা হলো না। পুনর্বিচারের দাবী ম্যাসাচুসেটের সুপ্রীম কোর্ট এবং ঐ রাজ্যের গভর্ণর অগ্রাহ্য করলেন। কারণ তাঁদের মতে নিম্ন আদালতে ঠিকভাবেই বিচার হয়েছে। দীর্ঘ সাত বছর পরে ১৯২৭ সালের ২২শে আগস্ট দুপুর রাত্রিতে ইলেক্‌ট্রিক চেয়ারে বসিয়ে সাকো ও ভ্যান্‌জেত্তির প্রাণদণ্ড কার্যকরী করা হয়। সাধারণ লোক সেদিন একে সুবিচার বলে গ্রহণ করতে পারেনি; যতই দিন যাচ্ছে, ততই বিচার পদ্ধতির ত্রুটি স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সেদিনও ছিল, এবং আজও অনেকের ধারণা আছে যে, সাকো ও ভ্যান্‌জেত্তি নিরপরাধ, তারা প্রাণ দিয়ে শহীদ হয়েছে।

২২শে আগস্ট, ১৯২৭ সাল। ফাস্টের গল্পের শুরু হলো ভোর ছ'টায়, জেলখানার মৃত্যু-ঘরে। আজই রাত্রি বারোটায় সাকো, ভ্যান্‌জেত্তি এবং ম্যাডেরসের প্রাণদণ্ড হবে। তাদের তিন জনকে পর পর তিনটি ছোট মৃত্যু-ঘরে

এনে রাখা হয়েছে। ম্যাডেরস ছিল সত্যকার অপরাধী, নিজের অপরাধ সে স্বীকার করেছে। সত্যিকারের অপরাধী বলেই মৃত্যুভয় তার বেশি। ঘুম ভাঙতেই সর্বপ্রথম মনে হলো আজ জীবনের শেষ দিন। এই ভাবনা তার সর্বদেহে কাঁপুনি ধরিয়ে দিল। মাত্র পঁচিশ বছরেই তার জীবন শেষ হয়ে যাবে। সে জীবনে অনেক অপরাধ করেছে ; জেলে এসে যখন জানতে পারল নিরপরাধ সাকো ও ভ্যান্‌জেত্তিরও প্রাণদণ্ড হচ্ছে, তখন তার মধ্যে একটা পরিবর্তন এলো। সে কর্তৃপক্ষের কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করে বলল, সাকো ও ভ্যান্‌জেত্তির কোনো অপরাধ নেই। কিন্তু কি কারণে সে জানে না, বিচারের পরিবর্তন হয়নি। জেলের ওয়ার্ডেনেরও ঘুম ভেঙেছে এই দুশ্চিন্তা নিয়ে যে, আজ তিনজন লোককে বিচারের নামে ইলেকৃট্রিক চেয়ারে বসাতে হবে। সাকো ও ভ্যান্‌জেত্তির জন্য সে আন্তরিক দুঃখিত। দীর্ঘ সাত বছর মৃত্যু শিয়রে নিয়ে তারা জেলে আছে। ওয়ার্ডেন কিছুতেই ভাবতে পারে না এদের মতো লোক কখনো খুনী হতে পারে। ওয়ার্ডেন মৃত্যু-ঘরে ভ্যান্‌জেত্তির সঙ্গে দেখা করল। আজ তারা যা খুশি খেতে চাইতে পারে, যখন খুশি পাদ্রিকে ডাকতে পারে এবং সম্ভাব্য অন্য প্রয়োজনও মেটানো যায়। ভ্যান্‌জেত্তি শুধু চাইল তার বন্ধু সাকোর সঙ্গে একবার দেখা করতে।

প্রথম দুটি পরিচ্ছেদই পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণের পক্ষে যথেষ্ট। মৃত্যু-ঘরে বন্দী সাকো ও ভ্যান্‌জেত্তিকে পাঠকের সম্মুখে রেখে দিন দ্রুত এগিয়ে চলেছে প্রাণদণ্ডের নির্দিষ্ট মুহূর্তটির দিকে। দৃশ্যপট কখনো উঠছে জেলের মধ্যে, কিন্তু বেশির ভাগই বাইরে। দীর্ঘ সাত বছর যারা উদাসীন ছিল, আজ তারাও সচেতন হয়ে উঠেছে এই শেষ দিনটিতে। দুটি নিরপরাধ লোককে রক্ষা করা যায় কিনা তারই শেষ চেষ্টা চলছে। সংবাদপত্রে সাত বৎসরে সাকো-ভ্যান্‌জেত্তিকে নিয়ে আজকের মতো এত আলোচনা হয়নি। জনসাধারণ, শ্রমিক সমিতি, মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি এদের প্রাণদণ্ড মকুবের জন্য আবেদন করেছে গভর্ণরের কাছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কাছে। অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য, চব্বিশ ঘণ্টার জন্য, প্রাণদণ্ড স্থগিত রাখা হোক। দেখা যাক্, কি করতে পারে তারা। ইতালীর ডিক্টেটারের নিকট সে দেশের কিষাণ-মজুররা আবেদন জানিয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমেরিকার (যুক্তরাষ্ট্র) দূতাবাস আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু আমেরিকার কর্তারা অটল। তবু সাধারণ লোক বিশ্বাস হারায় না ; হয়তো শেষ পর্যন্ত প্রাণদণ্ড কার্যকরী করা হবে না। তাদের সঙ্গে পাঠকও

রুদ্ধনিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে থাকে ; সেই অপেক্ষা গোয়েন্দা কাহিনীর চেয়েও রোমাঞ্চকর। যত সময় ঘনিয়ে আসে ততই লোকের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে শুধু যুক্তরাষ্ট্রের সেই ছোট শহরটির নাগরিকরা নয়, পৃথিবীর সকল দেশের শ্রমিকদের মধ্যেই প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। লণ্ডন, প্যারিস, রোম, বার্লিন, মস্কো, টোকিও, বোম্বাই সর্বত্র শ্রমিকরা সেই চরম মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করে আছে। কাহিনীটি বলবার কৌশলও চমৎকার। পশ্চাতের ঘটনাগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফৌজদারী আইনের ইহুদি অধ্যাপকের বক্তৃতা থেকে, সাকো তার ছেলেমেয়েদের কাছে যে চিঠি লিখেছে তা থেকে, বিচারকের দিবাস্বপ্ন ইত্যাদি থেকে, সমগ্র কাহিনীটি জানা যায়। কিন্তু অতীত জানবার জন্য কোথাও থামবার প্রয়োজন হয় না। সাকো ও ভ্যান্‌জেত্তি কম্যুনিজমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ; তাই বলে মৃত্যুকে উপেক্ষা করবার মতো মহাপুরুষ নয়। তারা বাঁচতে চায় ; কিন্তু বাঁচা সম্ভব না হলে মৃত্যু দেখে ভয়ও করবে না। এদের দৃঢ়তা ও সাহস ম্যাডেরসের মনেও সংক্রামিত হয়ে তাকে দৃঢ়চেতা করবে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রাণদণ্ড স্থগিত হবার আশা করে ওয়ার্ডেন ব্যর্থ হলো। সর্বপ্রথম ম্যাডেরস, তারপর সাকো এবং সবশেষে ভ্যানজেত্তি গিয়ে ইলেকৃট্রিক চেয়ারে বসল।

আমাদের দেশের অনেক স্বদেশী মামলাকেই বোধ হয় এমনি ভাবে উপন্যাসের রূপ দেওয়া যায়।

Publishers : Blue Heron Press, N. Y. ; [illegible]

শেষ কথা

মানুষ সারাজীবন ধরে' কত কথা বলে, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সে সব কথা হয়তো ভুলে যায়, কিন্তু মনে রাখে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেকার শেষ দু'একটি কথা। মৃত্যুর করুণ দৃশ্যের সঙ্গে শেষ কথাগুলি গাঁথা থাকে বলে প্রিয়জনরা তাদের মনে করে রাখে। কথাগুলির নিজস্ব মূল্য যাই হোক না কেন, মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত থাকায় তারা স্মরণীয় হয়।

অনেক সময় সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথার মধ্যে গভীর জ্ঞানের পরিচয় থাকে। কখনো কখনো মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তের উক্তির মধ্যে মৃত ব্যক্তি তাঁর জীবনের চিন্তা-ভাবনা ও কর্মের মূলসূত্র কি ছিল তার ইঙ্গিত রেখে যান। বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবন ও কর্ম পর্যালোচনায় মৃত্যুকালীন উক্তির মূল্য কম নয়।

অবশ্য মৃত্যুকালীন উক্তির মূল্য সম্বন্ধে মতভেদ আছে। স্যার টমাস ব্রাউনি বলেছেন যে, মৃত্যুর কিছু আগে থেকেই মানুষ পরলোকের দিকে পা বাড়ায়, সুতরাং মুমূর্ষু ব্যক্তির মধ্যে এমন একটা ঐশ্বরিক শক্তি এসে যায় যার ফলে মূল্যবান কথা বলা সম্ভব হয়; সাধারণ অবস্থায় এমন উঁচু দরের কথা তাদের কাছে কেউ আশা করে না।

আবার কেউ কেউ এই মতের বিরোধী। তাঁরা বলেন, মৃত্যুর সময় মানুষের দেহ দুর্বল হয়ে পড়ে, অনুভূতির ক্ষমতা স্তিমিত হয়ে আসে; সুতরাং এই অবস্থায় মানুষের পক্ষে এমন কোনো উক্তি করা সম্ভব নয় যা প্রকৃতই মনে রাখবার মতো। দেহে যখন স্বাস্থ্য ও প্রাণের প্রাচুর্য থাকে তখনই মূল্যবান কথা বলা সম্ভব।

এই দুটি পরস্পর-বিরোধী মতের একটিও পুরোপুরি সত্য নয়। কারণ দেখা গেছে অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞ ব্যক্তিও মৃত্যুর সময় একান্ত সাধারণ মানুষের মতো দু'চারটা কথা বলেন। এসব কথার মধ্যে তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। আবার সাধারণ লোকের মুখে মনে করে রাখবার মতো কথা শোনা গেছে।

মৃত্যুকালীন উক্তি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে কেউ জীবন ও সংসার, কেউ ঈশ্বর ও ধর্ম সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন। কেউ কোনো বিষয় সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী

করে যান; কেউ বা নিজের রোগযন্ত্রণা নিয়ে হা-হুতাশ করেন। মৃত্যুর আকস্মিক আগমন কাউকে ভীত করে, অর্ধসমাপ্ত কাজ ও পরিজন ফেলে যেতে হচ্ছে বলে অনেকে আক্ষেপ করেন। দয়িতার নাম উচ্চারণ করতে করতে কারো মৃত্যু হয়; কেউ শেষ-কথা রেখে যান দু'এক লাইন কাব্যে। বায়রণ গ্রীক ভাষায় কবিতা রচনা করেছিলেন। এই প্রথা যে একেবারে পুরানো হয়ে গেছে তা-ও নয়। ১৯৪৮ সালে জাপানের যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী তোজো প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি দু'চরণ কবিতা রচনা করেন; এর ভাবার্থ এই: 'চেয়ে দেখ, চেরি পুষ্পস্তবক কেমন নিঃশব্দে ঝরে পড়ছে!' অর্থাৎ, আমার জীবনটাও চেরি ফুলের মতো ঝরে পড়ুক, তোমরা দুঃখ করো না। অবশ্য বহু প্রাচীনকাল থেকেই চীন ও জাপানের অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে মৃত্যুর পূর্বে কবিতা রচনার রীতি চলে এসেছে।

মৃত্যু আসছে, একথা বুঝতে পারলেই আমাদের দেশের বৃদ্ধরা তুলসীতলা কিংবা গঙ্গার ঘাটে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। আত্মীয়-পরিজনরা হরিনাম শুনিয়ে মুমূর্ষু ব্যক্তির পথটা স্বর্গাভিমুখী করতে চেষ্টা করত। যদি সম্পত্তিশালী হতেন তা'হলে কে তাঁর উত্তরাধিকারী হবে সে কথাটা শোনবার জন্য কখনো কখনো মৃত্যুপথযাত্রীকে উত্যক্ত করা হতো। কোনো মহাপুরুষের মৃত্যুর সময় তাঁর শিষ্যেরা এসে দাঁড়াত শয্যার চারপাশে। গুরুর মৃত্যুকালীন বাণী প্রচার করা হতো দেশে-বিদেশে। শিষ্যরা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করত সেই বাণী। কখনো কখনো নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে উপস্থিত শিষ্য গুরুর নামে মিথ্যা বাণীও প্রচার করত। য়ুরোপেও মৃত্যুর পূর্বে বিছানা, ঘর ইত্যাদি যথোচিতরূপে সাজাবার রীতি ছিল। গেটের মা মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে এক অনুষ্ঠানে যোগ দেবার আমন্ত্রণ পান। তিনি উত্তরে জানালেন, আমি মৃত্যুর আয়োজন করতে বড় ব্যস্ত আছি, তাই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারলাম না।

শেষ কথার বৈশিষ্ট্য নিম্নে প্রদত্ত কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাবে।

বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যদের শেষ উপদেশ দিয়েছিলেন এই: 'জন্ম ও মৃত্যুর কারণ এক ও অভিন্ন। যার জন্ম তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; একমাত্র সত্য চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। সুতরাং তোমরা সত্যের সাধনা করে সত্যের পথে এগিয়ে চলো।'

যীশু ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় মৃত্যুর মুহূর্তে প্রশ্ন করেছিলেন, 'ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, কেন আমাকে ত্যাগ করেছ?'

মহাত্মা গান্ধী শুধু বলতে পেরেছিলেন, 'হা রাম!' এই একটি কথার মধ্যে হয়তো কত ক্ষোভ ও বেদনা লুকিয়ে আছে।

সক্রেটিস মৃত্যুর পূর্বে পার্শ্ববর্তী শিষ্যকে বলেছিলেন, 'অমুকের কাছ থেকে একটা মোরগ ধার করেছিলাম, মনে করে সেই ঋণটা শোধ করে দিও।'

মৃত্যুর পূর্বে আলেকজাণ্ডারকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তাঁর পরে সিংহাসনে আরোহণ করবার অধিকারী কে? উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ব্যক্তিই সিংহাসন লাভের অধিকারী। ঔরঙ্গজেব পুত্রের নিকট অনুতপ্ত হৃদয়ে সর্বশেষ চিঠিতে লিখেছিলেন: আমি জীবনে অনেক পাপ করেছি, জানিনা তার জন্য কি শাস্তি আমার জন্য অপেক্ষা করছে। গ্যারিবলডির ঘরের জানালার উপর দু'টি ফিঙে পাখী কোথা থেকে এসে খেলা করত। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বলে গেলেন, আমার মৃত্যুর পর তোমরা এই পাখী দুটিকে খেতে দিও। এতবড় বিপ্লবী দুটি পাখীর মায়ায় পড়েছিলেন। চতুর্দশ লুই তাঁর ভৃত্যদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন: তোরা কাঁদিস কেন? তোরা কি ভেবেছিলি যে আমি অমর?

প্রিভি কাউন্সিলররা কাগজপত্র সই করাবার জন্য অপেক্ষা করছে দেখে পঞ্চম জর্জ বলেছিলেন, আপনাদের এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি বলে আমি লজ্জিত, কিন্তু কি করব, মন স্থির করতে পারছি না।

মেরি আঁতোয়ানেৎকে জল্লাদ বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ তাঁর পা জল্লাদের পায়ের উপরে পড়ল। অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী ভূতপূর্ব রাণী জল্লাদকে বল্লেন: মহাশয়, আপনার ক্ষমা ভিক্ষা করছি। এরূপ সংক্ষিপ্ত কিন্তু মর্মস্পর্শী উক্তি কমই আছে।

এবার সাহিত্যিকদের মৃত্যুকালীন উক্তির কথা দেখা যাক্। বালজাক আক্ষেপ করে বলেছিলেন, আমি আর লিখতে অথবা পড়তে পারি না। লেখকের পক্ষে এর চেয়ে বড় দুঃখ আর কি আছে? সারাজীবন ঘূর্ণাবাত্যার মতো কাটিয়ে মৃত্যুশয্যায় বায়রণ বললেন: এবার আমি ঘুমুব। ডুমার মৃত্যুর সময় নিজের রচনা সম্বন্ধে প্রশ্ন জেগেছিল। ছেলেকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি তো মরতে বসেছি, কিন্তু সত্যি করে বলো ত আমার রচনাগুলি কি বাঁচবে? গেটে চীৎকার করে উঠেছিলেন: আলো! আরো আলো! জেমস্ জয়েস্ ইউলিসিস-এর জন্য অনেক লাঞ্ছনা সয়েছেন, কেউ তাঁর রচনা বহুদিন পর্যন্ত যথার্থরূপে বুঝতে পারেনি। তাই মৃত্যুর সময় তিনি প্রশ্ন রেখে গেছেন: কেউ কি বুঝতে পারে না?

কীট্‌স তাঁর বন্ধুকে বললেন, 'সেভার্ণ, আমাকে তুলে ধরো, আমি মরব—আমি সহজভাবে মরব, ভয় পেয়ো না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, শেষ পর্যন্ত মৃত্যু এলো'। ডি, এচ্, লরেন্স যখন বুঝতে পারলেন মৃত্যু শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেনঃ এবার আমি একটু ভালো বোধ করছি। রসিক রাবেলের শেষ-কথা ছিল এইঃ জীবনের ফার্স শেষ হলো, এবার পর্দা ফেল।

মৃত্যুর সময়ও বার্ণার্ড শ' তাঁর স্বাভাবিক কৌতুকপ্রিয়তা ত্যাগ করতে পারেননি। নার্সকে বললেন, আমাকে তোমরা ওল্ড কিউরিয়সিটি হিসাবে বাঁচিয়ে রাখতে চাও, কিন্তু পারবে না।

মাইকেল এঞ্জেলো মৃত্যুর সময় তাঁর বন্ধুদের বলে গেছেন, 'জীবনের পথে চলতে গিয়ে দুঃখ পেলে যীশুর বেদনার কথা মনে ক'রো।'

ভ্যান গগ্ বলেছিলেন, এখন আমি বাড়ি যেতে চাই। শর্টহ্যাণ্ডের আবিষ্কর্তা সার আইজাক পিটম্যান পার্শ্ববর্তী আত্মীয়-পরিজনদের বললেন, 'কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে আমার মৃত্যু কিভাবে হয়েছে তাহলে বলো, আমি যেন নতুন কাজের সন্ধানে এক ঘর থেকে আর এক ঘরে গিয়েছি মাত্র।

এসব দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যাবে যে, অনেকের শেষ কথাই জ্ঞানগর্ভ ও স্মরণযোগ্য। তাই বহু বৎসর পরেও আমরা তাদের মনে করে রেখেছি।

Edward S. Le Comte সঙ্কলিত Dictionary of Last Words থেকে উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলি দেওয়া হলো। বলা বাহুল্য, এই সংকলনে ভারতের স্থান নগণ্য।

Publishers : Philosophical Library ; New York. 5.00

গ্রন্থবার্তা

গ্রন্থবার্তা বিদেশী সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে গত পাঁচ বছর ধরে। আজকাল কোন দেশ নিজের সংস্কৃতি নিয়ে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। গ্রন্থবার্তা বিশ্ব সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালী পাঠকের যোগসূত্র স্থাপনে সহায়তা করেছে। গত পাঁচ বছর ধরে যুগান্তর পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে বিপুল জনপ্রিয়তার প্রমাণ দিয়েছে। যুগান্তরে প্রকাশিত কয়েকটি নির্বাচিত রচনা এখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল। গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি রচনা অবশ্য অন্যত্র-ও প্রকাশিত হয়েছিল।

এই রচনাগুলিকে প্রচলিত পদ্ধতির পুস্তক সমালোচনা রূপে চিহ্নিত করা যায় না। লেখক পুস্তকের দোষগুণ আলোচনা করেই তাঁর কর্তব্য শেষ করেননি। তিনি পুস্তকের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় একটি সংক্ষিপ্তসার দিয়ে নিজের মন্তব্য যোগ করেছেন। এই আলোচনাকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবন্ধের রূপ দেবার জন্য লেখক পুস্তক বহির্ভূত অনেক তথ্যের সমাবেশ করেছেন। বিশেষ করে যেখানেই সম্ভব সেখানেই আমাদের দেশের কথাও যোগ করা হয়েছে। উপন্যাসের আলোচনাগুলিতে প্রথম শ্রেণীর ছোট গল্পের মাধুর্য পাওয়া যাবে। মূল বইগুলি না পড়েও পাঠক পুস্তকে পরিবেশিত বিষয় সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে পারবেন। এই আলোচনাগুলি রসোত্তীর্ণ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ বলেই গ্রন্থাকারে প্রকাশের দাবী রাখে বলে আমাদের বিশ্বাস।

শান্তি লাইব্রেরী, কলিকাতা—৯